পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

॥প্রথম খণ্ড॥

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'
—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম প্রকাশ (৫০০০ কপি)
৬ই ফাল্গুন ১৩৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ (৪৫০০ কপি)
২৬শে ফাল্গুন ১৩৫৮
তৃতীয় মুদ্রণ (৭৯০০ কপি)
৮ই বৈশাখ ১৩৫৯
চতুর্থ মুদ্রণ (১০,১০০ কপি)
৬ই ভাদ্র ১৩৫৯
পঞ্চম মুদ্রণ (১০,০০০ কপি)
২৬শে ফাল্গুন ১৩৫৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ
১৬ই আষাঢ় ১৩৬১
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
ছবি ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
কাগজ সরবরাহক
রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ
ব্লক
রূপমুদ্রা লিমিটেড
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

সুলভ সংস্করণ পাঁচটাকা
শোভন সংস্করণ সাতটাকা

॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥

ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে মর্তধামে লীলা করতে এসেছিলেন। সে লীলা-কাহিনী অনেক ভক্ত ও সাধক লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি অযোগ্য আমি অকিঞ্চন আমি কামকাঞ্চনকীট। ভগবানের সেই নরলীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই, পবিত্রতাও নেই। তবে দস্যু রত্নাকরেরও রাম নাম নেবার অধিকার ছিল—মরা-মরা বলতে-বলতে সেও একদিন পৌঁচেছিল রাম-নামে। আর, ভগবান কৃপা করলে মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও যায় গিরিলঙ্ঘনে। তাই ভগবানের কৃপাবলম্বন করেই আমি অগ্রসর হয়েছি। আমার তত্ত্ব নেই শাস্ত্র নেই, তন্ত্র-মন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।

গীতায় ভগবান বলেছেন :

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

ভক্তিভরে ভগবানকে যাই দেওয়া যায় তাই তিনি গ্রহণ করেন। বিদুরের স্ত্রী কলা না দিয়ে কলার খোসা দিয়েছিলেন ভগবানকে। আমি নিবেদন করলাম আমার সাহিত্য, আমার কথাশিল্প। এর মধ্যে এক বিন্দুও ভক্তি আছে কিনা, যিনি সকল মনের স্বাদ গ্রহণ করে বেড়ান তিনিই জানেন।

আমি গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে চেয়েছি। কিন্তু সেই গঙ্গাজলের সঙ্গে অনেক ঘোলা জল মিশে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সঙ্গে আমার নিজের অনেক কথা চলে এসেছে, ফুলের মাঝে কাঁটার মত, কিংবা বলি, কীটের মত। তাতে ফুলের সৌরভ কখনো ম্লান হবার নয়। ঘোলা জল মিশলেও গঙ্গাজলের শুচিতা কখনো নষ্ট হয় না। আমরা ভাষা দেখি ভগবান ভাব দেখেন। এক স্ত্রীলোকের ভাসুরের নাম হরি, শ্বশুরের নাম কৃষ্ণ। শ্বশুর-ভাসুরের নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারে না বলে সেই স্ত্রীলোক জপ করছে—'ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ও ঠিক বলছে, ওর ডাক শুনছেন ভগবান। আসলে, মনই মন্ত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মন তোর মন্তর।' ভগবান ভাষার ত্রুটি ধরেন না, নিজে অনির্বচনীয় বলে বচনের অন্তরালে মনের মৌনেরই খবর নেন। সে মৌন সমস্ত প্রকাশের পরপারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ।' আমার লেখার ত্রুটিতে হয়তো কখনো তাঁর নরত্বের মধ্যে তাঁর দেবত্ব ঢাকা পড়েছে। কিন্তু নারায়ণরূপী নরও যা নররূপী নারায়ণও তাই। যিনি জীবোদ্ধার করতে এসেছিলেন তাঁর পরম-পাবনী ক্ষমা কাউকে বঞ্চনা করে না কখনো।

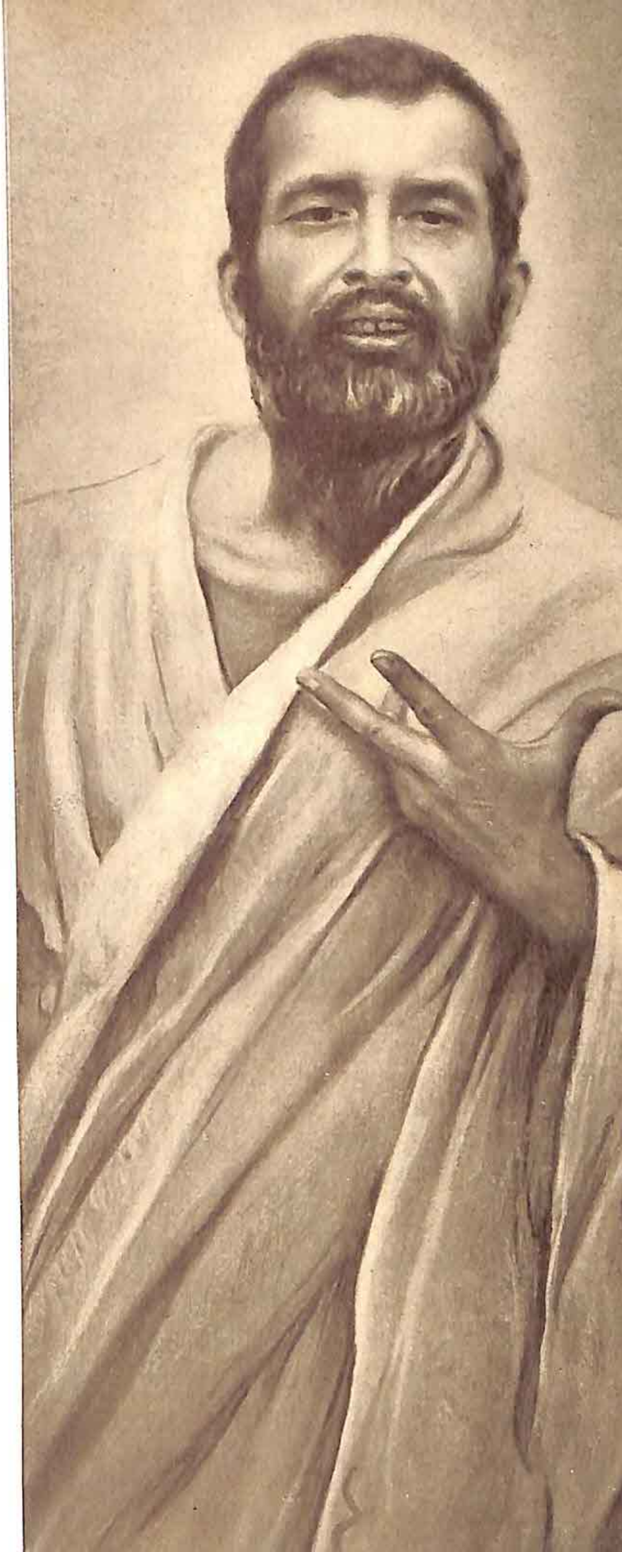
দিয়াশলাই জেবলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এ বই শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পূজা, দীপ-জ্বালানো আরতি।

৬ই ফাল্গুন ১৩৫৮

অচিন্ত্যকুমার—

ওঁ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



১

তোকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। দেখছিস?

মস্ত শহর কলকাতা। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। না দেখে উপায় কি? এ কি আমাদের কামারপুকুরের মত নিঝঝুম? নিরিবিলি?

রামকুমার চিন্তিত মুখে বললেন, 'কলকাতায় এসে টোল খুললাম—'

তাও দেখতে পাচ্ছি বৈকি। তা ছাড়া ঝামাপুকুরে কারু-কারু বাড়িতে দাদা তো পুরোতগিরিও করছেন। সব পেরে উঠছেন না। সময় কই? টোলে টোল খেতে খেতেই দিন যায়।

'তাই তোকে নিয়ে এলাম এখানে।' বললেন রামকুমার, 'এবার একটু লেখাপড়া কর্।'

লেখাপড়া? গদাধর সরল-বিশাল চোখ তুলে তাকিয়ে রইল দাদার দিকে।

'হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রা দলে গিয়ে শিব সাজিস। ও সবে পেট ভরবে না—' রামকুমারের কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ ফুটল।

তবে কি করতে হবে?

মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হলো তোর। ছিটে-ফোঁটা বিদ্যেও তোর পেটে নেই। আমার আয় দেখতে পাচ্ছিস তো? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—

তা আর অজানা নেই। কিন্তু শিখতে হবে কি?

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—' গম্ভীর হলেন রামকুমার : 'একটু মন লাগা। মা'র কাছছাড়া করে নিয়ে এসেছি তোকে। মা'র মুখ প্রসন্ন কর্।'

মা'র মুখ প্রসন্ন কর্। মা'র বিষণ্ণ মুখখানি মনে-মনে ধ্যান করল গদাধর। সে কি শুধু চন্দ্রমণির মুখ?

সে মুখে অভয়প্রদা প্রসন্নতা। 'সব্য হস্তে মুক্ত খড়্গ দক্ষিণে অভয়।'

'দাদা, চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?'

তার মানে? বিরক্ত হলেন রামকুমার।

তার মানে অর্থকরী বিদ্যে আমি চাই না। ঘর-সাজানো বিদ্যে।

'তবে তুই কি চাস?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

এ আবার কোন দিশি কথা? কোন দিশি জ্ঞান? এ জ্ঞানের অর্থ কি?

এ জ্ঞানের অর্থ নেতি। নেতি-নেতি করে-করে একেবারে শেষকালে যা বাকি থাকে তাই। সেই এক জানাই জ্ঞান, আর অনেক জানা অজ্ঞান—

বুঝতে পারলেন না রামকুমার। কি করেই বা বুঝবেন? সংসারে সুখভোগকে তুচ্ছ করে কেউ স্বপ্নবিলাসে মত্ত থাকতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত। দরিদ্রের পক্ষে অভাবমোচনের চেষ্টার বাইরে আবার ব্যাকুলতা কী!

ছোট ভাইকে বকতে লাগলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধর চুপ। অবিচল।

যখন সত্যিকারের জ্ঞান হয় তখন স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। সত্যিকারের জ্ঞান মানেই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন ধরো, একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, সঙ্গে এসেছে তার সমবয়স্ক বন্ধুরা। সবাই বাইরের ঘরে বসে গুলতানি করছে। এদিকে ঐ মেয়েটি আর তার সমবয়সী সখীরা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। মেয়েটির স্বামীকে চেনে না সখীরা। একজনকে দেখিয়ে জিগগেস করছে, ঐটি তোর বর? মেয়েটি অল্প হেসে বলছে, না। ঐটি? উঁহুঁ। ঐটি? তাও না। এমনি চলছে নেতি-নেতি। শেষকালে ঠিক-ঠিক যখন স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও করে না, না-ও করে না, শুধু একটু ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। সখীরাও তখন বুঝতে পারে, কে বর। তেমনি যেখানেই ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই মৌন।

এ মৌনের ভুল মানে করলেন রামকুমার। ভাবলেন ছেলেটার মাথা বোধ হয় বিগড়েছে।

লেখাপড়া যখন শিখবে না তখন যা হয় একটু কিছু কাজ করুক। অন্তত দেবসেবার কাজ। বাড়িতে রঘুবীর আছেন, সেবা-পূজার কাজ তো সে জানে। তাই সেদিকে মন দিক। কিছু দক্ষিণার সাশ্রয় হোক।

ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপূজা। সেখানে গদাধরকে ঢুকিয়ে দিলেন রামকুমার। গদাধর মহাখুশি। মনের মতন কাজ মিলেছে তার। যেন মনের মানুষ চলে এসেছে তার হাতের নাগালের মধ্যে।

যেমন দেখতে মনোহর তেমনি কণ্ঠস্বরে মধুঢালা। ভজন গায় গদাধর। যে দেখে যে শোনে সেই তদ্‌গত হয়ে যায়। মনে হয় কোথাকার কবেকার কে আপন লোক যেন পথ ভুলে চলে এসেছে। অভিজাত বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। সূর্যকে মুখ দেখাতে সংকোচ, কিন্তু এ যেন অন্ধকার ঘরের অন্তরঙ্গ আলো। সকলের বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। উদাসীন অথচ আনন্দময়।

দেবতার সামনে যখন বসে সবাই চমকে ওঠে, দেবতাই এসে বসেছেন না কি সামনে? কিন্তু এদিকে যার যখন দরকার ফুট-ফরমাজ খেটে দিচ্ছে গদাধর। আড্ডা দিচ্ছে অন্দরে-বাইরে। ছেলে-ছোকরার দল পাকিয়ে হৈ-হল্লা করছে। লেখাপড়ার নামে ঠনঠন।

কি হবে ও সব অবিদ্যায়?

অমৃত-সাগরে যাবার পথ খুঁজছি। যেমন করে হোক সাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই হলো। শুধু পৌঁছুলে চলবে না, ডুবতে হবে। কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে

ফেলেই দিক বা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়। ডুবতে হবে। যা ডোবায় না ভাসিয়ে রাখে, তা দিয়ে আমি কি করব?

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীও এ কথা বলেছিলেন। ধনধারিণী বসুন্ধরার যত সম্পদ হতে পারে সব এনে তাকে উপহার দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। মৈত্রেয়ী মমতাশূন্যের মত বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করব? যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?'

শুধু পুঁথি পড়লে কি চৈতন্য হবে? চৈতন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেহের মধ্যে। তাকে জাগানো চাই। কি করে জাগাবে? যোগে বসে। যোগ কি? যোগ মানে যুক্ত হয়ে থাকা। দীপশিখা দেখেছ? হাওয়া নেই যেখানে, সেই নিষ্কম্প দীপশিখা? সেই স্থির স্থিতি? তারই নাম যোগ। ঊর্ধ্বের সঙ্গে সংস্পর্শ। তারই প্রথম আসন এই দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে।

রামকুমার কি করেন? কার সাহায্যে স্বচ্ছল হবে তাঁর সংসার? কে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে?

'তুমি যা করো—' রঘুবীরকে স্মরণ করলেন রামকুমার। শ্যামল-শান্ত রঘুবীর।

২

রঘুবীর আছেন দেরে গ্রামে মানিকরাম চাটুজ্জের বাড়িতে। যে গ্রামের জমিদার প্রতাপপ্রবল রামানন্দ রায়। দৌরাত্ম্যই যার একমাত্র মাহাত্ম্য।

ক্ষুদিরাম মানিকরামের বড় ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আর রঘুবীরের সেবা করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সেই। দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন চন্দ্রমণিকে। যখন চন্দ্রমণির বয়স আট আর তাঁর নিজের বয়স পঁচিশ। বিয়ের ছ' বছর পরে জন্ম হল রামকুমারের। আর তার পাঁচ বছর পরে প্রথম মেয়ে কাত্যায়নীর।

'আপনাকে রাজা ডেকেছেন—' ক্ষুদিরামের ঘরের দরজায় জমিদারের পেয়াদা।

কি আর্জি হুজুরের? চোখ তুলে চাইলেন ক্ষুদিরাম।

আর্জি নয়, হুকুম। রাজার তরফ থেকে একনম্বর মামলা রুজু আছে আদালতে। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আপনি একজন ধার্মিক লোক। আপনার জবানবন্দির দাম আছে।

ব্যাপারটা শুনলেন বিশদ করে। বুঝলেন, মামলাটি মিথ্যে, তঞ্চকী।
'মিথ্যে মামলায় সাক্ষী হতে পারব না।' একবাক্যে না করলেন ক্ষুদিরাম।
পেয়াদা তো অবাক। ভাবতেও পারে না এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যায়। এর পরিণাম কি হবে তা কি চাটুজ্জে মশায় জানেন না?
জানেন। কোপে পড়বেন জমিদারের। কিন্তু জমিদারের প্রশ্রয়ের চাইতে সত্যের আশ্রয়ে বেশি শান্তি।
অন্তরের মধ্যে একবার দেখলেন তাঁর রঘুবীরকে। সত্যে আর ন্যায়ে যিনি প্রতিষ্ঠিত সেই করুণাঘন রামচন্দ্রকে।
যা হবার তাই হল।
রামানন্দ রায় উলটে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই মিথ্যে নালিশ করলেন। যার পক্ষে আমলা তার পক্ষেই মামলা। ডিক্রি পেয়ে গেলেন রামানন্দ। জারিতে ক্ষুদিরামের স্থাবর-অস্থাবর সব নিলেম হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন।
দেড়শো বিঘে মতন জমি ছিল। সব একটা রঙচঙে তামাশার মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিছুই কি রইল না আর পৃথিবীতে?
আছেন, রঘুবীর আছেন। অভয় আশ্রয়ের স্নিগ্ধ আতপচ্ছদ মেলে ধরেছেন আকাশে। যার কেউ নেই কিছু নেই তারো স্থান আছে। অন্তরে স্থান আছে। অনন্তে স্থান আছে।
ক্ষুদিরাম দেখলেন হঠাৎ এক জন বন্ধু এসে উপস্থিত।
'আমি কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী। চিনতে পার?'
'তোমায় চিনি না? তুমি আমার কত কালের বন্ধু।'
তুমি চলো কামারপুকুর। আমার বাড়ির একটেরে তুমি থাকবে। তোমায় জমি দিচ্ছি বিঘেটাক। কাটা ঘুড়ির সুতো ধরো আবার।
কামারপুকুরে গোস্বামীদের লাখেরাজী স্বত্ব। হৃদয়ও তেমনি নিষ্কর। নিষ্কণ্টক। সপরিবারে ক্ষুদিরাম চলে এলেন কামারপুকুর। গোস্বামীদের বাড়ির একাংশে কয়েকখানি চালাঘরে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মীজলায় ধানী জমি পেলেন এক বিঘে দশ ছটাক। চিরকালের অর্পণ।
বর্তে গেলেন ক্ষুদিরাম। যিনি নেন তিনিই আবার ফিরিয়ে দেন। এক দোর দিয়ে যান হাজার দোর দিয়ে আসেন। নিত্যেও তিনি লীলায়ও তিনি।
মনে পড়ে, একদিন নিরুপায় কণ্ঠে বলেছিলেন চন্দ্রমণি : 'ঘরে আজ চাল নেই—' তবু বিচলিত হননি ক্ষুদিরাম। বলেছিলেন, 'তাতে কি? রঘুবীর যদি উপোস করেন আমরাও উপোস করব।'
সৌম্যোজ্জ্বল চোখে হাসলেন রঘুবীর। বা, উপোস করব কেন?
লক্ষ্মীজলার মাঠে ধানী জমি সোনার ধানে ঝলমল করে উঠল। ক্ষুন্নিবৃত্তির তৃপ্তিতে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছেন দেবতা।
দুপুর বেলা। গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ফেরবার সময় গাছের তলায় বিশ্রাম

করতে বসেছেন। হঠাৎ কেমন যেন তন্দ্রার ঘোর লাগল। এলিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চন্দ্রের মত রমণীয় বলেই তো রামচন্দ্র। নবদূর্বাদলের মতই শ্যামল-স্নেহল। কিন্তু মুখখানি ম্লান কেন?

'আমি বড় অযত্নে আছি। অনেক দিন কিছু খাইনি।' বললে বালক, 'তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলো। বড় সাধ তোমার হাতে একটু সেবা পাই।'

অস্থির হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'আমি অধম, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'কোনো ভয় নেই। নিয়ে চল আমাকে। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার আমি ত্রুটি ধরি না।'

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই। কিন্তু স্বপ্নে যে ধানখেত দেখেছিলেন ঐ তো সেই ধানখেত। নিশ্চয়ই ঐখানে লুকিয়েছেন। এগোলেন ক্ষুদিরাম। দেখলেন এক টুকরো পাথরের উপর এক বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ঠাহর করে দেখলেন সামান্য পাথর নয়, শালগ্রাম শিলা। মনে হল স্বপ্ন মিথ্যা নয়, ঐ শিলাই তাঁর রামচন্দ্র, নইলে সাপ সহসা অন্তর্হিত হবে কেন? কিন্তু সাপ তো একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি, পাথরের মুখে যে গর্ত তারই মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। পাথর তুলে আনবার সময় হাতে যদি দংশন করে! ইতস্তত করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু যিনি রাম তিনি কি বিষহরণ নন? 'জয় রঘুবীর' বলে ত্বরিতভঙ্গিতে তুলে নিলেন শিলা। সাপ কোথায় তা কে জানে।

লক্ষণ থেকে বুঝলেন এ 'রঘুবীর' শিলা। তবে, আর সন্দেহ কি, এই শিলাই তাঁর জাগ্রত গৃহদেবতা। শুধু জাগ্রত নয়, স্বয়মাগত।

একদিন পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন মেদিনীপুর, কামারপুকুর থেকে কম-সে-কম চল্লিশ মাইল দূরে। অনুদয়ে বেরিয়েছেন, হেঁটেছেন প্রায় দশটা পর্যন্ত। হঠাৎ দেখলেন রাস্তার ধারে এক বেলগাছ। ফাল্গুনের রাশি-রাশি নতুন পাতায় সারা গাছ ঝলমল করছে। দেখে ক্ষুদিরামের মন ঐ কাঁচ পাতার মতই নেচে উঠল। পাশের গাঁয়ে ঢুকে একটা ঝুড়ি আর গামছা কিনলেন তাড়াতাড়ি। সামনের পুকুরের জলে ধুয়ে নিলেন বেশ করে। পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঝুড়ি বোঝাই করলেন। ভিজে গামছাখানি চাপিয়ে দিলেন উপরে। মেদিনীপুর পড়ে রইল, পাতা নিয়ে বিকেল তিনটের সময় বাড়ি পেঁছিুলেন।

চন্দ্রমণি তো অবাক।

'অনেক—অনেক বেলপাতা পেয়েছি আজ। নতুন বেলপাতা। আজ প্রাণভরে শিব-পুজো করব।'

'মেদিনীপুর? মেদিনীপুর গেলে না?'

'বেলপাতা দেখে সব ভুল হয়ে গেল। আবার যাব না-হয় একদিন মেদিনীপুর। কিন্তু এমন বেলপাতা পাব কোথায়?'

এই ক্ষুদিরাম!

এবার চলেছেন—মেদিনীপুর নয়—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। চলেছেন তেমনি পায়ে হেঁটে। পদব্রজে না হলে তীর্থ কি! ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ পাব কি করে? ফিরলেন পরের বছর। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব। বসালেন রঘুবীরের পাশে। হরির পাশে হর। সীতাপতির পাশে উমাপতি।

প্রায় ষোলো বছর পরে ফের ছেলে হল চন্দ্রমণির। দ্বিতীয় ছেলে। ক্ষুদিরাম তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

রামকুমার তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, পুজো-আচ্চা করছে যজমান-বাড়িতে। লক্ষ্মীপুজোর রাত। দিন থাকতে ভূরসুবো গিয়েছে, মাঝ রাতেও ফেরবার নাম নেই। ছেলের জন্যে চন্দ্রমণি ঘর-বার করছেন। মন বড় উচাটন। এখনো ফিরছে না কেন রামকুমার?

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন চন্দ্রমণি। অনেকক্ষণ পর দেখলেন কে একজন যেন মাঠ পেরিয়ে ভূরসুবোর দিক থেকে আসছে। রামকুমারই বোধ হয়—দু' পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রমণি। কিন্তু, ছেলে কোথায়, এ তো একজন মেয়ে!

আশ্চর্য রূপ সেই মেয়ের। এক গা গয়না। এই নির্জন মধ্যরাত্রে এখানে তার কি দরকার?

'কোত্থেকে আসছ মা তুমি?' চন্দ্রমণি গায়ে পড়ে জিগ্‌গেস করলেন।

'ভূরসুবো থেকে।'

'আমার ছেলে রামকুমারের কোনো খবর জানো?'

জিগগেস করেই লজ্জিত হলেন চন্দ্রমণি। অজানা ভদ্রঘরের মেয়ে, কোনো বিশেষ কারণেই না-হয় বাইরে বেরিয়েছে—তাঁর ছেলের খবর সে পাবে কোথায়? ছেলের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন বলেই বোধ হয় তাঁর আর বোধজ্ঞান নেই।

'যে বাড়িতে তোমার ছেলে পুজো করতে গিয়েছে আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি।' মেয়েটি বললে চোখ তুলে : 'ভয় নেই এখুনি ফিরবে—'

কেমন যেন বিশ্বাস হল চন্দ্রমণির। বুকের ভার নেমে গেল।

জিগগেস করলেন, 'এত রাত্রে এত গয়না-গাটি পরে কোথায় যাচ্ছি তুমি মা?'

মেয়েটি হাসল। বললে, 'অনেক দূর।'

'তোমার কানে ও কি গয়না?'

'ওর নাম কুণ্ডল—'

'মা, তোমার বয়স অল্প। এই অসময়ে এত গয়না-টয়না পরে তোমার একা-একা যাওয়া ঠিক হবে না।' চন্দ্রমণির কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল : 'তুমি আমাদের ঘরে এস। রাতটা বিশ্রাম করে কাল ভোর হতে চলে যেও।'

'না মা, আমার এখুনি যেতে হবে। আরেক সময় আসব তোমাদের বাড়িতে।' বলে মেয়েটি চলে গেল।

চলে গেল কিন্তু রাস্তা বা মাঠ দিয়ে নয়। ভারি আশ্চর্য তো! তাঁদের বাড়ির পাশেই নতুন জমিদার লাহাবাবুদের সার-সার ধানের মরাই। যেন সেদিক পানে চলে গেল।

ওদিকে পথ কোথায়? বিদেশী মেয়ে পথ হারালো না কি? চন্দ্রমণি বাইরে বেরিয়ে এলেন। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন চঞ্চল হয়ে। কোথায় গেল সে চঞ্চলা? এ আমি তবে কাকে দেখলাম? কোজাগরী রাত্রিকে জিগ্গেস করলেন চন্দ্রমণি। স্বামীকে গিয়ে তুললেন। বলো, এ আমি কাকে দেখলাম? সর্বাবয়বানবদ্যা নানা-লংকারভূষিতা এ কে?

সব শুনলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখেছ।'

এই চন্দ্রমণি!

পিতৃদেব আর মাতৃদেবী। দুই-ই দিব্যভাবের ভাবুক।

৩

এমন বাপ-মা না হলে এমন ছেলে জন্মাবে কি করে?

কাত্যায়নীর বড় অসুখ। আনুড়ে তার শ্বশুর-বাড়িতে তাকে দেখতে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম। মেয়ের হাবভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। মনে হল ভূতাবেশ হয়েছে।

চিত্ত সমাহিত করে দেহে দিব্যযোনিকে আহবান করলেন ক্ষুদিরাম। প্রেতযোনিকে সম্বোধন করে বললেন, 'কেন আমার মেয়েকে অকারণে কষ্ট দিচ্ছ? চলে যাও বলছি।'

কাত্যায়নীর জবানিতে বললে সেই প্রেতাত্মা : 'চলে যাব যদি আমার একটা কথা রাখো।'

'কি কথা?'

'যদি গয়া গিয়ে আমাকে পিণ্ড দিতে রাজী হও। আমার বড় কষ্ট—'

ক্ষুদিরাম তিলমাত্র দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'দেব পিণ্ড। কিন্তু তাতেই কি তুমি উদ্ধার পাবে?'

'পাব।'

'তার প্রমাণ কি?'

'তার প্রমাণ আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি। যাবার সময় সামনের ঐ নিম গাছের বড় ডালটা আমি ভেঙে দেব।'

মুহূর্তে নিম গাছের বড় ডালটা ভেঙে পড়ল।

আর কাত্যায়নীর অসুখও মিলিয়ে গেল বাতাসে।
ক্ষুদিরাম গয়া রওনা হলেন। সেটা শীতকাল, ১২৪১ সাল। পৌঁছুলেন চৈত্রের শুরুতে। মধুমাসেই পিণ্ডদান প্রশস্ত।
বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলেন ক্ষুদিরাম। রাতে বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন।
যেন তাঁর সামনে গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব তোমার হাতে।'
ক্ষুদিরাম কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি গরিব, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'
'ভয় নেই।' বললেন গদাধর, 'যা জুটবে তাই খাওয়াবে আমাকে। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই।'
একমাস পরে বাড়ি ফিরলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা পুষে রাখলেন মনে-মনে।
এদিকে চন্দ্রমণি কী দেখছেন?
দেখলেন, রাতে তাঁর বিছানায় তাঁরই পাশে কে একজন শুয়ে আছে। স্বামী বিদেশে, অথচ এ কী অভাবনীয়! তা ছাড়া, কই, মানুষ তো এত সুন্দর হয় না। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। প্রদীপ জ্বালালেন। কই, কেউ কোথাও নেই। দরজার খিল তেমনি অটুট আছে। কৌশলে খিল খুলে কেউ ঘরে ঢুকে তেমনি কৌশলে আবার পালিয়ে গেল না কি? এত স্পষ্ট যে স্বপ্ন বলে বিশ্বাস হয় না। ভোর হতেই ধনী কামারনীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'হ্যাঁ লো, কাল রাতে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল বলতে পারিস?'
সব কথা শুনে ধনী হেসেই অস্থির। বললে, 'মর মাগী, লোকে শুনলে অপবাদ দেবে যে! বুড়ো বয়সে আর ঢলাসনি! স্বপ্ন দেখেছিস লো, স্বপ্ন দেখেছিস।'
তাই মনে-মনে মেনে নিলেন চন্দ্রমণি। স্বপ্নই হবে হয়তো। কিন্তু, আশ্চর্য, রাত কি কখনো দিনের মত স্পষ্ট হয়?
আরেক দিন।
যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমণি, দেখতে পেলেন মহাদেবের গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল হাওয়ার মত। ঘুরতে-ঘুরতে ছেয়ে ফেলল চন্দ্রমণিকে, তাঁর শরীরের মধ্যে ঢুকতে লাগল প্রবল স্রোতে। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাছেই ধনী ছিল, ধরে ফেললে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধনীকে সব বললেন চন্দ্রমণি। ধনী বললে, 'তোর বায়ুরোগ হয়েছে।'
গয়া থেকে ফিরে এসে শুনলেন সব ক্ষুদিরাম।
'আমার পেটে যেন কেউ এসেছে—এমনি মনে হচ্ছে সত্যি—' চন্দ্রমণি বললেন স্বামীকে।
'গদাধর আসছেন—'
এবারের গর্ভধারণে চন্দ্রমণির রূপ যেন আর বাঁধ মানছে না। যেন লাবণ্যবারিধি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সে-রূপ বুঝি সূর্যোদয়ের আগেকার আরক্তিম আকাশের রূপ।

'বুড়ো বয়সে গর্ভ হয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে—' বলাবলি করে পড়শীনীরা। কেউ বলে, 'পেটে ওর ব্রহ্মদৈত্য ঢুকেছে—বাঁচলে হয় এবার।'

নানা রকম দিব্যদর্শন হচ্ছে চন্দ্রমণির। কখনো ত্রাস, কখনো উল্লাস, কখনো বা ঔদাসীন্য। কখনো বলেন, আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি; কখনো বলেন, আমার মধ্যে পুরুষোত্তম এসেছেন। কখনো বা নিতান্ত অসহায়ের মত বলেন, 'আমাকে বুঝি গোঁসাইয়ে পেল।'

গোঁসাইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। সুখলাল গোস্বামী মারা যাবার পর নানা রকম দৈব উৎপাত দেখা দিয়েছিল গ্রামের মধ্যে। লোকের বিশ্বাস হয়েছিল সুখলাল গোঁসাই মরে ভূত হয়েছে, আর আছে তাদের বাড়ির সামনেকার বকুল গাছের মগ ডালে। সেই থেকে কাউকে কখনো ভাবে পেলে লোকে বলত, গোঁসাইয়ে পেয়েছে।

কিন্তু ক্ষুদিরাম তাঁর মন খাঁটি করে রেখেছেন, তাঁর ঘরে পুত্ররূপে নারায়ণ আসছেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে দোর-গোড়ায় শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ শুনতে পেলেন কোথায় যেন নূপুর বাজছে। কান খাড়া করলেন, আওয়াজ তো তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে। ঘর শূন্য দেখে বন্ধ করেছি দরজা, কেউ অগোচরে ঢুকে পড়ল না কি? ঢুকে পড়ল তো নূপুর পেল কোথায়? ত্রস্ত হাতে বন্ধ দরজা খুলে ফেললেন চন্দ্রমণি। কেউ কোথাও নেই। যেমনি শূন্য ছিল তেমনি আছে। কি আশ্চর্য, চোখের মত কানও কি ভুল করবে?

স্বামীকে বললেন এই নূপুর-গুঞ্জনের কথা। ক্ষুদিরাম বললেন, 'গোকুলচন্দ্র আসছেন।'

একদিন মনে হল চন্দনের গাঢ় গন্ধ পাচ্ছেন চারদিকে। ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুতের খেলা দেখছেন। বুকের উপর উঠে কে এক শিশু গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, আর পিছলে পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে, দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারছেন না।

রঘুবীরের ভোগ রাঁধছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ যেন প্রসব-বেদনা টের পেলেন। বললেন, 'উপায়? এখন যদি হয়, ঠাকুরের সেবা হবে কি করে?'

'যিনি আসছেন তিনি রঘুবীরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবেন না।' বললেন ক্ষুদিরাম, 'তুমি স্থির থাক। যাঁর পূজা তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।'

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগ আর শীতল শেষ হল নির্বিঘ্নে। রাতও প্রায় যায়-যায়। ধনী এসে শুয়েছে চন্দ্রমণির কাছে।

বাড়িতে থাকবার মত দু'খানি চালা ঘর, তা ছাড়া রান্না-ঘর, ঠাকুর-ঘর আর ঢেঁকি-ঘর। ঢেঁকি-ঘরেই আঁতুড় পাড়বে বলে ঠিক হয়েছে। ঘরে এক দিকে ধান ভানবার একটা ঢেঁকি আর ধান সিদ্ধ করবার একটা উনুন।

রাত ফুরুতে তখনো আধদণ্ড বাকি, চন্দ্রমণির ব্যথা উঠল। ধনী তাঁকে নিয়ে এল ঢেঁকসেলে, শুইয়ে দিলে মাটির উপর। দেখতে-দেখতে প্রসব হয়ে গেল। যা অনুমান করা গিয়েছিল, পুত্র, নরবেশে পরম পুরুষই এসেছেন। প্রতিশ্রুত প্রতিমূর্তি। এসেছেন? দেখেছিস তুই?

হ্যাঁ লো, দেখেছি। তুই চুপ কর। ঠাণ্ডা হ। দেখবি, তুইও দেখবি। এখন তোকেই আগে দেখা দরকার। ধনী সাহায্য করতে গেল প্রসূতিকে।

কিন্তু এ কী সর্বনাশ, ছেলে কই? কই সেই নব-কলেবর?

চকা-হরিণের মত ছট্‌ফট্‌ করে উঠল ধনী। কাঁপা হাতে বাতির সলতে বাড়িয়ে দিলে। ছেলে কই? দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল না কি?

ও মা, দেখেছ? পিছল মাটিতে হড়কে-হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদি করা।

আলগোছে ধনী ছেলেকে টেনে নিলে কোলে। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভস্মভূষণ।

'ও মা, কত বড় ছেলে! প্রায় ছ'মাসের ছেলের মত!' ধনী নাড়ে-চাড়ে আর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে। খালি গা, অথচ মনে হয় যেন কত মণি-রত্ন পরে আছে। দ্বিতীয়া তিথি কিন্তু মনে হয় যেন অদ্বিতীয় চাঁদ।

বাংলা ১২৪২ সালের ছয়ুই ফাল্গুন—ইংরিজি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারি। শুক্লপক্ষ, বুধবার। ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

ছেলে কোলে নিয়ে বসে একদিন রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ মনে হল কোল জুড়ে যেন তাঁর পাথর পড়ে আছে। ভার যেন সইতে পারছেন না।

এ কী হলো বলো দেখি?

কী আবার হবে। বিশ্বম্ভরের ভর হয়েছে ছেলের উপর।

অসহ্য! কোল থেকে ছেলে নামিয়ে নিয়ে কুলোর উপর শুইয়ে দিলেন চন্দ্রমণি। শিশুর ভারে কুলো চড়চড় করে উঠল। কুলো ভেঙে যাবে না কি? ব্যাকুল হাতে চন্দ্রমণি ছেলেকে আবার কোলে তুলতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল—পাষাণ। দু'হাতে এমন শক্তি নেই যে টেনে তোলেন। যিনি গিরি ধরেছিলেন তিনিই যে শুয়ে আছেন কুলোর উপর তা কে জানে। চন্দ্রমণি কাঁদতে লাগলেন।

যে যেখানে ছিল ছুটে এল। কি হলো? হলো কি?

'ছেলেকে কোলে তুলতে পারছি না—'

'কেন?'

'নিশ্চয়ই ওই নিম গাছের ব্রহ্মদত্যি ভর করেছে বাছার উপর—'

'কি যে বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়া, গা ঝেড়ে দিচ্ছি—' ধনী কামারনী কুলোর কাছে বসে মন্ত্র পড়তে লাগল।

নিমেষে শিশু হালকা হয়ে গেল। যেমন-কে-তেমন। তেমনি নবীন ও নিরীহ।

আরো একদিন।

সংসারের কাজে গৃহান্তরে গিয়েছেন চন্দ্রমণি। মশারি ফেলা, পাঁচ মাসের শিশু ঘুমুচ্ছে বিছানায়। ঘরে ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই। তার বদলে মশারি-প্রমাণ কে-এক দীর্ঘকায় মানুষ শুয়ে আছে। নবোদ্‌গত গাছের বদলে বিরাট বনস্পতি।

চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রমণি: 'ওগো দেখে যাও, বিছানায় ছেলে নেই—'

'কি বলছ?' ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম।

'দেখ এসে। বিছানায় বাছার বদলে কে শুয়ে আছে।'

দু'জনেই তাকালেন মশারির দিকে। কই, তাঁদের সেই শিশুই তো শান্তিতে শুয়ে আছে। হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আপন-মনে।

এ কী খেলা! এই যে দেখলাম মহাকায় মানুষ। আবার এই দুধের ছেলে। সব শুনে গম্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'কাউকে কিছু বোলো না।'

ছ'মাসে পা দিল শিশু। ছেলের মুখে-ভাতের যোগাড় করতে হয় এবার। বেশি জাঁক-জমক করবার অবস্থা কই? কোনো রকমে রঘুবীরের প্রসাদী ভাত মুখে দিয়েই নিয়মরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু পাড়ার লোকেরা নাছোড়বান্দা। এমন রাজ্যেশ্বর ছেলে, ভোজ দাও। কারবারী ধর্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু। এক পাড়ার বাসিন্দে। তাঁকে গিয়ে ধরলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'বন্ধু, এখন উপায়?'

ঈশ্বরই উপায়, আবার ঈশ্বরই উপেয়। যা তাঁর কৃপা তাই তাঁর শক্তি।

'ভয় কি, লাগিয়ে দাও। রঘুবীর উদ্ধার করে দেবেন।' বললেন ধর্মদাস।

ধর্মদাসই ব্যবস্থা করলেন সব। তাঁর টাকার থলের মুখ খুলে দিলেন। পাড়ার লোককে তিনিই প্ররোচনা দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামের থেকে নেমন্তন্ন আদায় করার জন্যে। আবার তিনিই সব জোটপাট করলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন—গাঁ-কে-গাঁ ষোলো আনারই আসন পড়ল। জীবের মধ্যে যে শিব আছে, নিঃস্ব-নির্ধনের মধ্যে যে নারায়ণ, সেও তো আরাধনীয়। সেও তো সেব্য-পূজ্য।

কি নাম রাখবে শিশুর?

এ আবার জিজ্ঞাসা কর কেন? গয়াধামে গিয়ে গদাধর পেলাম। এ সেই গদাধর। গয়াবিষ্ণু।

ডাক-নাম?

আদর করে গদাই বলে ডাকেন বাপ-মা। ডাকে ধনী কামারনী।

দিনে-দিনে বাড়ছে গদাধর। বড়-সড় হয়ে উঠছে। চন্দ্রমণি তাকে মাঝে-মাঝে ধুতি পরিয়ে দিচ্ছেন।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধু-সন্ন্যাসীর নানান আনাগোনা। গদাধরের মন পড়ে আছে সেই সন্নেসীদের মাঝখানে। শুধু প্রসাদের লোভে নয়, হয়তো বা আর কিছুর আকর্ষণে। হয়তো বা কোনো জ্ঞাতিত্বের প্রতিশ্রুতিতে। আত্মভোলা শিশুর মাঝে বাসা বেঁধেছেন শিশু-ভোলানাথ।

মা নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছেন গদাধরকে।

কতক্ষণ পরেই এ তার কি পরিণতি! ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছে গদাধর। এক ফালা নিয়ে দিব্যি ডোরকপনি করে পরেছে!

'ও মা, এ কি? এ তুই কী হয়েছিস?'

'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি? সে আবার কী?'

বুঝিয়ে দিল গদাধর। লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে তাদের অতিথি বলে না?

তারা তো সব সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি? মা'র মন হু-হু করে উঠল। আস্ত কাপড় দিলাম, তা ছিঁড়ে তুই কৌপীন বানালি?

গদাধর হাসল। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বুঝি এইটুকু একটু খণ্ড নিয়েই খুশি।

ছোট-ছোট তিনখানি খোড়ো ঘর, তার মধ্যে একখানি আবার ঢেঁকিশাল। আশেপাশে গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল। দেখলেই মনে হয় গরিবের সামান্য কুটির। তবু কে জানে কেন, ছবিতে এমন একটি ভাব, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কী যেন এখানে আছে! কত না জানি শান্তি! কত না জানি দয়া! কত না জানি আশ্রয়! পথ দিয়ে যেতে-যেতেও দাঁড়িয়ে যায় লোকেরা। ভাবে, কেন ভাবে কে বলবে, ঐখানে গেলে যেন তৃষ্ণার জল মিলবে, মিলবে যেন সমস্ত অসুখের আরোগ্য!

ঐখানে আছে কে? ও কার বাড়ি? ও কি কোনো মুনি-ঋষির আশ্রম?

৪

লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে ঢালাও নাটমন্দিরে পাঠশালা। পাঁচ বছরের ছেলে তখন গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকল এসে সে পাঠশালায়।

সকালে-বিকেলে দু'বার করে পড়া হয়। সকালে দু'তিন ঘণ্টা পড়ে স্নানাহারের ছুটি, বিকেলে এসে আবার সন্ধ্যে পর্যন্ত। ইস্কুলের আর কিছুই ভালো লাগে না গদাধরের, শুধু আর কতগুলো ছেলে এসে যে জমেছে এইটেই মস্ত মজা। খুব করে খেলা করা যাবে। যেখানে যত বেশি প্রাণ সেখানেই তত বেশি লীলা। যদি ঐ শুভঙ্করীটা না থাকত! ও দেখলেই কেমন ধাঁধা লেগে যায় গদাধরের। কষ্টে-সৃষ্টে যোগ যদি বা হল, বিয়োগ আর কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারল না।

কি করেই বা পারবে? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়ত্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কি! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। এখানে পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও থেকে যায় পূর্ণ।

পড়া বলতে বললেই মুশকিল। তার চেয়ে স্তোত্র-প্রণাম দাও মুখস্থ বলে দিচ্ছে। বর্ণ-পরিচয় করে পড়তে যাওয়াটাই ঠিক, কিন্তু গদাধরের উল্টো—তার পড়তে পড়তে বর্ণ-পরিচয়। অঙ্ক দিলেই আতঙ্ক। অঙ্ক ফেলে তালপাতায় ঠাকুরের নাম লেখা অনেক আরামের। যা রাম তাই নাম।

পাঠশালের ছুটির পর মধু যুগীর বাড়িতে গদাধর প্রহ্লাদ-চরিত পড়ছে। ভিড়

জমেছে চার পাশে। এমন শিশুর মুখে এমন মনোহরণ পড়া কেউ আর শোনেনি কোনো দিন। কাছাকাছি আমগাছের ডালে বসে এক হনুমানও শুনছে সেই পড়া, সেই স্বরলহরী। হঠাৎ সে হনুমান এক লাফে নেমে এল গাছ থেকে, শিশুর কাছাকাছি এসে তার পা ধরে বসে পড়ল।

গদাধর বিন্দুমাত্র ভয় পেল না, বরং হনুমানের মাথায় দিব্যি হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে।

হনুমান যেন চিনতে পেরেছে রামচন্দ্রকে। প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ নিয়ে এক লাফে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল।

তেমনি গোচারণের মাঠে গিয়ে গদাধর ব্রজের রাখাল হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে জুটছে সব সেথোরা। কেউ হচ্ছে সুবল কেউ শ্রীদাম—কেউ-কেউ বা দাম-বসুদাম। আর যে গদাধর সেই তো বংশীধর। চরে-চরে কাছে আসে গোধন, আপন হাতে ঘাস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাওয়ায়। কখনো বা লাফিয়ে-লাফিয়ে দোল খায় গাছের ডালে। কখনো বা পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। কোঁচড়ে করে মুড়ি খায়। খেতে-খেতে নাচে। হাসে।

একদিন তেমনি বাঁড়ুয্যে-বাগানের মাঠে গরু চরাচ্ছে সকলে। হঠাৎ গদাধর বললে, 'আয় সবাই মিলে আজ মাথুর গান গাই। গাইবি?'

সবাই একবাক্যে রাজী।

গাছের তলায় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

আজ কৃষ্ণ নেই। আজ রাধিকা। আজ কৃষ্ণকান্ত-বিরহিণী। কৃষ্ণ দেখেছিস এত দিন, আজ দেখ রাই-কমলিনীকে।

মাথুর-বিরহের গান ধরল গদাধর। সৃষ্টির মহামৌনের মাঝে যে শাশ্বত কান্না প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, আপন হৃদয় নিঙড়ে তা উৎসারিত করে দিল। কোথায়—কোথায় তুমি কৃষ্ণ, কোথায় হে তুমি পরমতম আকর্ষণীয়! কবে আমার এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মিলবে গিয়ে তোমার নির্বিকল্প নির্বাণহীনতায়?

গাইতে-গাইতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গদাধর। বাহ্যচৈতন্য রইল না। সেথোরা অস্থির হয়ে পড়ল : 'ওরে গদাই, কি হল তোর? কেন এমন করছিস? চোখ চা।' কেউ গায়ে ঠেলা দেয়, কেউ চোখে-মুখে জল ছিটোয়, কেউ বা কি করবে বুঝতে না পেরে কাঁদে।

কে একজন হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলে : 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ—'

যে নামে অজ্ঞান সেই নামেই আবার জ্ঞান। যে নামে বৈরাগ্য সেই নামেই আবার প্রেম। প্রাণকর কৃষ্ণ নাম শুনে উঠে বসল গদাধর। কোথায় কৃষ্ণ? চার পাশে সব বালক-বন্ধুর দল। এই তো! তোরাই কৃষ্ণ, তোরাই কৃষ্ণ। সমস্ত সংসারই কৃষ্ণময়। এই সব খেলা-ধুলোতেই গদাধরের কেরামতি। লেখাপড়ায় মন যেন থা পাতে না, আর অঙ্ক তো ডাঙোশ উঁচিয়ে আছে। তার চেয়ে গাঁয়ের কুমোররা যেমন মাটির তাল ছেনে মূর্তি গড়ছে, তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও, গদাধর পয়লা নম্বরের কারিগর। যদি বলো তো পট এঁকে দিতে পারে ওস্তাদ পটুয়ার মত। বেশ, ছবি-টবি চাও না, তবে গান

শুনবে? কী গান গাইব? হরিনাম ছাড়া আবার গান আছে না কি? ভক্তি ছাড়া আর কিছু আস্বাদন আছে?

পূজায় বসেছেন ক্ষুদিরাম। সামনে শান্ত-সৌম্য রঘুবীরের মূর্তি। পাশে নানান রকম উপকরণ—তার মধ্যে একগাছি ফুলের মালা। ঠাকুরকে স্নান করিয়ে রেখে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করছেন ক্ষুদিরাম। সেই স্নাত অঙ্গের পুণ্য স্পর্শের স্বাদ কল্পনা করছেন, ধ্যানে ক্রমশই অতলায়িত হয়ে যাচ্ছেন। সাড়া নেই স্পন্দন নেই। সে এক সীমাহীন সমাধি।

গদাধরের বড় সাধ ঐ চিকণ-গাঁথন ফুলের মালাটি গলায় পরে। অমনি তুলে নিয়ে গলায় দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। নয়নরোচন রঘুবীর সাজতে হবে।

শিলামূর্তির পাশে বসে পড়ল গদাধর। চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে মাখলে সারা গায়। থালার থেকে মালা তুলে নিয়ে নিজের গলায় দুলিয়ে দিলে। বললে বাবাকে উদ্দেশ করে : 'চোখ মেল। রঘুবীরকে দেখ। দেখ কেমন সেজেছে আজ রঘুবীর—'

ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চোখ মেলে দেখলেন, সামনে গদাধর ব'সে।

সেই দিন কি পুত্রবন্দনা করেছিলেন ক্ষুদিরাম? শিশুপুত্রের মাঝে কি লুকিয়ে আছে বালগোপাল?

রামশীলা দেবী ক্ষুদিরামের ছোট বোন। কামারপুকুরের কাছে ছিলিমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তিনি শীতলা দেবীর ভক্ত। মাঝে-মাঝে তাঁর উপরে শীতলা দেবীর আবেশ হত। তখন তিনি একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতেন। একদিন ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন রামশীলা। এসেই আবার অমনি শীতলা দেবীর আবেশ হয়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ, কি করে কি হবে কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না। কিন্তু গদাধরের একরতি ভয় নেই। খুঁটে-খুঁটে দেখছে পিসিমার ভাব, যাকে এ'রা বলছেন, ভাবান্তর। চমৎকার অবস্থা তো—যেন অন্য কোথাও দেশ বেড়াতে যাওয়া। কে যেন দিব্যি ঘাড়ে ধরে তিন ভুবন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত, কিন্তু গদাধর প্রসন্নমুখে বলছে, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়—'

সেদিন কি সেই তবে প্রথম ঘাড়ে চাপল গদাধরের?

ছ'বছরের ছেলে ধান খেতের সরু আল ধরে-ধরে চলেছে নিরুদ্দেশের মত। কোঁচড়ে মুড়ি, তাই তুলে-তুলে চিবুচ্ছে থেকে-থেকে। হঠাৎ কী মনে হল, আকাশের দিকে তাকাল একবার গদাধর। আকাশ তো আকাশই, শুধু তাকানোর মাঝেই তাৎপর্য। গদাধর দেখল এক বিশালকায় কালো মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কি দিব্য মহিমা এই মেঘমণ্ডিত আকাশে। চোখ আর ফেরে না গদাধরের। হঠাৎ এক ঝাঁক শাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁষে উড়ে গেল দূরান্তরে। গদাধরের সারা গায়ে শিহরণ লাগল। এই অপূর্ব, অনির্বাচ্য সৌন্দর্য কে পরিবেশন করল? কৃষ্ণিমার সঙ্গে এই শুভ্রতার যোগাযোগ? এই দিব্য কাব্য কার রচনা? হঠাৎ তার প্রতি গদাধরের প্রাণ-মন উড়ে চলল পাখা মেলে। দেহ-পিঞ্জর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চোখ মেলে চেয়ে দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। কে তাকে কখন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে কে জানে?

৫

গদাধরের মোটে সাত বছর বয়েস, ক্ষুদিরাম মারা গেলেন।

গিয়েছিলেন ভাগ্‌নে রামচাঁদের বাড়িতে, ছিলিমপুরে। মহাপূজার কাছাকাছি। কিন্তু মনে সুখ নেই। মনে সুখ নেই কেন না সঙ্গে গদাধর নেই।

ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে চন্দ্রমণিই বা কি করে থাকবেন? ও যে কটাক্ষে স্থিতি আবার কটাক্ষেই প্রলয়!

ছিলিমপুরে এসে দিন কয়েক পরেই অসুখে পড়লেন ক্ষুদিরাম। বাড়াবাড়ি অসুখ, তবু পুজোর আনন্দ ম্লান হতে দেবেন না। ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল—নবমী বুঝি আর যায় না! কাতর চোখে তাকালেন একবার প্রতিমার আয়ত চোখের কোমল করুণার দিকে। নবমীও কেটে গেল। দশমী? দশমীর সন্ধ্যেয় প্রতিমা-বিসর্জনের পর রামচাঁদ দেখলেন ক্ষুদিরাম তখনো বেঁচে আছেন কিন্তু সময় বড় সংক্ষিপ্ত। চোখের দৃষ্টি যেন প্রতিমারই পথ ধরেছে। ডাকলেন: 'মামা!'

সাড়া নেই, শব্দ নেই। ক্ষুদিরাম নির্বাক।

সে কি? মৃত্যুকালে নাম করবেন না? জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে? নামবে বিস্মৃতির বিভ্রান্তি? এতদিনের অভ্যাস-যোগ আজ কোনো কাজে আসবে না?

সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জপ-যজ্ঞ। তাই, ঠাকুর বললেন, রাত-দিন জপ করবি। তা হলেই অভ্যাসবশে মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা আসবে। মৃত্যুকালে যা ভাববি তাই হবি। ভরত রাজা হরিণ-হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। মৃত্যুকালে যদি হরিনাম করতে পারিস তা হলেই সন্ধান পাবি ঈশ্বরের।

'মামা, রঘুবীরকে ভুলে গেলেন?' রামচাঁদের চোখ জলে ভরে এল: 'এত যার নাম করতেন সে আপনাকে আজ পরিত্যাগ করল?'

'কে? রামচাঁদ?' আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালেন ক্ষুদিরাম: 'বিসর্জন হয়ে গেছে? আমাকে একবার তবে বসিয়ে দাও ধরাধরি করে।'

বসিয়ে দেওয়া হল। শুয়ে-শুয়ে নাম করব না, পূজার ভঙ্গিতে বসে নাম করব। সে

নাম কি ভুলে যেতে পারি? সে আমার কণ্ঠের মধ্যে স্বর, মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতি, রক্তের মধ্যে চেতনা। সে আমার নিশ্বাসবায়ু। আমার নিস্তার-নৌকা।

জ্ঞানে গাঢ়, গম্ভীর সে স্বর—ক্ষুদিরাম রঘুবীরের নাম করলেন তিন বার। নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে গেলেন স্বধামে।

ভূতির খালের শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গদাধর। বাবা নেই, কোথায় গেলেন, মনটা কেমন উড়ু-উড়ু, ফাঁকা-ফাঁকা—কোনো কিছুতে মন বসে না। মা'র কাছাকাছিই মন ঘুরঘুর করে—এটা-ওটা আবদার করতে সাধ হয়। কিন্তু অভাবের জন্যে মা যদি সে-আবদার রাখতে না পারেন, তা হলে তো বাবার জন্যে শোক আরো উথলে উঠবে। সুতরাং চুপ করে রইল গদাধর। কোথায় গেলে অভাব থাকবে না সংসারে, শূন্যতার ভার উড়ে যাবে মেঘের মত, অন্তরের অন্ধকারে তারই ঠিকানা খুঁজতে লাগল।

এবারে পৈতে দিতে হয়। সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। দাদারা কোমর বেঁধেছেন। পৈতে তো হল, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরল, ধনী কামারণী ছাড়া আর কারু হাতে ভিক্ষে নেব না।

সে কি কথা? ধনী ছোট জাতের মেয়ে, ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়। সে কি করে ভিক্ষে দেবে? কুল-প্রথা লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে।

কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বলব, যে ধনী কোলে করে আমাকে মুক্ত করেছে মা'র জঠর থেকে—সেই মা-নামের কাছে কোনো বিধি-নিষেধ মানব না। তোমরা তোমাদের বাম্‌নাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকব। এই দরজায় খিল দিলাম। কত জনের কত কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর!

শেষ কালে রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোল্‌ দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপোসী দেখতে পারব না।'

প্রসন্ন সূর্যের মত দরজা খুলে দিল গদাধর।

ধনী কামারণী ভিক্ষে দিল। কড়ে রাঁড়ি, নিঃসন্তান, কিন্তু মহা ভাগ্যবতী। ত্রিভুবনে যিনি ভিক্ষে দিয়ে বেড়ান তাঁকেই কি না সে ভিক্ষে দিলে!

আনুড়ে বিশালাক্ষী বা বিষলক্ষ্মীর থান। কামারপুকুর থেকে মাইল দুই দূরে আনুড়। মাঝখানে খোলা মাঠ। ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন পূজায় চলেছে। সঙ্গে গ্রামের আরো অনেক মেয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে গদাধর এসে বললে, 'আমিও যাব।' তুই যাবি কি রে! এতটা মাঠভাঙা পথ হাঁটবি কি করে? কিন্তু গদাধরের মুখের দিকে চেয়ে মুখের কথা মুখের মধ্যেই আটকে রইল। মন্দ কি, যাক না সঙ্গে! ফেরবার সময় যদি খিদে পায়, সঙ্গে দেবীর প্রসাদ থাকবে, দুধ থাকবে, তাই খাবে আর কি! তা ছাড়া, মিষ্টি গলায় খাসা গান গাইতে পারে ছেলেটা, বললে দু'চারটে গানই বা কোন না গাইবে! নে, চল, গান গাইতে হবে কিন্তু।

'সত্যি, গদাইয়ের গান শুনে অবধি আর কারু গান কানে লাগে না।' বললে প্রসন্ন। 'গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।'

ফাঁকা মাঠের মধ্যে গদাধর খোলা গলায় গান ধরলে। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমা-কীর্তনের গান। গান গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে গেল গদাধর। মেয়ের দল তাকিয়ে দেখল—এ কি ব্যাপার! গদাধরের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, তার শরীর আড়ষ্ট অসাড়, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দের মত। কি, কি হল তোর? কে কার প্রশ্নের জবাব দেয়? গদাধরের জ্ঞান নেই। ও মা, এখন কি হবে? মেয়ের দল ভয়ে বিশীর্ণ হয়ে গেল। রোদে নিশ্চয়ই ভিরমি গিয়েছে ছেলে, খুব করে জলধারানি দে। হাওয়া কর্, হাত বুলিয়ে দে সারা গায়ে।

কিন্তু গদাধরের সাড়া নেই, সঙ্কেত নেই।

'গদাধর—গদাই!' ব্যাকুল কণ্ঠে কত ডাক, কত কাতরতা! কি করে মা'র কোলে ফিরিয়ে দেব এই ছেলেকে!

হঠাৎ প্রসন্নর মনে ডাক দিয়ে উঠল—যে বিশালাক্ষীকে দেখতে চলেছি সেই আগ বাড়িয়ে আসেনি তো পথ দেখাতে?

'ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো?' প্রসন্ন অস্থির হয়ে উঠল : 'মিছিমিছি তবে গদাইকে ডেকে কী হবে? বিশালাক্ষীকে ডাক। যিনি এসেছেন আগ বাড়িয়ে। আধার পেয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আনন্দে।'

সবাই দেবী-স্তব শুরু করলে। গদাধরের কর্ণমূলে রাখলে দেবী-নাম।

গদাধরের মুখে হাসি ফুটল। সংজ্ঞার লাবণ্য তরল হয়ে এল সর্বাঙ্গে। কেউ আর তাকে গদাই বলছে না, সবাই মা বলে ডাকছে। নৈবেদ্যের ডালি কি হবে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে? ওলো, গদাইকেই সবাই খেতে দে এখানে। সব তবে মাকেই খেতে দেওয়া হবে।

এই গদাধরের দ্বিতীয় ভাবাবেশ।

কালো মেঘের কোলে সিতপক্ষ বক-বলাকার যে রূপ, বিশালাক্ষীরও সেই রূপ। দুইয়ের একই উদ্ভাস, একই তাৎপর্য। একই দিব্য কাব্যের দু'টি শ্লোক।

কামারপুকুরের পাইনদের অবস্থা বেশ শাঁসালো। শিবরাত্রির সময় তাদের বাড়িতে যাত্রা হবে। পালা-ও শিবদুর্গা নিয়ে। ধুমধুল পড়েছে, কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। অসুখ করেছে না কি, আসতে পারবে না। আর যে কেউ সাজবে তেমন লোক নেই। সুতরাং যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? এদিকে, যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি-জাগরণ কি করে হয়? সবাই ধরে পড়ল অধিকারীকে। অধিকারী বললে, আপনারা একজন শিব যোগাড় করুন, বাকিটা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

একবাক্যে সবাই বলে উঠল—গদাধরকে শিব সাজালে কেমন হয়? চমৎকার হয়। বয়েস অল্প হোক, শিবের গান জানে সে অনেক। তাই দিয়ে সে চালিয়ে নিতে পারবে। তারপর শিবের পোশাকে তাকে যা মানাবে, আর দেখতে হবে না। কী যে ঠিক দাঁড়াবে বুঝতে পাচ্ছে না গদাধর। তবু সকলের ধরাধরিতে সে রাজী হয়ে গেল।

আসরে এসে দাঁড়াল সে শিবের মূর্তিতে। একেবারে সেই স্বভাবস্বচ্ছধবল সচ্চিদানন্দ শিব! মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা, অন্য

হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে অনন্ত নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে সুধা-ময়ূখ শশধর। পদপাতে ধৈর্য, অবস্থিতিতে শান্তি। চোখে সেই অনিমেষ দৃষ্টি যা তৃতীয় নয়নের দীপ্ততা। যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব নেমে এসেছেন নরদেহে। সেই তপযোগগম্য শূলপাণি বিশ্বনাথ। যিনি প্রচণ্ড-তাণ্ডব অথচ প্রাণপালক।

অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারদিকে। মেয়েরা যারা আসরে ছিল, হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল, কেউ-কেউ বা শাঁখ বাজালে। হরিধ্বনি করে উঠল পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন।

'মাইরি, কি সুন্দর মানিয়েছে গদাইকে!'

'শিবের পার্ট যে এত ভালো উতরোবে কেউ ভাবিনি।'

'ওকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে দেখছি—'

এমনি বলাবলি করছিল পাড়া-বেপাড়ার ছোকরারা। কিন্তু, ও কি, গদাধর কিছু বলছে না কেন, নড়ছে না কেন? শুধু চেহারা দেখিয়েই কি পার্ট হয়? বলতে-কইতে চলতে-ফিরতে হয় যে। ও কি? দেখছিস? গদাধর কাঁদছে। শিব আবার কাঁদল কখন?

কেউ-কেউ ছুটে গেল গদাধরের কাছে। গদাধরের বাহ্যজ্ঞান নেই। গদাধর তৎস্বরূপ! জল দাও। হাওয়া করো। শিবের ভর হয়েছে, কানে শিবমন্ত্র দাও।

'ছোঁড়াটা রসভঙ্গ করলে মাইরি। এমন পালাটা শুনতে দিলে না।' আপশোষ করলে কেউ-কেউ।

যাত্রা ভেঙে গেল। কাঁধে করে গদাধরকে কারা বাড়ি পেঁছে দিলে। গদাধর তখনো দেহসংজ্ঞাহীন। তখনো শিবময়।

সারা রাত বাড়িতে কান্নাকাটি—গদাধরের জ্ঞান হচ্ছে না। কাকে বলে জ্ঞান, আর কাকেই বা অজ্ঞান। কে বা জাগ্রত, কে বা সুষুপ্ত!

সকালে চোখ মেলল গদাধর। আকাশে চোখ মেলল দিনমণি।

এই আমাদের গদাধর। দু'টি আয়ত-উজ্জ্বল চোখ—যে চোখে শান্তি আর সরলতা—মাথাভরা এলোমেলো চুল—যে-চুলে আনন্দময় ঔদাসীন্য। মুখে অমিয়-মধুর হাসি, যে হাসিতে অহেতুকী করুণা। কণ্ঠস্বরে অমৃতনির্ঝর প্রসন্নতা, যে প্রসাদে অশেষ আশ্বাস। যে দেখে সেই তাকে ভালোবাসে। যে একবার চোখ রাখে সেই আর চোখ ফেরায় না। যদি ভালো কিছু আহার্য পায় ইচ্ছে করে গদাধরকে খাওয়াই। ইচ্ছে করে তার একটু কথা শুনি। যেখানে সে গিয়েছে সেখানে গিয়ে বসি।

এদিকে লেখাপড়ায় এক ফোঁটা মন নেই গদাধরের। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত পড়তে দাও, মন মাতিয়ে পড়বে সে অনর্গল। ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা শুনতে চাও, সবাইকে সে ব্যাকুল করে ছাড়বে। মামুলি পাঠশালায় যেতে তার মন ওঠে না। তার চেয়ে মাঠে-মাঠে তাকে মুক্ত হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াতে দাও, সে মহা খুশি। যা কিছু সুন্দর, তারই উপর তার মনের টান। মনে হয় কি করে এই সুন্দরকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করা যায়! গদাধর তাই কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ে, গলা ছেড়ে গান গায়, দু' হাত তুলে নাচে। শিল্পে, সঙ্গীতে আর নৃত্যে সে সে-এক অনির্বচনীয়কে

উদ্ঘাটিত করতে চায়। আর যা সে কথা বলে তাই সাহিত্য, সাহিত্যের সারবিন্দু। 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, আমাকে শুকনো সন্নেসী করিস নে' এই প্রার্থনাই একদিন করেছিল গদাধর। আমাকে 'রস' দিস, কিন্তু সেই সঙ্গে 'বশে' রাখিস। আমাকে উচ্ছ্বাস দে, সঙ্গে-সঙ্গে সংযমও দে। ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে রূপকেও বিকশিত কর্। আমি তোর কবি হব। তুই যদি মা আদি দেবী, আমিও তোর আদি কবি। কত আর মূর্তি গড়ব, মা, আমি নিজেই এখন নিজেকেই মূর্তি বানাই!

৬

প্রায়ই আজকাল ভাবসমাধি হয় গদাধরের। হরিবাসরে, শিবের গাজনে, মনসা-ভাসানে কোথাও একটু দেব-দেবীর নাম-গান হলেই হয়! শুনতে-শুনতে গদাধর একেবারে বিহ্বল-তন্ময়। সেই তন্ময়তা একটু গাঢ় হলেই ভাবসমাধি। চন্দ্রমণি আগে-আগে ভয় পেতেন, ছেলেকে বুঝি দানোতে পেয়েছে। এখন দেখেন নিজের ভাবে যেমন ডুবে যায় তেমনি আবার নিজের ভাবে উঠে আসে। রোগের চিহ্ন নেই শরীরে। দর্পণের আভা যেন তার সারা গায়ে চমক দিচ্ছে। সেই দর্পণে যেন দেখা যাচ্ছে আরেক মূর্তি—আরেক দেহ! চিন্ময় মূর্তি, চিন্ময় দেহ।

কিন্তু দাদারা ধরে নিয়েছেন বায়ুরোগ হয়েছে। তাই তার উপর আর পড়াশোনার তাড়া নেই, যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। তবু গদাধরের পাঠশালাতে একবার যাওয়া চাই। সংসার চলে না দেখে রামকুমার কলকাতায় গেলেন, সেখানে গিয়ে টোল খুললেন—গদাধরের তখন বারো-তেরো বছর বয়েস, তখনো সে পাঠশালায় যাচ্ছে। পড়তে নয়, ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, দল বাঁধতে। যারা পড়ে জ্ঞানী-গুণী হবে তাদের চিনে রাখতে। যতই কেন না আড্ডা দিক, রঘুবীরের পূজা ঠিক সেরে রাখে, মা'র ঘরকন্নার কাজে যোগান দেয়। রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার, কিন্তু সেও রঘুবীরের উপর বরাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনে-মনে বিশ্বাস, গদাইয়ের যখন অত তুকতাক, তখন একটা কিছু হবেই। যিনি চিন্তামণি তিনিই যখন নিশ্চিন্ত, তখন চিন্তা করে লাভ কি!

বাড়িতে কাজ-ছুট বসে আছে গদাধর—গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে তার বড় বনিবনা। দুপুর বেলা সবাই জোট বেঁধে চন্দ্রমণির কাছে আসে, আর গদাধরকে হরিনাম গাইতে ফরমাশ করে। কিংবা কোনো দিন বায়না ধরে, ধর্মের কোনো উপাখ্যান

বলো। এর চেয়ে আর মনোগত বিষয় কী আছে গদাধরের? গদাধর তখুনি তৈরি! 'মা গো, তুমিও বসে যাও—' 'না রে, বাবা, আমার হাতের কাজ এখনো শেষ হয়নি।' 'সে কি কথা, আমরা আপনার কাজ সেরে দিচ্ছি।' সমাগত মেয়েরা চন্দ্রমণির হাতের কাজ চটপট সেরে দিলে। চন্দ্রমণি বসলেন স্থির হয়ে। গদাধর গান ধরলে, কোনো দিন বা পাঠ। গাঁয়ে যত ভাগবত পাঠ বা গান-কীর্তন হয়, সব শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে গদাধরের। তারপর যা কখনো সে শোনেনি সে সব কথাও তার মুখে এসে জোটে। মেয়েরা তন্ময় হয়ে শোনে। সময়ের হুঁস থাকে না। বিকেলে যে আরেক কিস্তি কাজ আছে বাড়িতে তা ভুল হয়ে যায়। গদাধরের সঙ্গে-সঙ্গে তারাও নাম করে।

নাম কি কম? যা নাম তাই তো রাম। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে সোনাদানা দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন তখন হল না। কিন্তু রুক্মিণী যখন এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ওজন হল। নামের এমনি গুণ। তবু নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধু নাম ধরে ডাকলেই চলে না, তার সঙ্গে চাই একটু প্রেম। যদি নাম করতে-করতে দিন-দিন অনুরাগ বাড়ে, আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ, তা হলে আর ভয় নেই। বিকার কাটবেই কাটবে। তার পরেই তিনি আকারিত হবেন।

ধর্মদাসের মেয়ে প্রসন্ন গদাধরকে ভাবে গোপাল। আর, মেয়েদের মতন এমন হাব-ভাব করে গদাধর, আর-আর মেয়েরা তাকে বলে রাধারাণী।

সীতানাথ পাইনের প্রকান্ড সংসার। আট ছেলে সাত মেয়ে। তা ছাড়া জ্ঞাতি-গুষ্টিও অনেক। তার ঘরে রোজ দশটা শিলে বাটনা বাটা হয়। এত লোকের জায়গা কার আঙিনায় হবে? তাই গদাধরকে ডেকে নিত সীতানাথ। বলত, আমার বাড়িতে কীর্তন করবে এসো। সীতানাথের বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘোরতর পর্দানশিন, সূর্যের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি হয় না। তারা কি করে তবে এই স্বরতরঙ্গ শোনে! কি করে দেখে সেই অনিন্দ্যসুন্দরকে! তারা চন্দ্রমণির সামনে পর্যন্ত বেরোয় না—অথচ গদাধরকে তাদের সংকোচ নেই। গদাধর যেন তাদের অন্তরের মানুষ। ইহকাল-পরকাল সকল কালের চেনা লোক।

কিন্তু দুর্গাদাস পাইনের এটুকুতেও আপত্তি। দুর্গাদাস এই বেনে-পাড়ারই লোক, সীতানাথের প্রতিবেশী। এত বড় ছেলে কেন বাড়ির ভিতরে এসে মেয়েদের সঙ্গে বসে গান করবে এতে তার প্রবল আপত্তি। হোক হরিনাম, হোক গদাধর হীরের টুকরো ছেলে, তবু সমাজ-সংসারে মেয়েদের সম্ভ্রমরক্ষার যে নিয়ম তা মানতে হবে বৈ কি। আমার সংসারে মেয়েদের এমন বেচাল নেই—এমন উটকো লোক কেউ ঢুকতে পারে না আমার বাড়িতে। খুব বারফট্টাই করতে লাগল দুর্গাদাস। কই একটা কাকপক্ষী গিয়ে তার বাড়ির ভিতরের খবর জেনে আসুক তো, দেখে আসুক তো তার মেয়েদের মুখ! আটঘাট বাঁধতে জানা চাই, বুঝলে? হরিনামের পথে ধুলোট হতে দিতে নেই।

সন্ধ্যের দিকে বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সামনে এমনি তম্বি করছেন দুর্গাদাস।

এমনি সময় ঘরের দরজায় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। বেশভূষা দেখেই চিনতে পারলেন দুর্গাদাস। তাঁতিদের কারু মেয়ে হয়তো। পরনে হাতে-বোনা মোটা ময়লা শাড়ি, হাতে রুপোর ভারি পৈঁছা, কাঁখে চুবড়ি—তাতে কয়েক লাছি সুতো।
'কোত্থেকে আসছ?' দুর্গাদাস প্রশ্ন করলেন।
'হাট থেকে।' লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখে ঘোমটা টানল মেয়ে।
'কি হয়েছে? চাও কি?'
সংক্ষেপে মেয়েটি যা বললে তাতে বিশেষ বিচলিত হবার কিছু নেই। পাশের গাঁয়ে মেয়েটির বাড়ি, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাটে গিয়েছিল সুতো বেচতে। হাটের পর বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি দেখলে সঙ্গিনীরা তাকে ফেলেই চলে গিয়েছে। এখন এই ভর-সন্ধ্যের সময় একা-একা বাড়ি ফিরতে তার ভয় করছে। যদি আজকের রাতের মত একটু আশ্রয় পায় তো বেঁচে যায়।
'বেশ তো, ভেতরে যাও, মেয়েদের গিয়ে বলো, থেকে যাবেখন রাতটা। এ আর বেশি কথা কি!' দুর্গাদাস উদারতায় প্রসারিত হলেন।
শরণাগতা প্রণাম করল দুর্গাদাসকে। অন্তঃপুরে গিয়ে বললে সব মেয়েদের। আগন্তুকাকে ঘিরে ধরল সবাই। অল্প বয়স, মিষ্টি কথা, আতান্তরে পড়েছে, সবাই সহানুভূতিতে নরম হল। বললে, থাকবে বৈ কি, একশো বার থাকবে, তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও। কি যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে মেয়েটির। যে তাকে দেখে তারই মনে মমতা লেগে থাকে। থাকবার জায়গা ঠিক হল এক ধারে, মুড়ি-মুড়কি দিয়ে দিব্যি জলযোগ করলে। তন্ন-তন্ন করে দেখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটি, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে, ভাব করলে, জেনে নিলে সুখ-দুঃখের ইতিহাস! যেন কি জাদু জানে, এক মুহূর্তে অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠল।
অন্ধকারে রামেশ্বর চলেছে হনহন করে।
এ কি, কোথায় চলেছেন এত রাতে?
সীতানাথের বাড়িতে।
সেখানে কি?
গদাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত রাত হল, এখনো তার ফেরবার নাম নেই। মা ঘর-বার করছেন। কোথাও মুচ্ছো গেল কি না কে জানে।
ঐ সীতানাথের বাড়িতেই আছে ঠিক। সারা দিন-রাত ঐখানেই পাঠ-কীর্তন করে। ঐখানে গিয়েই হাঁক দিন।
না, সীতানাথের বাড়িতে যায়নি আজ গদাধর। রামেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখল। রাত করে কোথায় এখন তাকে খুঁজবে ভেবে পেল না। পাইন-পাড়ার ঘরে-ঘরে অসহায়ের মত সে হাঁক দিয়ে ফিরতে লাগল—গদাই, গদাই—গদাই আছিস্?
তাঁতি-মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে খোশ-গল্প করছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে উঁচু গলায় হাঁক পাড়ছে বাইরে থেকে। কার নাম ধরে ডাকছে? কান খাড়া করল তাঁতিনী। লাফিয়ে উঠল।

'যাচ্ছি গো দাদা—এই যে আমি এইখানে।' বলে সেই তাঁতিনী এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির মেয়েরা সব বললে গিয়ে দুর্গাদাসকে। দুর্গাদাস চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, 'প্রভু আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন।'

তাই ঠাকুর বলেছেন উত্তর কালে : 'আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি-রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেক দিন মেয়েদের মত কাপড়-গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম। আবার ঐ ভাবেই আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রাখতে পারতুম? দু'জনেই মা'র সখী। আমি আপনাকে শুধু পুরুষ বলতে পারি কই। একদিন আমার ভাবাবস্থায় পরিবার জিগগেস করলে : আমি তোমার কে? আমি বললুম : আনন্দময়ী!'

৭

গ্রামে কিছু হচ্ছে না গদাধরের। তাই তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধরের মন গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরঘুর করে। কত চেনা মুখ, কত মন-কাড়া ভালোবাসা। এই ইট-কাঠের জটিলতার মধ্যে পাওয়া যাবে কি সেই সরল মমতা? সেই নিঃসঙ্গ থাকার শান্তি?

নির্জনে না হলে ভক্তি লাভ হবে কি করে? তাকে ভাববো কোথায়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। একেক বার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, সাফ হল কেমন। তা কাঁড়বার সময় যদি পাঁচ বার ডাকে, ভালো কাঁড়া কেমন করে হবে?

কত জনকেই মনে পড়ে। মনে পড়ে বৃন্দার মাকে। বৃন্দার মা জেতে বামুন, গদাইকে নিজ হাতে হামেসা রান্না করে খাওয়ায়। কিন্তু খেতির মা জেতে ছুতোর, ইচ্ছে থাকলেও ঘরে ডেকে এনে খাওয়াতে পারে না। মনটা কেবল আঁটুবাঁটু করে। মনের কথা মুখে ফোটে না। ধনী কামারণীর বোন শঙ্করী কাছে-পিঠেই থাকে। তাকে একদিন জিগগেস করলে গদাধর : 'আচ্ছা বলতে পারো, খেতির মা আমাকে কি বলতে চাইছে, অথচ যেন বলতে পাচ্ছে না?'

শঙ্করী তো থ! মনের কথাও জানতে পেরেছ তা হলে? বেশ, তবে বলো, কি খাবে, আমি নিয়ে আসছি।

খাবো তো, এখানে এই পথের মাঝখানে খাব না কি? তার ঘরে যাব, ঘরে গিয়ে মেঝের উপর আসন পেড়ে বসে খাব। যা সে নিজের হাতে রেঁধে দেবে—সমস্ত। তার মনের সাধ পূর্ণ করব ষোলো আনা।

তাই গেল ঠিক ছুতোর-বাড়ি। খেতির মা'র হাতের রান্না খেল সে তৃপ্তি করে।

খেতির বাপ কিন্তু স্ত্রীর অনাচার সহ্য করতে পারল না। অনাচার বৈ কি। ছোট জাতের মেয়ে, উচ্চবর্ণের জাত মেরে দিলি? দেবতা খেতে চাইবে বলে তুই তার অন্ন যোগাবি? রাগে দিশেহারা হয়ে গেল খেতির বাপ। পায়ের খড়ম তুলে শক্ত কয়েক ঘা বসিয়ে দিল স্ত্রীর পিঠের উপর।

খেতির মা টলল না একচুল। বললে, 'যতই কেন না মারো আর ধরো, আমার আর কিছুতেই দুঃখ নেই। ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েছি আমি।'

আর মনে পড়ে চিনু শাঁখারিকে।

বয়েস হয়েছে, ছোট দোকান, কষ্টে দিন গুজরায়। কিন্তু গদাধর যখনই দোকানে এসে বসে, মনে হয় কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত। যাই একটু বাড়তি রোজগার হয় তাই দিয়ে মিষ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়ায়। গদাধর খায় আর চিনু দেখে। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সেদিকে খেয়াল নেই।

গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছে চিনু। তার নাম যখন চিনু তখন সেই তো প্রথমে চিনতে পারবে।

একদিন হলো কি, চিনু ফুল তুলে পরিপাটি করে মালা গাঁথলে। কোঁচড়ে করে লুকিয়ে মিষ্টি কিনে আনলে বাজার থেকে। গদাধরকে বললে, 'চলো।'

'কোথায়?'

'মাঠে। যেখানে কেউ কোথাও নেই। যেখানে কেবল তুমি আর আমি।'

চিনিবাস গদাধরকে নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টির গোচরে নেই কোথাও জনমানুষ। উপরে আকাশ-ভরা শান্তির নীলিমা। মালা-মিষ্টি পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে রইল চিনিবাস। সামনে গদাধর। কৃষ্ণকিশোর।

'এ কি চিনিবাসদা, এ কি করছ? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে দাও।'

'দিচ্ছি গো দিচ্ছি—'

আগে মালা দিলে গলায়। কৃষ্ণের গলায় অতসী ফুলের মালা। পরে হাতে করে খাওয়াতে লাগল গদাধরকে। ব্রজের ননীগোপালকে।

জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে চিনিবাসের। মিষ্টিভরা হাত কখনো পড়ছে গিয়ে গদাধরের নাকে, কখনো চোখে, কখনো কপালে। গদাধর হাসছে আর খাচ্ছে।

খাওয়ানোর পর আবার স্তব করতে বসল চিনিবাস। বললে, 'বুড়ো হয়েছি, বাঁচব না বেশি দিন। মর্তধামে তোমার কত লীলা-খেলা হবে, কিছুই দেখতে পাব না। তবু আজ যে আমাকে একটু চিনতে দিলে দয়া করে, তাই আমার পারের কড়ি হয়ে রইল।'

মত্ত অসুরের মত স্বাস্থ্য ছিল চিনিবাসের। দু'হাতে তুলে গদাধরকে কাঁধে চড়িয়ে

বীরবিক্রমে নৃত্য করত। বলত, 'তুমি আমাকে দাদা বলো—চিনিবাস দাদা। আমি যদি তোমার দাদা হই, তবে আমি তো বলরাম।' বলে আবার নৃত্য।

তুমি সমুদ্র আর আমি সামান্য শঙ্খকার।

একবার, মনে পড়ে, চিনু শাঁখারির পায়ে পড়েছিল গদাধর। শুধু চিনুর নয় আর-আর সমবয়সীদেরও। কি খেয়াল হল, সবাইর পায়ে ধরে-ধরে গদাধর মিনতি করতে লাগল, 'ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল—'

সকলে তো অবাক। যত ছোটজাতের লোক, নুয়ে পড়ে সকলের পায়ে ধরা!

আসল কথা বুঝেছিল চিনিবাস। বলেছিল, 'তোমার এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান দেখছ। জাত-বেজাত স্তর-পঙ্‌ক্তি দেখছ না। প্রথম যখন ঝড় ওঠে তখন আম-গাছ, তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম, এটা তেঁতুল—চেনা যায় না।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগে মান-অপমান থাকে না। ছায়া-কায়া থাকে না। সব তুমি-ময়।

মরে যাবে চিনিবাস—এই তার দুঃখ। বয়সে সে জীর্ণ হয়ে এসেছে। মরে গেলে দেখতে পাবে না এই নিত্যলীলা।

রাবণ-বধের পর রাম-লক্ষ্মণ যখন লঙ্কার প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন, রাবণের বুড়ি মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ বিদ্রূপ করে উঠল—যার ছেলে-নাতি-পুতি সব গেল, বংশে যার বাতি দেবার কেউ নেই, তার কিনা নিজের প্রাণের উপর এত টান! নিকষাকে রাম কাছে ডাকিয়ে আনলেন, জিগগেস করলেন, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কিসের ভয়? নিকষা বললে, আমার আর কিছু ভয় নেই, ভয়, যদি মরে গিয়ে তোমার এত লীলা না আর দেখতে পাই। বেঁচে ছিলাম বলেই তো দেখলাম তোমাকে। তাই এখনো বাঁচবার সাধ যেতে চায় না।

কিন্তু কলকাতায় এসে গদাধরের কি চুপচাপ করে বসে থাকলে চলবে? কত সাধ করে তাকে নিয়ে এসেছেন রামকুমার। অক্ষয়কে জন্ম দিয়েই রামকুমারের স্ত্রী মারা গেল আঁতুড়ে—সেই থেকেই সংসারে অনটন। ছেলে গর্ভে আসতেই কেমন হয়ে গিয়েছিল বৌদি, কাঁধে অলক্ষ্মী চেপেছিল। সংসারে নিয়ম ছিল, যে-ছেলের এখনো পৈতে হয়নি সেই ছেলে কিংবা রুগী ছাড়া আর কেউ রঘুবীরের পুজোর আগে জলস্পর্শ করতে পারবে না। রামকুমারের স্ত্রী সেই নিয়ম অমান্য করতে লাগল। বাধার উত্তরে করতে লাগল অবাধ্যতা। রামকুমার বুঝলেন, স্ত্রীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে বা অমঙ্গলের দিন।

হলও তাই। স্ত্রী চলে গেল। সংসারে এল কঠিন দুর্ভাগ্য।

গদাধরের পরে আরেকটি বোন ছিল, সর্বমঙ্গলা। গৌরহাটির রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে, যখন আট পেরিয়ে নয়ে পড়েছে। আর রামসদয়ের বোনের সঙ্গে বিয়ে দিলে রামেশ্বরের। রামেশ্বর গৃহস্থালি দেখুক, তুই, গদাধর, কলকাতা চল্। ওখানে টোল খুলেছি, একটা কিছু হিল্লে তোর হবেই। অন্তত শান্তি-স্বস্ত্যয়নটা তো শিখবি। কলকাতায় অনেক বড় লোকের বাসা, যদি মানুষ হতে পারিস, টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। সংসার স্বচ্ছন্দ হবে।

টাকা? টাকা দিয়ে আমার কী হবে? আমি তো অবিদ্যার সংসার করতে আসিনি। আমি কি ঐশ্বর্যভোগ চাই, না, দেহের সুখ চাই? না, চাই 'লোকমান্য'?

আর, তুমিই বা অত ভাবছ কেন? যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেবেন। যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়। যে সদ্-ব্রাহ্মণ, যার কোনো কামনা নেই, হাড়ির বাড়ি থেকে হলেও তার সিধে আসে। যেমনি আসে তেমনি যায়। এই যদৃচ্ছা লাভই ভালো। সাঁকোর তলা দিয়েই জল বেরিয়ে যায় সহজে। সঞ্চয় করে কি হবে? কত কষ্ট করে মৌমাছি চাক তৈরি করে, কে আরেক জন এসে ভেঙে দিয়ে যায়। উপার্জন করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? নরজন্ম পেয়েছি, ঈশ্বর দর্শন করব না?

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি প্রায়ই আসত দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে তার বড় ক্ষোভ। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি—তা দিয়ে তোমার সেবা হবে।'

যেই এ কথা শোনা ঠাকুর অমনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। কে যেন মাথায় লাঠি মারলে!

বাহ্যজ্ঞান পাবার পর বললেন বিমর্ষ কণ্ঠে : 'অমন কথা মুখে এনো না। অমন কথা যদি আর বলো, তোমার এখানে এসে তবে কাজ নেই।'

'কেন, কি হল?'

'তুমি জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই—কাছেও রাখবার জো নেই।'

লক্ষ্মীনারায়ণও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বেদান্তবাদী। তর্কপটু।

'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে?' লক্ষ্মীনারায়ণ হাসল : 'তবে তো জ্ঞান হয়নি আপনার!'

'না বাপু, অত দূর হয়নি এখনো।'

যারা-যারা কাছে বসে ছিল, হেসে উঠল।

তবু লক্ষ্মীনারায়ণ দমবে না। সে ধরল হৃদয়কে। হৃদয় মানে হৃদয়রামকে, ঠাকুর যাকে ডাকতেন হৃদে বলে। ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার মেয়ে হেমাঙ্গিনী। তারই ছেলে এই হৃদয়।

হৃদয়কে দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গছাতে চাইল টাকা। বললে, 'আমি হৃদয়কে দিচ্ছি।'

'তা হলে আমাকেই বলতে হবে, একে দে, ওকে দে। না দিলে রাগ হবে মনে-মনে, অভিমান হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস রাখতে নেই। জিনিস থাকলেই প্রতিবিম্ব হবে। বুঝলে, ও সব হবে না এখানে—যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।'

গদাধর কি রাজার বেটা নয়?

বাবাকে মনে পড়ে গদাধরের। স্নান করবার সময় জলে দাঁড়িয়ে 'রক্তবর্ণং চতুর্মুখং' বলে ধ্যান করতেন, আর তাঁর চোখ জলে ভেসে যেত। খড়ম পায়ে দিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, গাঁয়ের দোকানিরা দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন উনি স্নান করতেন তখন আর কেউ সাহস করে নাইতে যেত না। খোঁজ নিত—তিনি

কি স্নান করে গেছেন? রঘুবীর-রঘুবীর বলতেন আর তাঁর বুক লাল হয়ে যেত। সেই বাপের ছেলে গদাধর।

শুধু এইটুকুই তার পরিচয়? কে বলে! সে জগৎপিতার ছেলে।

সে পড়াশোনা জানে না। শাস্ত্র-সংহিতা সে কিছু ছোঁয়নি। সে হয়তো পুরো 'বাবা' বলে ডাকতে পারে না, উচ্চারণ জানে না সবটার, সে হয়তো আধো-আধো ভাষায় শুধু 'পা' বলে। বাপের টান কি শুধু 'বাবা' বলা ছেলের উপর বেশি হবে, 'পা' বলা ছেলের চেয়ে? না, বাবা বলবেন, এ আমার কাঁচ ছেলে, বাবা ঠিক বলতে না পারলেও ডাকছে ঠিক আকুল হয়ে, অতএব একেই আগে কোলে নিই হাত বাড়িয়ে!

কিন্তু সেই যে বাবা স্বপ্ন দেখলেন গয়াধামে গিয়ে, রঘুবীর বলছেন তোমার ঘরে আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, তার কী হবে? তবে, আসলে, তার কী কেউ পিতা নেই? সে তবে কে?

এই আত্মদর্শনই তো ঈশ্বরদর্শন।

৮

রানি রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্তু আসলে অষ্ট সখীর এক সখী। কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চার কন্যার মা। আর, তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস। আমাদের সেজ বাবু।

বিয়ের অল্প কাল পরেই মারা যায় করুণাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের বিয়ে দেন। কিন্তু নাম তার সেই সেজ বাবুই থেকে গেল। স্বামী রাজচন্দ্র তখন গত হয়েছেন। বাড়ির পাশেই গোরা সৈন্যদের ব্যারাক। একদিন মাতাল হয়ে এক দল সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। আত্মীয়-পুরুষেরা কেউ বাড়িতে নেই, রুখতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে দারোয়ানেরা। সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে শুরু করেছে। এখন কি করেন রাসমণি? রাসমণি অস্ত্র ধরলেন। ছিলেন লক্ষ্মী, হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

রাজেন্দ্রাণী রাসমণি। রাজেন্দ্রাণী হয়েও অন্তরে ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-মৃত্তিকা। সংসারে কিছুই চান না, শুধু সেই মহাযোগেশ্বরী মহাডামরী সাট্টহাসা মহাকালীর রাঙা পা দু'খানি কামনা করেন। শেরেস্তায় যে শিলমোহর

চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা—'কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।' ঐশ্বর্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ।

বারো শো পঞ্চান্ন সাল। রানি কাশী যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অন্নপূর্ণাকে, মহাভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। অঢেল টাকা এ জন্যে আলাদা করা আছে। অজস্র হাতেই তা ব্যয় করবেন। ঘাটে বাঁধা হয়েছে নৌকো, সারি-সারি প্রায় একশোখানি। থরে-থরে সম্ভার সাজানো হয়েছে। কত দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন। সবাই বিশ্রাম করছে নৌকোতে। শুধু একজন জেগে আছে। সে স্বয়ং কুবের। রানির কোষাগারের দ্বারপাল।

রাত। নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রানি ঘুমিয়ে পড়েছেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন, স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর্। আমাকে অন্নভোগ দে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথমে ভেবেছিলেন গঙ্গার পশ্চিম কূলে বালি-উত্তরপাড়ার জমি নেবেন। কথায় আছে, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারের বুদ্ধি-শুদ্ধি আজগুবি। টাকার লোভে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকায় যে ঘাট তৈরি হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে যাবেন না। না যাবেন তো না যাবেন—এমন কথা বলতে পারলেন না রাসমণি। তিনি পূর্ব কূলে উপস্থিত হলেন।

পূর্ব কূলে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেষ্টি নামে এক সাহেব, আর বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অনুকূল। তাই, সন্দেহ কি, ঐ পূর্ব কূল দেবীই নির্বাচিত করেছেন পূর্ব থেকে।

নয় লাখ টাকায় মন্দির আর মূর্তি তৈরি হল। নবরত্নবিশিষ্ট কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমন্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় দশ বছর।

এই দশ বছর—উদ্যোগ থেকে উদ্‌যাপন পর্যন্ত—রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে ছিলেন, ছিলেন কঠোর নিয়মে-সংযমে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন, হবিষ্যান্ন খেয়েছেন, শুয়েছেন শুকনো মেঝের উপর। আর জপ করেছেন অবিশ্রান্ত। কিসের জন্যে এত অনুষ্ঠান? এই দেহ-মনকে যদি তাঁর উপযুক্ত বাহন করতে না পারি, তবে দেবী শুনবেন কেন আবাহন? হয় আসবেন না, নয় তো এসে ফিরে যাবেন।

তৈরি হল মন্দির। তৈরি হল দেবীমূর্তি। পন্ডিতেরা পাঁজি দেখতে লাগলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার শুভদিন কবে ঠিক করা যায়!

মূর্তি ছিল বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে। দেখা গেল, মূর্তি ঘামছে।
রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে ভবতারিণী বলছেন, 'আমাকে আর কত দিন কষ্ট দিবি এমনি বন্ধ করে রেখে। শিগ্গির আমাকে মুক্তি দে—'
রানি অধীর হয়ে উঠলেন। আর দেরি করা যায় না। আসন্ন যে কোনো শুভদিনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দেবীকে।
স্নানযাত্রার দিনই নিকটতম শুভদিন। কিন্তু এ দেবী শক্তিস্বরূপিণী—একে বিষ্ণু-পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি করে? হোক বিষ্ণু-পর্বাহ, তবু আর অপেক্ষা করা যায় না—মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তাই মাধুরী—তাই 'পরমাসি মায়া'। যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই লজ্জা। যিনি মুণ্ডমালিনী, তিনিই পদ্মালয়া। সর্বার্থসাধিকা।
বারো শো বাষট্টি সালের বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। দেবী ভবতারিণী। পাষাণময়ী অথচ করুণাদ্রবা। মৃত্যুবর্জিতা শিবসুন্দরী। ত্রিনয়নী, তেজোরূপোজ্জ্বলা। পুরাতনী, পরমার্থা। কাললোকবাসিনী কালী কপালিনী।
রূপার সহস্রদল পদ্ম, তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন। তাঁরই হৃদয়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিণী। পরনে লাল বেনারসি, মাথায় মুকুট, গলায় সোনার মুণ্ডমালা। নানা অলঙ্কারে ঝলমল করছেন সর্বাঙ্গে। কটিতটে সারে-সারে খণ্ডিত নরকর। দেবী চতুর্ভুজা—দুই বাম করে নৃমুণ্ড আর অসি, আর দক্ষিণ দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা।
দেবী দক্ষিণাস্যা।
এততেও যেন সম্পূর্ণ হল না। সোয়া দু'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগনা কিনলেন। মা'র সেবায় দান করলেন শালবাড়ি। তবুও হল না পুরোপুরি। মা অন্নভোগ চেয়েছেন, তার ব্যবস্থা কি?
পণ্ডিতেরা বললেন, তার বিধি নেই।
মাকে চাট্টি খেতে দেব ভক্তি করে, তার বিধি নেই?
না, নেই। তুমি রানি হলে কি হবে, তুমি অব্রাহ্মণী। অব্রাহ্মণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার।
ব্যথায় চমকে উঠলেন রাসমণি। এ কিছুতেই হতে পারে না। বিধিতে আর ভক্তিতে এত প্রভেদ কি করে সম্ভব? নিচু ঘরে জন্মেছি বলে কি আমি মা'র সন্তান নই? মা কি নিচু হয়ে অন্ন খান না?
না। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করবেন রাসমণি। এ বিধি নয়, বিধি-বিড়ম্বনা। এ কিছুতেই মানতে পারব না। অভুক্ত থাকতে দেব না মাকে। তাঁর নিত্য ভোগের ব্যবস্থা করব।
সাবধান! অমন যদি কিছু করো, ব্রাহ্মণেরা মন্দিরে এসে প্রসাদ নেবে না। তোমার দেবালয় অধর্মাশ্রিত হবে।
তবে উপায়? রানি দিকে-দিকে লোক পাঠালেন। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে, কোথাও কেউ কোনো ব্যবস্থা দিতে পারে কি না।

সবাই একবাক্যে বললে, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নয়। রানি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এতে কাঁদবার কি আছে? এত বড় একটা কীর্তি স্থাপন করলে, দেশে-দেশে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ল—এ কি কম কথা? কী হবে অন্নভোগে? অন্নপূর্ণার কি অন্নের অভাব আছে সংসারে?

তবু মেয়ের সংসারে মা এলে কি মেয়ে তাঁকে উপবাসী রাখে? আমি নাম-কাম চাই না। আমি চাই ভক্তি। আমি চাই সন্তোষ। মাকে অন্নভোগ দিতে না পেলে আমার সন্তোষ নেই।

আবার কাঁদতে বসলেন রাসমণি।

হঠাৎ রামকুমারের টোল থেকে নতুন বিধান এসে পৌঁছুল। প্রতিষ্ঠার আগে রানি যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অন্নভোগ চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে মন্দিরে ব্রাহ্মণদের প্রসাদ নিতে কোনো বাধা নেই।

অন্ধকারে রাসমণি দেখতে পেলেন মা'র আনন্দ চক্ষু। অভয় চক্ষু।

কিন্তু এ ব্যবস্থা পণ্ডিতদের মনঃপূত হল না। তবু, উপায় কি। স্বয়ং রামকুমার ভট্টাচার্য এ-পাঁতি দিয়েছেন, এ কে খণ্ডায়? সাধ্য নেই কেউ এ নিয়ে বিতণ্ডা করে।

রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পূজক-পুরোহিত কে হবে? গুরুবংশের কেউ পূজা-অর্চনা করে এ রানির অভিপ্রেত নয়। তারা সবাই অশাস্ত্রজ্ঞ, আচারসর্বস্ব। তাদের ডাকতে তাই তাঁর মন উঠল না। তবে কাকে ডাকেন? যাকেই ডাকেন সেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বলে পাঠায়, পুজো করা দূরস্থান, যে-দেবতাকে অব্রাহ্মণী প্রতিষ্ঠিত করবে তার পায়ের গোড়ায় মাথা পর্যন্ত নোয়াব না। পারব না ব্রাত্য হতে।

এখন তবে কি করা যায়! এই মহা দুস্তরে পথ কোথায়?

শেষ পর্যন্ত রানি রামকুমারকেই লিখলেন উদ্ধার করতে। রামকুমার বললেন, 'পূজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন, বেশ, আমিই পূজক হব।'

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর এসেছে কালীবাড়িতে। বিরাট উৎসব। যাত্রা, কালী-কীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ—কত কি হচ্ছে চার পাশে। কত দিক থেকে কত লোক এসেছে, সংখ্যায় লেখা-জোখা হয় না। সদাব্রত অন্নসত্র বসে গেছে। আহূত-অনাহূতের ভেদ নেই—শুধু দাও আর খাও, নাও আর ধরো। চলেছে চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র ঢালাঢালি।

গদাধরের মনে হল ভগবতী যেন কৈলাস শূন্য করে চলে এসেছেন মন্দিরে। কিংবা গোটা রজতগিরিই যেন রানি রাসমণি তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে দিয়েছেন। এত আয়োজন এত অজস্রতা, তবু গদাধর মন্দিরের অন্নভোগের অংশ নিল না। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেল, আর তাই খেয়ে কাটাল সমস্ত দিন। বেলা পড়লে হেঁটে চলে গেল ঝামাপুকুর।

'কিছু খেলি নে কেন রে গদাই?' জিগগেস করেছিলেন রামকুমার।

'কৈবর্তের অন্ন খেতে পারি না দাদা।'

গদাধর এখন বড় হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে। ভাবলেন রামকুমার। নইলে ছেলেবেলায় ধনী কামারণীর হাতে কি করে সে ভিক্ষে নিয়েছিল?

পরদিন সকালে উঠেও গদাধর দেখলে দাদা ফেরেননি। তার মানে কি? দাদা কি কায়েমী হয়ে থেকে যাবেন নাকি মন্দিরে? এ কি অভাবনীয়?

একের পর এক সাত-সাত দিন কেটে গেল, তবু দাদার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না, গদাধর চলল দক্ষিণেশ্বর।

'এ কি, বাড়ি যাবেন না?'

'না রে—ভাবছি, জীবনের ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে দেব।'

গদাধর অবাক হয়ে রইল। বললে, 'তবে কি—'

'হ্যাঁ, মন্দিরের পূজার ভার নিয়েছি। টোল এবার তুলে দেব। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রবল আপত্তি তুলল গদাধর। তা কি করে হতে পারে? বাবা কোনো দিন শূদ্রযাজী হননি, তাঁর ছেলে হয়ে কোন যুক্তিতে তাঁর প্রথার প্রতিকূলতা করবেন? ও সব ছাড়ুন।

রামকুমার অনেক বোঝালেন। অনেক তর্ক ফাঁদলেন। গদাধর নির্বিচল। নিষ্ঠায় নিয়তস্থিত।

তা হলে ধর্মপত্র করা যাক। বললেন রামকুমার। যা ধর্মপত্র তাই দৈবাদেশ।

একটা ঘটিতে কতগুলি কাগজের টুকরো। তাতে কোনোটায় 'হাঁ' বা কোনোটায় 'না' লেখা। অনপেক্ষ কোনো শিশুকে ডেকে আনো, সে যে কোনো একটা টুকরো তুলুক হাতে করে। সেই টুকরোতে যদি 'হাঁ' থাকে, তবে করো; আর যদি 'না' থাকে, তবে কোরো না। জানবে তাই তোমার দেবতার ইঙ্গিত।

ধর্মপত্রে হাঁ উঠল।

তার মানে রামকুমার করুক যেমন করছে পূজকের কাজ।

এখন গদাধরের কাজ কী? ঝামাপুকুরের টোল তো পটল তুলল, সে খায় কি, থাকে কোথায়?

রামকুমার বললেন, 'মন্দিরের প্রসাদ খাবি নে?'

'না।'

'কেন গঙ্গাজলে রান্না, মাকে নিবেদন করা, খেতে দোষ কি?'

'আমি স্বপাকে খাই।'

'বেশ তো, তবে সিধা নিয়ে যা না গঙ্গাপারে, নিজের হাতে রান্না করে খা গে। গঙ্গাকূলে সবই পবিত্র—এ তো মানতেই হবে।'

গঙ্গার নাম শুনে গদাধর গলে গেল। সকল-কলুষভঙ্গা গঙ্গা। 'তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।' সেই ভবভয়দ্রাবিনী ভাগীরথী। তাকে গদাধর ফেরায় কি করে?

তবে তাই। গদাধর থাকবে দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাবে। গঙ্গাজলের রান্না।

কেন, কেন এই নিষ্ঠার কাঠিন্য?

ঠাকুর বললেন, 'পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে আরেকটি কাঁটা যোগাড় করে পায়ের কাঁটাটি বের করতে হয়। তার পরই ফেলে দিতে হয় দুটো কাঁটাই। তেমনি অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্যে জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করো। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুটো কাঁটাই ফেলে দাও। তখন বিজ্ঞান অবস্থা। ত্রিগুণাতীত অবস্থা।'

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নিষ্ঠা না থাকলে সত্যে পৌঁছুবে কি করে? নিয়মে না থাকলে কি করে হবে নিয়মাতীত? আগে শাসন চাই, শম-দম-সাধন চাই, তবে তো নির্বাণে পৌঁছুবে। আগে কঠিন হও, তবে তো সরল হবে। আগে ডুব দিতে শিখবে তবেই তো খুঁজে পাবে গভীরতা।

চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্যকে সে ছুঁয়ে দিলে। 'আমায় ছুঁলি?' শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁইনি, তুমিও আমাকে ছোঁওনি। শুদ্ধ আত্মা যে নির্লিপ্ত।'

এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর ভাব। সে কখনো বালক, কখনো জড়, কখনো উন্মাদ, কখনো পিশাচ। সে তখন নিয়মাতীত। তার সর্বত্র ব্রহ্মময়। তার লজ্জা ঘৃণা ভয় ভাবনা নেই—কোনো গুণেরই আঁট নেই। সে কখনো বা জড়ের মত চুপ করে বসে থাকে। কখনো হাসে কখনো কাঁদে। এই বাবুর মত সাজে-গোজে, খানিক পরে আবার বগলের নিচে কাপড়ের পুঁটলি পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ডোবার জল আর গঙ্গাজল সমান দেখে।

এই যে নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা—এতে আসতে হলে কত নিষ্ঠা-নিয়ম কত শাসন-বন্ধন দরকার তার কি ঠিক আছে?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরে এক পাগল এসে উপস্থিত। এক হাতে একটা কঞ্চি, অন্য হাতে একটা ভাঁড়, পায়ে ছেঁড়া জুতো। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেল। তার পরে মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে বসল। গমগমে শব্দে কেঁপে-কেঁপে উঠল মন্দির। ভাত জোটেনি, অতিথিশালার পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল ভাত। পথের কুকুরের মত। এমন কি পথের কুকুরদের সরিয়ে-সরিয়ে কাড়াকাড়ি করে। হলধারী ছুটে এল মন্দির থেকে। লোকটার পিছু-পিছু ধাওয়া করলে। বললে, তুমি কে?

পাগল বললে, 'চুপ। কাউকে বলিসনি। আমি পূর্ণজ্ঞানী।'

পূর্ণজ্ঞানী?

'হ্যাঁ, তোকে বলে যাই। যেদিন এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখনই বুঝবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।' বলেই পাগল চলে গেল কোন দিকে।

ঠাকুর সব শুনলেন। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন হৃদয়কে। মাকে বললেন, 'মা, আমারো কি তবে এমনি হবে?'

ভয় কি। মা'র মুখে সেই অভয়ঙ্কর প্রসন্নতা। চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ চলে গেলে জাহাজের আর কী থাকে? তার কলকব্জা ইস্ক্রুপ-বলটু লোহা-লক্কড়

সব আলাদা হয়ে খুলে যায়। তেমনি তোর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখন তুই আর তুই থাকবি না। তুই তো কাঠ নস যে পোড়ালে ছাই থাকবি। তুই কর্পূর, পোড়ালে তোর কিছুই বাকি থাকবে না। শেষ বিচারের পর তোর সমাধি হয়ে যাবে। নুনের পুতুল হয়ে নামবি তুই লবণের সমুদ্রে।

তোর ভয় কি। তোর তো আমিই আছি। মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মা।

৯

'এ ছেলেটি কে?' খানিকটা তন্ময়ের মতই জিগগেস করলেন মথুরবাবু।

উদারদর্শন, নবীন ব্রহ্মচারী। কুমার-কোমল। এ কে? একে কি আগে কোথাও দেখেছি? কোথায় দেখব? কত দিন আগে?

কিছুতেই মনে করতে পারছেন না মথুরবাবু। তবে কি পূর্বজন্মে দেখেছি? কিংবা, জন্ম-মৃত্যুর পরপারে?

'কে এই ছেলেটি?'

না, স্বগতোক্তি নয়, প্রশ্ন করছেন রামকুমারকে।

'আমার ভাই।' স্নিগ্ধ-বিনয়ে বললেন রামকুমার।

কিন্তু মথুরামোহনের কে? কেউ যদি না-ই হবে তবে তার দিকে মন ছুটে চলেছে কেন?

'এখানে, এই মন্দিরে, কাজ করবে?'

'দেখব জিগগেস করে।'

বললেন বটে রামকুমার, কিন্তু জিগগেস করতে সাহস পেলেন না। তিনি জানেন তো তাঁর ভাইকে। দক্ষিণা নিয়ে ঠাকুর-পুজো করবার সে ছেলে নয়।

এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়রাম এসে হাজির।

'এ কি, তুই এখানে কোত্থেকে?' অবাক হলেন রামকুমার।

'বর্ধমানে গিয়েছিলাম চাকরির সন্ধানে। চাকরির নামে লবডঙ্কা। শুনলাম মামারা এখন মস্ত হয়েছেন, রানি রাসমণির কালীমন্দিরে আছেন পুজুরী হয়ে। ভাবলাম যদি তাঁদের ধরলে একটা হিল্লে হয়।'

ষোলো বছরের বলবান ছেলে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দৃঢ়কায়। সুপুরুষ। সদানন্দ।

'ওরে, হৃদে এসেছিস্?' আনন্দে ছুটে এল গদাধর। যদিও বছর চারেকের ছোট,

সম্পর্কে ভাগ্নে, তবু একেবারে নিকটতম বন্ধু। ছেলেবেলার খেলুড়েদের একজন। সহজ স্নেহে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। বললে, 'তুই কী মনে করে?' হৃদয় কিছু বলল না, চুপ করে রইল। কিন্তু অন্তরে বসে অন্তরবাসিনী বললেন, 'তোরই জন্যে হৃদয়কে পাঠিয়ে দিলাম তোর কাছে। ও না হলে তোকে দেখবে-শুনবে কে? সামলাবে কে? সাধনায় বসে যখন সব ভুলে যাবি তখন তোর শরীর কে বাঁচিয়ে রাখবে? তুই যদি শিব, ও তোর নন্দী। তুই যদি রাম, ও তোর লক্ষ্মণ।'

গাছের যেমন ছায়া গদাধরের তেমনি হৃদে।

দুটিতে কাছছাড়া নেই। সর্বক্ষণ সমভাব। শুধু খাবার সময় আলাদা। হৃদয় মন্দিরে প্রসাদ নেয়, গদাধর গঙ্গাতীরে রান্না করে।

সেজবাবুকে এড়িয়ে চলে গদাধর। কালী-ঘরে কোনো একটা চাকরিতে তাকে ঢুকিয়ে দেবেন তাঁর মনের কথা চোখের ভাষায় যেন ধরা পড়েছে। চাকরি-বাকরির মধ্যে আমি নেই, ধরা-বাঁধার মানুষ নই আমি। তার চেয়ে নিজের মনে শিব গড়ি, পুজো করি নিজের মনে। সেই আমার ভালো। আমার ধ্যানের আরাম।

এমনি মূর্তি গড়ছে গদাধর। মূর্তি গড়ে পুজোয় বসেছে এক দিন। পুজোয় বসে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই সুযোগে চুপিসারে কখন কাছে এসে পড়েছেন সেজবাবু। তন্ময় হয়ে দেখছেন সেই শিবমূর্তি। তার গঠনলাবণ্য। শুধু ভাস্কর্য নয়, ভাস্কর্যের চেয়েও যা বড় জিনিস তাই যেন ফুটে উঠেছে সর্বাঙ্গে। তা ভক্তি। তা মনোমাধুরী। হাতের পেলবতায় গলে-গলে পড়ছে যেন অন্তরের অনুরাগ।

'এ মূর্তি কে করেছে?'

'গদাধর।' হৃদয় কাছাকাছিই ছিল, বললে। এক মুহূর্ত কি ভাবলেন মথুরবাবু। বললেন, 'পুজো হয়ে গেলে আমাকে দেবে এই মূর্তি?'

আপত্তি কি! চক্ষের নিমেষে এমনি কত-শত মূর্তি গড়তে পারবে গদাধর। হৃদয় সম্মতি দিল।

মূর্তি হাতে পেয়ে আরো ব্যাকুল হলেন মথুরবাবু। যার চকিত কল্পনার এই রূপ, তার অতলতল ধ্যানের না-জানি কেমন চেহারা! ডেকে পাঠালেন রামকুমারকে। গদাধরকে রাজী করান, তাকে কাজ দেন মন্দিরে। অসম্ভব—মুখ গম্ভীর করলেন রামকুমার। গদাধরের চাকরিতে রুচি নেই।

জেদ চাপল মথুরবাবুর। যে করেই হোক গদাধরকে কালীর কোলের কাছে টেনে আনতেই হবে।

'বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

গদাধর চেয়ে দেখল সেজবাবুর চাকর।

আর পালাবার জো নেই। সেজবাবু একেবারে চোখের উপর দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন, যাও না!' হৃদয় তাড়া দিল : 'এত ভয় কিসের?'

'গেলেই বলবে, এখানে থাকো, চাকরি করো। ও আমি পারব না।'

'দোষ কি! করলেই বা চাকরি! লোক কত সৎ আর মহৎ। এমন লোকের আশ্রয়ে চাকরি করা তো সুখের কথা।'

'তুই কত বুঝিস! চাকরি নিলেই চিরকাল বাঁধা পড়ে যেতে হবে। আমার তা পোষাবে না। তাছাড়া—' গলা নামাল গদাধর : 'তাছাড়া কালীপুজোর ভার নেওয়া চারটিখানি কথা নয়। দেবীর গায়ের অত গয়নার কে ভার নেবে?'

'আমি নেব।'

'তুই নিবি? সত্যি বলছিস?'

'চাকরি খুঁজতে এসেছি আমি এখানে। আমার একটা কিছু জুটে গেলেই হল।'

'তবে যাই, বলি গে সেজবাবুকে।'

হাতে চাঁদ পেলেন মথুরবাবু। গদাধরকে বললেন, 'তুমি মাকে রোজ সাজাবে, মা'র "বেশকারী" হলে তুমি।' আর, হৃদয়কে বললেন, 'তুমি হলে ওর সাগরেদ।'

এ সময় একটা কাণ্ড ঘটল।

ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে রাধাগোবিন্দের পূজারী। রোজ সকালে রাধারানি আর কৃষ্ণকে মন্দিরের সিংহাসনে এনে বসান আর বিকেল হলে নিয়ে যান শয়নঘরে। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। দুপুরে ভোগরাগ অনেক হয়ে গিয়েছে, এখন বিরামপর্ব। কক্ষান্তরে রাধারানিকে আগে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন, এখন গোবিন্দকে নিয়ে চলেছেন ক্ষেত্রনাথ। হঠাৎ পড়ে গেলেন পা পিছলে। নিজে সামলেছেন কিন্তু বিগ্রহের একটি পা গিয়েছে ভেঙে।

তুমুল শোরগোল উঠল মন্দিরে। এ কি অঘটন! এ কি অশুভ সূচনা!

ক্ষেত্রনাথকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল সরাসরি। কিন্তু তাতে কী হবে? বিগ্রহ তো তাতে অভঙ্গ হয়ে উঠবে না!

তা উঠবে না, কিন্তু এখন উপায় কী বলো। রানি রাসমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। মথুরবাবুকে বললেন, সভা বসাও, ডাকাও পণ্ডিতদের, বিধি নাও।

বসল পণ্ডিতসভা। সব ন্যায়চুঞ্চু তর্কচূড়ামণির দল। অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে আর সংস্কৃত আওড়ে তাঁরা পাঁতি দিলেন—ভাঙা বিগ্রহকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে, আর তার জায়গায় বসাতে হবে নতুন দেবমূর্তি।

সঙ্গে-সঙ্গে নতুন দেবমূর্তির ফরমায়েশ গেল।

কিন্তু রানির মনে সুখ নেই। অন্তরের অন্ধকারে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন গোবিন্দকে, তুমি কি আমার কাছে শুধু পাথর না তামা-পেতল যে, তোমাকে জলে ফেলে দেব? তার চেয়ে তুমি আমাকে চোখের জলে ফেলে রাখো।

মথুর বুঝলেন রানির অস্থিরতা। বললেন, 'গদাধরকে গিয়ে জিগ্গেস করি।' মনে হল যেন কোথাও একটা সহজ সমাধান আছে। যিনি সরলের মধ্যে সরল তিনিই তরল করে দেবেন।

গদাধরকে বললেন সব মথুরবাবু। এখন তুমি কী বলো। তোমার মন কী বলে!

'যেমন পণ্ডিত তেমনি তাদের পাঁতি।' ঝলসে উঠল গদাধর : 'রানির জামাইয়ের যদি আজ ঠ্যাং ভাঙত, তবে রানি কী করতেন? গঙ্গায় জামাইকে ফেলে দিতেন আর তার জায়গায় বসাতেন এনে নতুন জামাই?'

সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কখনো না। জামাইকে রানি চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে তুলতেন। এখানেও সে-ব্যবস্থা করলেই হয়।'

সবাই বাক্যহীন।

'হ্যাঁ গো, ভাঙা পা জোড়া দেয়ার কথা বলছি। ভাঙা পা জুড়ে দিলেই ঠাকুর আবার আস্ত-সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার চলবে তাঁর সেবা-পূজা।'

একেবারে সোজাসুজি অন্তরের কথা। মন যেমনটি চায় তেমনি। যা মন থেকে আসে, বিবেক থেকে আসে, তাই ঈশ্বর থেকে আসে। যেখানে সরল-স্বচ্ছ সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

এমন যে সহজ মীমাংসা হতে পারে—শুনে পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পেড়ে আপত্তি তুললে, কিন্তু মনের কাছে আবার শাস্ত্র কি! মনের জোরের কাছে কার জোর খাটবে!

রানির বুক ভরে গেল আনন্দে। দু'চোখে ধারা নেমে এল। কত সহজের মধ্যে তুমি আছ! কত সহজের মধ্যেই ধরা দিলে! মনে-মনে বললেন গোবিন্দকে।

গদাধরকে বললেন, 'তুমিই তবে ভাঙা পা জুড়ে দাও। তুমি ওস্তাদ কারিকর, তুমিই বৈদ্যনাথ।'

ভাঙা পা জুড়ে দিল গদাধর। একেবারে নিখুঁত করে দিল। কারুর সাধ্যি নেই চোখে দেখে বার করে দেয় জোড়ার দাগ। কারুর সাধ্যি নেই বার করে দেয় এই জাদুকরের জারিজুরি।

ফরমায়েশি মূর্তি এসে পেঁছুল। মথুরবাবু বললেন, 'দেখ তো, ও আগের মতন হল কি না।'

চোখ মেলে নয়, চোখ বুজে দেখল গদাধর। দেখল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে। না, তেমনটি হয়নি। তেমনটি আর হয় না। দরকার নেই নতুন বিগ্রহে। পুরোনো বিগ্রহই ভালো। কত প্রীতি-ভক্তির কোমলতা তার গায়ে মাখা। কত অশ্রুতে তাকে স্নান করানো। কত প্রার্থনায় তার ঘুম ভাঙানো। তাকে কি আর বিদায় দেওয়া চলে? না কি বিদায় দিলেই তার দায় যাবে?

কিন্তু যাই বলো খুঁতে হয়ে রইল যে। অঙ্গহীন বিগ্রহে কি পূজা সিদ্ধ হয়? খুব হয়। প্রিয় জন যদি খুঁতে হয় তবে সেই খুঁতের জন্যেই সে প্রিয়তর।

বরানগরে কুটিঘাটার কাছে রতন রায়ের ঘাটে গদাধর বেড়াতে এসেছে। সেখানে ডাকসাইটে জমিদার জয়নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় রানি রাসমণির কালী-বাড়ির কথা উঠল। রাধাগোবিন্দের কথা।

'হাঁ হে মশাই, ওখানকার গোবিন্দ কি ভাঙা?'

'তোমার বুদ্ধি কি গো!' গদাধর হেসে উঠল : 'যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন?'

জয়নারায়ণ চুপ।

ভাবাবস্থায় পড়ে গিয়ে ঠাকুরের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।

'হাত ভাঙলো কেন জানিস?' ভক্তদের সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।
কে কি বলবে! ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছে এ একটা দৈব-বিপাক ছাড়া আর কি। কিন্তু ঠাকুর বললেন, 'হাত ভাঙলো—সব অহংকার নির্মূল করার জন্যে। এখন আর এই খোলের ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি তিনি রয়েছেন।'
রানি রাসমণি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন ভাঙা বিগ্রহের মধ্যেই গোবিন্দ রয়েছেন। জ্ঞানে যিনি সত্তায় যিনি প্রাপ্তিতে যিনি তিনিই গোবিন্দ।

১০

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গদাধর এবার পূজারী হল। আর হৃদয় হল কালীর সাজনদার।
কিন্তু এ কেমনতরো পূজা! সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে চক্ষের পলকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানবিলীন হয়ে বসে থাকা। মূর্তিকে প্রতীক না ভেবে প্রাণধারী বলে ব্যবহার করা। এমন পূজা দেখেননি কোনো দিন মথুরবাবু।
এমন তন্ময়, পূজা দেখবার জন্যে কারা ভিড় করেছে তাদের দিকে লক্ষ্য নেই। সে তো অল্প কথা, স্বয়ং মথুরবাবুকে পর্যন্ত দেখছে না।
দেখছে, মন্ত্র বলবার সময় মন্ত্রের উজ্জ্বল বর্ণ কি করে তার দেহের সঙ্গে মিশে-মিশে যাচ্ছে। কি করে সর্পিণী কুণ্ডলিনী সুষুম্না দিয়ে সহস্রারে উঠছে ধীরে-ধীরে। শরীরের যে-যে অংশ ত্যাগ করে যাচ্ছে তাই অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর যে-যে অংশে ভেদ করে যাচ্ছে তাতে ফুটে উঠছে বিকচ পদ্ম। পূজার জায়গায় চারদিকে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আর বহ্নিপ্রাকার তৈরি হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে। তন্মনস্ক হয়ে মন্ত্র পড়ছে আর সমস্ত শরীর হয়ে উঠছে জ্বলিত-তেজস্বান।
যে দেখছে সেও তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।
ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো? মন হবে ঠিক তেলের ধারার মত। এক ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। পাখি মারবার জন্যে ব্যাধ তাগ করছে। সামনে দিয়ে বর চলে গেল মিছিল করে, কত গাড়ি-ঘোড়া কত বাজনা কত হট্টগোল। ব্যাধের হুঁস নেই। জানতেও পেল না বর গেল চতুর্দোলায়।
বুঝলে, স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যাবে, সাপও বুঝতে পারবে না কিসের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। মনের বা'র-বাড়িতে কপাট দিয়ে

বোসো। কপাটের বাইরে পড়ে থাকবে তোমার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ—তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ উপচার। বন্ধ ঘরে তুমি আর তোমার মন। প্রতীক্ষা আর অন্ধকার। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। বারুদ আর বহ্নিকণা।

প্রথম-প্রথম সব ভোগের থালা আসবে ভারে-ভারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রবঞ্চনা। বিচলিত হবি না, তলিয়ে যাবি, তলিয়ে যাবি। অন্ধকার থেকে চলে আসবি শুভ্রতায়। দেখবি, আর ওরা আসবে না। আর কার কাছে আসবে?

'ধ্যান করতে-করতে প্রথম-প্রথম আমার কি দর্শন হতো জানিস?' বললেন এক দিন ঠাকুর, 'স্পষ্ট দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল-দোশালা, এক থালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে আর তাদের ফাঁদী নথ। মনকে শুধোলুম, মন তুই কি চাস, কোনটা চাস? মন বললে কোনোটাই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কিছুই চাইবার নেই।'

রামকুমার খুশি। মন্দিরে এবার মন দিয়েছে গদাধর। কিন্তু যার জন্যে পুজো সেই রোজগার হচ্ছে কই? ফিরছে কই সংসারের অবস্থা? চাকরি করতে বসে টাকার প্রতি টান না হলে চলবে কেন? টাকা ছাড়া উপায়ান্তর কি?

'আচ্ছা, এটা তোমার কী মনে হয় বলতে পারো?' ঠাকুর জিগ্‌গেস করলেন ডাক্তারকে—নাম ভগবান রুদ্র। 'টাকা ছুঁলেই হাত আমার এঁকে-বেঁকে যায়। নিশ্বাস পড়ে না।'

বলেন কি। ডাক্তার একটা টাকা বের করে ঠাকুরের হাতে রাখলেন। কি আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে ঠাকুরের হাত বেঁকে গেল। রুদ্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস।

তা ছাড়া—চিন্তিত মনে ভাবছেন রামকুমার—ছেলেটার কেমন উদাস-উদাস ভাব। পঞ্চবটীর জঙ্গলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে একলা। কখনো বা সকাল-সন্ধ্যেয় গঙ্গার পাড় ধরে দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়ায় আপন-মনে। কারুর সঙ্গে মেশে না, হাসে না, কি চায় কি ভাবে, কে জানে। বাড়িতে মা'র জন্যে মন কেমন করছে হয়তো।

একদিন ডেকে প্রশ্ন করলেন। 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে রে গদাই? বাড়ি যাবি?'

'মা'র জন্যে?' কি বলবে ঠিক করতে পারল না গদাধর। বললে, 'না, বাড়ি যাব কেন?'

তবে এমনি ঘুরে বেড়াস কেন বনে-বাদাড়ে? কেন নির্জনে গিয়ে বসে থাকিস? কী হয়েছে?

নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় কই। সোনা গলিয়ে গয়না গড়াব, তা যদি গলাবার সময় পাঁচ বার ডাকে, তা হলে গয়না গড়াবো কি দিয়ে? ধ্যান করবো মনে বনে কোণে। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভালো।

হয়তো এ মেজাজ চলে যাবে গদাধরের। এ একটা ক্ষণিক ঔদাস্য ছাড়া কিছু নয়। তেমনি ভাবলেন রামকুমার। কালীকে বললেন, মা, গদাধরকে সুমতি দাও।

শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে রামকুমারের। চলে যাবার আগে ছেলেটাকে মানুষ করে দিতে হয়। যাতে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে। যাতে দু'পয়সা ঘরে এনে খাবার

যোগাড় করতে পারে সংসারের। অন্তত তাঁর চাকরিটা সে ধরতে পারে সহজে। তাই ভেবে গদাধরকে তিনি চণ্ডীপাঠ শেখাতে লাগলেন। শেখাতে লাগলেন কালী-পুজোর বিধি-নিয়ম। বিস্তীর্ণ অনুশাসনের রীতি-নীতি।

কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না নিয়ে পুজো করা যাবে না কালীকে। দীক্ষা নেব তো শক্তিসাধক কোথায়? আছে—বৈঠকখানার কেনারাম ভট্চাজ। দক্ষিণেশ্বরে আসে-যায়, রামকুমারের জানা-শোনা। একজন নামজাদা তান্ত্রিক। গদাধরের পছন্দ হল। বললে, এঁকেই তবে গুরু করি।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিল গদাধর। যেই তার কানে মন্ত্র পড়ল, চীৎকার করে উঠল গদাধর, ডুবে গেল গভীর সমাধিতে। গুরু তো হতবুদ্ধি। তাঁর নিজের মন্ত্রের এত শক্তি তা তাঁর নিজেরই অজানা।

'এক কাজ কর এখন থেকে।' বললেন রামকুমার : 'তুই কালীঘরে আয়, আমি রাধাগোবিন্দের ভার নিই।'

মথুরবাবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

'আমি শাস্ত্রের কি জানি? না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি আইনকানুন। কোথায় কি ত্রুটি করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

'তোমাকে মানতে হবে না শাস্ত্র। দরকার নেই জেনে।' বললেন মথুরবাবু : 'তোমার ভক্তি আর আন্তরিকতাই শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। ভক্তিভরে যাই তুমি দেবে দেবীকে তাই তিনি গ্রহণ করবেন।'

বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল গদাধরের। এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও—মা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর। বড়লোক নয় শুধু, বড় মানুষ। মা মথুরবাবুকে জুটিয়ে দিলেন।

'মাকে বললুম, মা, এ দেহরক্ষা কেমন করে হবে? সাধুভক্ত নিয়েই বা কেমন করে থাকব? একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। মা সেজবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। চোদ্দ বছর ধরে সেবা করলে সেজবাবু।'

রামকুমার বললেন, এবার একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। হৃদয় এল রামকুমারের জায়গায়। ছুটি পেল রামকুমার। বাড়ি যাবার আগে মুলাজোড় গিয়েছিল কি কাজে, সেখানেই চোখ বুজলে।

বাবার স্থলে দাদা—দাদার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। তখন তাকে ঈশ্বর-তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে মৃত্যুর রহস্য ছেদন করবার আকুলতা। তাই দাদার জন্যে শোক মিশে গেল ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়। যদি ঈশ্বর বুঝি তা হলে মৃত্যুকেও বুঝব। থাকেন যদি ঈশ্বর, তাহলে আর মৃত্যু নেই।

কচ নির্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। সমাধি ভাঙবার পর একজন প্রশ্ন করলে, এখন কী দেখছ? কচ বললেন, তখন যা দেখেছি, এখনো তাই। দেখছি, জগৎ যেন তাঁতে জ্বরে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ, তিনিই সর্বময়। যা কিছু হয়েছে, তিনিই হয়েছেন। কিছু নেবার কিছু ফেলবার এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

মা যেন আলো করে বসে আছেন!

মা'র পূজার ভার নিয়েছে গদাধর। ভার নিয়েই নিজেকে ঢেলে দিয়েছে, বিকিয়ে দিয়েছে। মা'র কোলে চড়ে বসেছে। নিজে মা'র হাত ধরেনি—বলছে, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল। আমি যদি তোর হাত ধরি, পড়ে যেতে পারি হাত ফসকে। কিন্তু তুই যদি একবার আমার হাত ধরিস আমার আর ভয় নেই।

ভগবানকে কে জানবে? জানবার চেষ্টাও করি না। আমি মাকে জানি, তাই মা বলে ডাকি। যা ভালো বুঝবেন, করবেন। বেড়াল-ছানার মত হেঁসেলে রাখলে তিনিই রাখবেন, আবার বাবুদের বিছানায় এনে শোয়ালে তিনিই শোয়াবেন। আমি কেন বলতে যাব? ইচ্ছা হয় জানাবেন, না-হয় নাই জানাবেন। মা হয়ে বুঝবেন না তিনি সন্তানের ব্যাকুলতা?

ছোট ছেলে, মা'র ঐশ্বর্যের সে কী বোঝে? তার মা আছে এই তার পরম ঐশ্বর্য।

মা গো, তুই যেন তিন-ভুবন আলো করে বসেছিস।

মা'র মূর্তি রোজ ফুলে আর চন্দনে সাজায় গদাধর। মূর্তির গায়ে হাত লাগে আর চমকে-চমকে ওঠে। মনে হয় এ যেন নিশ্চল পাষাণ নয়, প্রাণময়ী জননী। পাথরে শৈত্য নেই, এ যেন প্রফুল্ল প্রাণতাপ। যেন এখুনি চোখের পালক নড়ে উঠবে, কথা কয়ে উঠবেন, হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন কোলের কাছে।

কই, অনুভব-অনুমানে নয়, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হবি কবে?

রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, তখন শয্যা ছেড়ে একা-একা বেরিয়ে পড়ে গদাধর। সকাল হলে ফেরে। দু চোখ ফোলা, জবাফুলের মত লাল। যেন সমস্ত রাত নির্জনে বসে সে কেঁদেছে, দু'চোখের পাতা মুহূর্তের জন্যেও এক করেনি। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মত চেহারা।

'কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে?' হৃদয় ধরে পড়ল একদিন।

'ঘুম আসে না। তাই ঠান্ডায় ঘুরে বেড়াই।' পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল গদাধর।

'ঘুম আসে না মানে? না ঘুমুলে শরীর যে ভেঙে পড়বে একেবারে।'

শুষ্ক-শুভ্র চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর: 'ঘুম না এলে আমি করব কি!'

তখনকার মত চেপে গেল হৃদয়। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। হৃদয় ঘুঘু ছেলে, ঠিক বার করে ফেলবে।

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী বা আমলকী আর অশোক এই পাঁচ বৃক্ষের সমাহারের নাম পঞ্চবটী। তখন পঞ্চবটীর চার পাশে ঘোর জঙ্গল, ঘোরালো অন্ধকার। দিনের বেলায়ও ওদিকে মাড়াতে গা ছমছম করে। একে গোরস্থান তায় অন্ধকারের জড়ি-পটিতে গাছপালার গোলকধাঁধা—রাত্রে সেখানে ভূত-প্রেতের মাতামাতি চলে। কারুর সাহস নেই ওদিকে পা বাড়ায়।

যেমন-কে-তেমন রাত নিবিড় হয়ে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে গদাধর। পিছু-পিছু হৃদয়ও বেরিয়ে পড়েছে সন্তর্পণে। দেখি কি করে। কোথায় যায়।

কি সর্বনাশ! সেই সর্বগ্রাসী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গদাধর।

মা গো, মন্দির এখন বন্ধ, কিন্তু তোর এই আকাশ-ভুবন-জোড়া চিরসুন্দরের মন্দিরে তো দরজা পড়ে না। আমি চুপি-চুপি তাই চলে এসেছি তোর কোলের কাছে। এই

অন্ধকারে তোর হাতের স্পর্শ, এই স্তব্ধতায় তোর নিশ্বাস, এই প্রতীক্ষায় তোর পদধ্বনি। আমাকে দেখা দে।

বাইরে হৃদয় দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। হাঁকডাক দিলে শুনতে পাবে না গদাধর, হয়তো গ্রাহ্যও করবে না। তবে কি উপায়ে তাকে নিরস্ত করা যায়। টেনে আনা যায় ঐ জঙ্গল থেকে। শেষকালে সর্পাঘাতে মারা যাবে বুঝি।

একের পর এক ঢিল ছুঁড়তে লাগল হৃদয়। ভূতের আস্তানা, নিশ্চয় ভূতেই ঢেলা মারছে। যদি হুঁস হয়, যদি বা একটু ভয় পায়!

কা কস্য পরিবেদনা! একটি পাতারও চাঞ্চল্য নেই। যেমন নিরেট স্তব্ধতা তেমনি নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভয় পেয়ে হৃদয়ই পিছু হটল। ফিরে এল বিছানায়। ঘুমুতে পারল না।

পরদিন ফাঁকায় পেয়ে পাকড়াল গদাধরকে। বললে, 'রাত্রে জঙ্গলে ঢুকে কর কী?'

'ধ্যান করি।'

'ধ্যান কর? কার?'

'আমার মা'র। মা'র মন্দির বন্ধ হয় না দিনে-রাত্রে।'

'কিন্তু, জঙ্গলে কেন?'

'নির্জন না হলে ধ্যান করবার জোর আসে না মনের মধ্যে। ঐ আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে কামনা সিদ্ধ হয়।'

'তোমার আবার কামনা কী?'

'একমাত্র কামনা—মাকে দেখব, মাকে পাব, মা'তে মিশে থাকব।'

কিন্তু এ সব কাজ ঠিক হচ্ছে না। মন্দিরে সেবা-পূজার পরিশ্রমেই তুমি যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছ। তার উপর আহারে তোমার রুচি নেই, দেহের কোনো আরাম নেই। শেষ কালে রাতের ঘুমটুকুও যদি বিসর্জন দাও তুমি পাগল হয়ে যাবে। এ সব ছাড়ো।

মাকে তো তাই বলি—আমাকে পাগল করে দে। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

কিন্তু জায়গাটা তুমি ভালো বাছোনি। ওখানে ভূতের আড্ডা। রাতদিন দাপাদাপি করে। লোফালুফি করে ঢিল নিয়ে। টের পাও না?

গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে গেলেও টের পাই না।

ঢিল ছুঁড়ে নিরস্ত করা গেল না গদাধরকে। একদিন শেষ কালে সাহস সঞ্চয় করল হৃদয়। মামার ভাগ্নে সে—কিসের ভয়? গভীর রাত্রে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে বনের মধ্যে। চলে এল আমলকী গাছের কাছাকাছি।

কিন্তু গাছের তলায় সে কী দেখছে? সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল হৃদয়। মামা সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে না কি?

দেখছে নিরবকাশ নগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে গদাধর। নিবাত দীপশিখার মত নিষ্কম্প। গিরিশৃঙ্গের মত সমাহিত।

ধ্যান করবে তো করো, কিন্তু এ কী পাগলামী! শুধু পরনের ধুতিই ত্যাগ করেনি,

গলার পৈতে পর্যন্ত খুলে রেখেছে। হৃদয়ের সহ্য হল না। এগিয়ে এসে ধমকে উঠল : 'এ কি হচ্ছে? পৈতে-কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?'

'ও, তুই! হৃদে? এ সব ফেলে দিয়েছি কেন জিগ্‌গেস করছিস? এরা হচ্ছে ছেলের মুখে চুষি-কাঠির মত। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে মা আসে না। যখন চুষি ফেলে চীৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আসে। অহং-এর মায়ার রঙ-চঙ আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, অন্তরের অরণ্যে বসে ডাকছি মাকে চেঁচিয়ে। মা, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আয় আমাকে কোলে নিতে।'

উত্তর মনের মত হল না হৃদয়ের। যত খুশি ডাকো, কিন্তু দিগ্বসন হবার কী হয়েছে!

'তুই কী জানিস!' ঝলসে উঠল গদাধর : 'অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে আছে মানুষ। ঘৃণা লজ্জা ভয় কুল শীল মান জাতি আর অভিমান—এই অষ্ট পাশ। মাকে ডাকতে হলে পাশমুক্ত হয়ে ডাকতে হয়। অহং-এর আঁশটি থাকলেও তিনি আসেন না। তাই ও-সব খুলে রেখেছি। ধ্যানের পর ফিরব যখন আবার অজ্ঞানের মেলায়, তখন আবার ও-সব পরে নেব।'

গোপীদের বস্ত্রহরণ হয়েছিল জানিস্? তার মানে কি? তার মানে আর কিছুই নয়—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শুধু লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও-পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন।

পরিধেয় আর পৈতে—এ দুটো উপাধি ছাড়া কিছু নয়। অভিমানের চিহ্ন। আমি বামুন, জাতে-জন্মে সকলের চেয়ে বড়, এই অহংকার। এই অহংকার বর্জন না করলে দীনতা আসে না। দীনতা না এলে সরলতা আসে না। আমার মা'র আরেক নাম সরলতা।

আমি কী? আমি কি বস্ত্র না উপবীত? আমি কি হাড় না মাংস? রক্ত না নাড়ীভুঁড়ি? খোঁজো। খুঁজে কী পাচ্ছ দেখতে? দেখছ, আমি নেই, শুধু তিনি। আমার কিছুই উপাধি নেই, শুধু তাঁর ঐশ্বর্য।

রামচন্দ্রকে বললেন হনুমান, 'রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। কখনো ভাবি তুমি সেব্য, আমি সেবক। কখনো ভাবি তুমি প্রভু, আমি দাস। কিন্তু, রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তাই। তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

যা সোঽহং তাই তত্ত্বমসি।

হৃদয় মামাকে বকতে এসেছিল, সব অন্য রকম হয়ে গেল। বললে, 'অহংকার যায় কই? এই যায় আবার এই আসে।'

তাই তো বলি, আমি যখন যাবে না, তখন থাক শালা দাস-আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমি ঈশ্বরের ছেলে এ অহংকার ভালো।

হাজার বিচার করো, আমি যায় না, চায় না যেতে। ভাবো একবার, চারদিকে অনন্ত জল, উপরে-নিচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে জলে জলময়। সেই জলের মধ্যে একটি কুম্ভ আছে। কুম্ভের বাইরে যেমন জল তেমনি ভিতরেও জল। জলে জল।

তবু কুম্ভটি তো তখনো আছে। ঐটি হচ্ছে আমিরূপী কুম্ভ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে ততক্ষণ আমি-তুমি আছে। তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি আকাশ আমি পৃথিবী।
'কিন্তু কুম্ভ যখন থাকবে না? ভেঙে যাবে?'
গদাধর আবার ধ্যানস্থ হল।
তখন রাম আর হনুমান এক। তখন সে এক অন্য কথা। তখনকার কথা তখন।

১১

'মা গো, তুই কই? আমাকে কৃপা কর্। আমাকে দেখা দে। রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি নে? আমি কি দোষ করেছি জানিয়ে যা। এত কান্নায়ও কি সব দোষ ধুয়ে গেল না? আমি ধন জন ভোগ বিভব কিছুই চাই না, মা। শুধু তোকে চাই। তুই দয়া কর্। দেখা দে।'
চোখের জলে বুক ভেসে যায় গদাধরের। অশ্রুভরা গলাতেই ফের গান ধরে :

> আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
> ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যবে মুণ্ডমালা কোথা পেলি!

পরের দিন আবার কান্না : 'মা গো, আরেক দিন চলে গেল। বৃথাই গেল। তুই এলি না। এই তো সামান্য আয়ু, তার মধ্যে আরো একদিন নিয়ে নিলি, মা। আমার কান্না কি তুই শুনিস না? আমার কান্নায় কি জোর নেই? আমি কি পারছি না কাঁদতে?'
নুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে মুখ ঘষে গদাধর। বলে : 'মা, তুই কোথায়? তুই কি সত্যি আছিস? না, সব মায়া, মিথ্যা, সব মনের ভুল? যদি তুই আছিস, তোর জন্যে যখন এত আলো এত অন্ধকার, তখন তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? রামপ্রসাদ তো তোকে দেখেছে। তোকে তবে ছলনা বলি কি করে? তুই আয়। দেখা দে। চোখের সামনে দাঁড়া।' মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে গদাধর। চুল ছিঁড়ছে। মাটিতে মুখ ঘষছে। চোখের জলে কাদা করে ফেলছে।
'আহা, ছোকরার মা মরেছে বুঝি।' পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতূহলে। 'কিসে ম'ল? কবে? মাকে খুব ভালোবাসত, তাই না?'

চার পাশে ভিড়, তবু গদাধরের লজ্জা নেই, লৌকিকতা নেই। এক বিন্দু বিরতি নেই কান্নার।

'এক-এক করে দিন চলে যাচ্ছে, মা। এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আর দেরি সহ্য হচ্ছে না! নরজন্ম যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রে বলে, তুই-ই সত্য, তুই-ই একমাত্র অধিগম্য। শাস্ত্র কি সব গাঁজাখুরি? তুই কি ভাঁওতা? সমস্ত একটা ভেল্কি-বাজি? সমস্ত জগতের কি কেউ জননী নেই? যদি থাকে তবে সে কি আমারো জননী নয়?'

যন্ত্রণায় ছটফট করছে গদাধর। মনে হচ্ছে এক ঘরে আছে একতাল সোনা, অন্য ঘরে ঢুকেছে এক চোর। মাঝখানে শুধু একটা পাতলা যবনিকা। সোনা নেবার জন্যে চোর কি পাগল হয়ে ফিরবে না? চাইবে না সে পর্দাটা দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলতে? টুকরো-টুকরো করে ফেলতে?

গুরু নেই, সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ কেউ নেই যে, রীতি-নীতি বা পদ্ধতি-প্রকরণ শেখায়। এমন কেউ স্বজন-বন্ধু নেই যে অভিজ্ঞতার কথা বলে। শাস্ত্রপুঁথি তো চিরকালের জন্যে শিকেয় তোলা। কোনোই সহায়-সম্বল নেই গদাধরের। শুধু আছে উত্তুঙ্গ বিশ্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা।

পুজোয় নিয়ম মত আর বসতে পারে না গদাধর। কেমন যেন সে হয়ে গিয়েছে। মূর্তির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনো-কখনো, ঘুমের মধ্যে, শিশু যেমন কাঁদে তেমনি করে কেঁদে ওঠে। পুজো করতে-করতে হঠাৎ কখনো ফুল নিয়ে নিজের মাথার উপর রাখে আর পূজা ভুলে ডুবে যায় সমাধিতে। ফুল দিয়ে দেবীকে সাজাচ্ছে তো সাজাচ্ছেই, শেষ আর হচ্ছে না। আরতি করছে তো করছেই, দীপ থেকে ঘণ্টায়, আবার ঘণ্টা থেকে দীপেই ফিরে আসছে। দেরি করছে, প্রতীক্ষা করছে। এই বুঝি মা জেগে উঠবেন।

'আমার কথা তুই কেন শুনছিস না মা? আমি তোর অযোগ্য ছেলে বলে কি তোর স্নেহেরও অযোগ্য? আমি বেদ-বেদান্ত কিছু জানি না বলে কি তোর স্নেহও জানব না?'

সবাই বিদ্রূপ করছে। বলছে, আহা মরি! কী পুজোই না হচ্ছে!

গদাধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকের মুখের দিকে সে চাইবে না। সে চেয়ে আছে মা'র মুখের দিকে। ঘুম নেই। খাবার গলছে না গলা দিয়ে। সমস্ত মুখ আর বুক লাল। তবু, কোথায় মা! কোথায় জগদীশ্বরী!

যেমন করে ভেজা গামছা নিংড়োয় তেমনি করে কে বুকের মধ্যিখানটা নিংড়োচ্ছে গদাধরের। মনে ভয় ঢুকেছে, হয়তো ইহজীবনে মা'র দর্শনলাভ হবেই না। মা থাকতেও মাকে যদি না পাই তবে কী হবে বেঁচে থেকে? জীবনের আর তবে মূল্য কি? হঠাৎ কালী-ঘরে যে খাঁড়া ঝুলছিল তার উপরে নজর পড়ল। গদাধর শিশুর মতন ছুটে গিয়ে পেড়ে আনলে সেই খড়্গ। এই মুহূর্তেই জীবনের সে অবসান করে দেবে। আত্ম-রক্তপাতে জননীর নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে।

গলায় আঘাত করতে যাচ্ছে, অমনি সামনে মা এসে দাঁড়ালেন।

মা! তুই মা? তুই এলি এত দিনে?
মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর।
'দেখলুম—কী দেখলুম—যেন ঘর-বাড়ি ছাদ-দেয়াল জানলা-দরজা আড়াল-আবডাল সব এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল, মিশে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু এক সীমাহীন উজ্জ্বল সমুদ্র। চৈতন্য-সমুদ্র। যেদিকে তাকাই, দেখি তার জ্বলন্ত ঢেউ আমাকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে। চার দিক থেকে ছুটে আসছে। চোখের পলকে আমাকে আচ্ছাদন করে ফেলল, ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিল একাকার করে। কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেলুম।'
কিন্তু ঐ কি তোমার মা? ঐ তোমার মাতৃরূপ? শুধু চৈতন্যময়ী জ্যোতি? তোমার মা হাসে না, কথা বলে না, খায় না, হাঁটে না?
কি জানি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আমাকে ডুবিয়ে নিয়ে গেল অতলে। আমি আনন্দে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠলুম। মনে হল ও তো ঢেউ নয়, মা-ই আমাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।
জল আর বরফ, বরফ আর জল। যাই জল তাই বরফ, যাই বরফ তাই জল।
নির্জনে গোপনে বসে কাঁদতে লাগল গদাধর : 'মা গো, তুই যে কেমন তাই আমাকে দেখিয়ে দে। তুই সাকার কি নিরাকার বুঝতে পারি না। তুই কালী না ব্রহ্ম তা তুই-ই জানিস। তুই যা হ, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে।'
পরে আবার বলতে লাগল আকুল হয়ে : 'ভক্তের কাছে একবার ব্যক্তি হয়ে দেখা দে মা! একবার বরফ হয়ে ওঠ। তারপর যখন জ্ঞানসূর্য উদয় হবে তখন না-হয় বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল হয়ে যাবি। আমি তোর মা-রূপটি ভালোবাসি। আমায় তুই মা হয়েই দেখা দে। আমি তোর সন্তান, আমার সন্তান-ভাব।'
একবার দেখে কি তৃপ্তি আছে গদাধরের? সে বহুবার, অনন্ত বার দেখতে চায়। মায়ে পূর্ণ হয়ে থাকতে চায়, লীন হয়ে থাকতে চায়। যা পূর্ণ তাই লীন। চাই সেই অবিরাম যোগ। অবিচ্ছিন্ন আনন্দ।
লোক দাঁড়িয়ে থাকে চার দিকে, কত কি মন্তব্য করে, গদাধর কান পাতে না, চোখে দেখে না। মনে হয় সব পটে-আঁকা ছায়ামূর্তি। অবস্তু, অসত্য। মনে হয় সংসারে শুধু মা আর মা'র জন্যে এই কাতর কাকুতি ছাড়া আর কিছু নেই। তাই কে কি বলবে বা ভাববে কিছু আসে-যায় না গদাধরের। শুধু আসে-যায়, মা কবে আবার দেখা দেবেন, কবে থাকবেন চিরদ্যুতি হয়ে!
একমাত্র হৃদয়ের দুশ্চিন্তা। এ যে কঠিন রোগ হয়ে পড়ল মামার। কাজের বার হয়ে পড়ল ক্রমে-ক্রমে। সাধনা করতে বসে স্নায়ুবিকার হল। চিকিৎসা করতে হয়। ভূকৈলাসের রাজার যে কবরেজ ছিল, নামজাদা বদ্যি, তাকে খবর পাঠাল। কবরেজ এসে নাড়ী টিপলে। ওষুধ দিলে। এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের ওষুধ মাতৃ-দর্শন। মাতৃস্পর্শন!
হৃদয় ভাবলে, কামারপুকুরে খবর পাঠাই। মা'র ছেলে ফিরে যাক মা'র কাছে।

১২

শুধু একবার দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলে চলবে না। চোখের সামনে দাঁড়াতে হবে স্থির হয়ে। শুধু একটু হাত বাড়িয়ে দিলি, বা দু'টি চোখ নাচালি, বা ছুটে পালিয়ে গেলি চুল এলিয়ে, তাতে হবে না। শান্ত হয়ে সর্বসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে থাকতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে। পায়ে-পায়ে, চোখে-চোখে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে। পৃথিবীকে ঘিরে যেমন বাতাসের প্রাণস্পর্শ তেমনি আমাকে ঘিরে তোর অচঞ্চল অঞ্চল।

'মন রে, ঐ দ্যাখ।'

কি দেখব?

ভৈরবকে দ্যাখ, মা'র নাটমন্দিরের ছাদের আলসেয় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। অমনি নিশ্চল ষড়্ভাবশূন্য হয়ে বসবি, চোখ রাখবি মা'র পদ্মপদের উপরে। শরীরে ঝড় বয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে সব ছাদ-দেয়াল। তুই নড়বি না। তুই নড়বি কেন? যার নাড়ীর টান সে নড়ুক।

আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝছি না। কিংবা কিছুই হচ্ছে না মাথামুণ্ডু। মন রে, মাকে তাই তুই বল কেঁদে-কেঁদে। বল, আমাকে শিখিয়ে দে মা, কি করে তোকে দেখতে পাব। আমি একেবারে নিরেট, আমি না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি যাগযজ্ঞ, তুই না বলে দিলে কে বলে দেবে? তুই-ই বল, তুই ছাড়া আমার কি আর কেউ আছে?

মনকে এ কথা বলতে বলে দিয়ে চোখ বুজল গদাধর। ধ্যানে নিশ্চিহ্নচেতন হয়ে গেল। মনে হল কে যেন শরীরের হাড়ে-হাড়ে জোড় খাইয়ে তালা মেরে দিচ্ছে। একটু যে নড়বে-চড়বে, বা আসন বদলাবে তার সাধ্য নেই। আবার যতক্ষণ না গ্রন্থিগুলি খুলে দিচ্ছে ততক্ষণ এমনি স্থাণু হয়ে বসে থাকো জড়পুত্তলির মত। মন রে, বসে থাক। ভালোই তো, থাক বসে। যে তোকে বসিয়ে রেখেছে, সে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে দেখি।

কি দেখছিস?

জ্যোতির্বিন্দু দেখছি।

সর্ষেফুল দেখছিস। তার মানে কিছুই দেখছিস না।

না। এখন আর বিন্দু নেই। পুঞ্জ-পুঞ্জ হয়ে উঠেছে।

তার পর?

গলানো রূপোর স্রোত চলেছে পৃথিবীতে। সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। উঠেছে? তবে ধৈর্য ধর্। এবার দেখা দেবেন জ্যোতির্ময়ী। জগদ্ভাসিনী।

ঘরে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে গদাধর। সমাধি হয়েছে। সম্যক প্রকারে ধারণ করার ভাবই তো সমাধি। মা আগে আংশিক ছিলেন, কখনো প্রসারিত একখানি হাত, কখনো স্থির-স্থিত দু'টি পা, কখনো বা হাসির ঝিলিক দেওয়া একটি ক্ষণচকিত চাহনি—এখন মা সম্যকসম্পূর্ণ হয়ে উঠছেন। সমগ্র, সর্বাঙ্গসম্পন্ন। অষ্টৈশ্বর্যে সৌষ্ঠবান্বিত।

ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে পাঁয়জোর বাজিয়ে কে উঠছে রে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে? গভীর রাতে নির্জন মন্দিরের চাতালে কে এমন ছুটোছুটি করছে? ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে এল গদাধর। দেখল, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, মা মহামায়া মুক্তকেশে মন্দিরের দোতলার বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রলয়-ঘনঘটা ঘোররূপা প্রচণ্ডা। দিগ্‌বস্ত্রা নবনীল-ঘনশ্যামা। পুবে একবার কলকাতার দিকে তাকাচ্ছেন, আরেক বার তাকাচ্ছেন গঙ্গার দিকে, পশ্চিমে। সর্ববর্ণময়ী, পরব্রহ্মস্বরূপিণী।

মা আমার কালো কেন বলতে পারিস? যার আদিও নেই অন্তও নেই তাকে তুই কোন রঙ দিয়ে বোঝাবি? যার কোনো রঙ-ই নেই, সে কালো ছাড়া আর কি?

মা আমার উলঙ্গিনী কেন? মা যে অদ্বিতীয়া। যেখানে দ্বিতীয় বলে কেউ নেই, সেখানে আবরণের কথা ওঠে না! যে অন্তহীন তাকে তুই আবরণ দিয়ে ঢাকবি কি করে?

মন্দিরে ঢুকল গদাধর। মন্দিরে মূর্তি নেই, তার বদলে সশরীরে মা আছেন বসে। গদাধর তাঁর নাকের নিচে হাত রাখল, হাতে স্পষ্ট নিশ্বাসের স্পর্শ। মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে রেখেছে, দেখল, গায়ের রঙে ঘর আলো করে মা খেতে বসেছেন। এক-এক দিন মন্ত্র বলবার পর্যন্ত ফুরসত দেন না, নৈবেদ্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে বসেন। 'দাঁড়া, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস।' চেঁচিয়ে উঠল গদাধর।

হৃদয় ছুটে এল। দেখল, জবা-বেলপাতা নিবেদন করবার আগেই মামা নৈবেদ্যের থালা নিবেদন করছে মাকে।

'এ কি মামা, এ কি করছ?'

'কি করব। রাক্ষুসির যে তর সইছে না। খিদের জ্বালায় নোলা সকসক করছে।'

শুধু তাই নয়। নৈবেদ্যের থালা থেকে এক গ্রাস ভাত নিয়ে মামা সিংহাসনে উঠে মা'র মুখে ঠেকিয়ে বলছে, 'খা, খা, বেশ করে খা—'

হঠাৎ সুর বদলে বলছে, 'কি, আমাকে খেতে হবে? আমি না খেলে খাবি নে? বেশ, খাচ্ছি—' বলে গ্রাসের খানিকটা নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিলে। পরে উচ্ছিষ্টাংশ মা'র মুখে দিয়ে বললে, 'নে, এবার খা। আমি তো খেলাম—'

হৃদয় স্তম্ভিত। নিঃসন্দেহ, বদ্ধ পাগল হয়েছে মামা। ফুল-বেলপাতা মায়ের পায়ে না দিয়ে নিজের পায়ে রাখছে। মাকে পূজা না করে নিজেকে পূজা করছে। সর্বনাশ! সেজবাবু দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এক ধমকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবেন। হৃদয়েরও অন্ন উঠবে সঙ্গে-সঙ্গে।

শুধু পাগল নয়, কাঁধে ভূত চেপেছে মামার। নইলে দেবতাকে নিয়ে এ কী শুরু করেছে ছেলে-খেলা! মা'র চিবুক ধরে আদর করছে, কথা কইছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে। মা যেন সসম্ভ্রম দূরত্বের জিনিস নয়, একেবারে কোলে চড়ে বসবার জিনিস। যেন অনম্য প্রণম্য নয়, আদর-ভালোবাসার কাঙাল। যেন বিধির বাঁধনে দরকার নেই, যেন গুটি-গুটি পায়ে আর এগুতে হবে না ভয়ে-ভয়ে, মাকে সিংহাসনে বসিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুটোতে হবে না আর চৌকাঠের বাইরে। সটান সিংহাসনে উঠে তার কোলে চড়ে বসতে হবে। সেই মা—যে ত্রিজগৎ-প্রসবিনী—সেই মা'র কোলে কোলের শিশু হয়ে চড়ে বসব। আমি উঠবন্দী রায়ত না হয়ে ক্ষেমংকরীর খাস তালুকের প্রজা হব। এই যে মা'র কোলে চেপে বসেছি—এ হচ্ছে 'ক্ষেমার খাসে আছি বসে, আমার মহালে নাই শুখা-হাজা।' যিনি জগৎরঙ্গিণী তাঁর সঙ্গে ঘরের ভাষায় রঙ্গ-রহস্য করব। মা যে আমার সহজ মানুষ। সহজ না হলে সহজ মানুষকে চিনব কি করে?

গদাধরের মুখ-চোখ লাল। যেন মদ খেয়েছে আকণ্ঠ। টলে-টলে নাচছে আর গান গাইছে : 'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে। আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥' সরাসরি গান শোনাচ্ছে মাকে। মা'র হাত ধরে নেচে বেড়াচ্ছে :

'আর ভুলালে ভুলব না গো,
ভয়ে হেলব না গো দুলব না গো—
প্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥'

রাত্রে ঘুম নেই। ভাবের ঘোরে কার সঙ্গে কথা কয়। কখনো বা গান শোনায়।

'ঘুমুবে না মামা?'

দুই চোখে ধারা, গান ধরে গদাধর :

'ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥'

কোনো দিন বা মন্দিরে মাকে শয়ন দিচ্ছে, হঠাৎ সেই শূন্যরূপাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল গদাধর : 'আমাকে তোর কাছে শুতে বলছিস? আচ্ছা, শুচ্ছি তোর বুকের কাছে।' মা'র সর্ব অঙ্গে বাৎসল্য, দুই চোখে স্নেহসিঞ্চিত লাবণী। হাত-পা

গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে মা'র রূপোর খাটে শুয়ে পড়ল গদাধর। নীল-নিবিড় মেঘ-মণ্ডলের কোলে ক্ষীণ শশিকলা।

ভোগ নিবেদন করছে, কালীঘরে এক বেড়াল এসে উপস্থিত। ঘুরছে আর মিউ-মিউ করছে। ওমা, মা এসেছিস? খাবি মা? খা। ভোগের অন্ন বেড়ালকে খাওয়াতে বসল গদাধর।

গণেশ একবার মেরেছিল একটা বেড়ালকে। ভগবতী বললেন, তুই আমাকে মেরেছিস। আমার সর্ব অঙ্গে যন্ত্রণা। সে কি কথা? গণেশ তো হতবুদ্ধি। মাকে সে মারবে? এই দ্যাখ, তোর মারের দাগ আমার গায়ে ফুটে রয়েছে। লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল গণেশ। যা মার্জারী তাই ভগবতী।

রাত্রিতে তো মন্দিরে আলো জ্বলে। মা যদি আসেন, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে দেয়ালে তাঁর ছায়া পড়ে না কেন? ভাবে হৃদয়। মাকে দেখার পুণ্য করিনি কিন্তু দেয়ালে তাঁর ছায়া দেখতে দোষ কি!

দিব্য অঙ্গের ছায়া থাকবে কি? সে অচক্ষু হয়েও দেখে, অকর্ণ হয়েও শোনে। অস্পর্শ হয়েও কোলে নেয়।

বিশুদ্ধ পাগলামো। তাই বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না এ কেলেঙ্কার। দেব-দেবী নিয়ে এই চপল ছেলেমানষি। আগে নিজের পায়ে ঠেকিয়ে পরে মায়ের পায়ে ফুল দেওয়া। আগে নিজে খেয়ে মাকে এঁটো খাওয়ানো। খাটের উপর মা'র পাশেই শুয়ে পড়া। মা'র চিবুক ধরে ফষ্টি-নষ্টি করা। অসম্ভব এই অনার্যতা। একটা বিহিত করতে হয়। জানাতে হয় সেজবাবুকে।

কালীঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ায় এসে সব মন্দিরের আমলারা। খাজাঞ্চি আর গোমস্তা, নায়েব আর আটপ্রহরী। কি-রকম যেন আবিষ্টের মতন চেয়ে থাকে। গদাধরের ধরন-ধারণ সব কিম্ভূত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। যা কিছু করছে যেন অকপটে করছে। বিশ্বাস বেশি বলেই যেন এত সাহস। আর ঐ যে উন্মনা ভাব ও যেন ঠিক উন্মাদের ভাব নয়।

সবাই শাসন-বারণ করতে এসেছিল। মুখস্ফুট করতে পেল না। দপ্তরে ফিরে পরামর্শে বসল—কি করা! আর কি করা! জানবাজারে খোদ মালিকের দরবারে দরখাস্ত দিতে হয়। যাই বলো, না হচ্ছে বিধিমত পূজা, না হচ্ছে ভোগরাগ। অশাস্ত্রীয় অকাণ্ডের জন্যে শেষকালে না কোনো অঘটন ঘটে!

মথুরবাবু লিখে পাঠালেন, দাঁড়াও, আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

এবার তল্পি বাঁধো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। অনাচারের দণ্ড নাও।

কাউকে কিছু না বলে পুজোর মধ্যে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন মথুরবাবু। সটান ঢুকে পড়লেন কালীঘরে। ঢুকে যা দেখলেন, তা নরদেহে দেখবেন বলে কল্পনা করেননি। গদাধর তন্মনোময় হয়ে পূজা করছে। কোনো দিকে লক্ষ্য নেই, লজ্জা নেই। যে মথুরবাবুর নিশ্বাসের আভাসে আর সবাই শশব্যস্ত, সে মন্দিরে এল বা চলে গেল, ভ্রূক্ষেপ করে না গদাধর। তার সমস্ত নিবেশ-নিক্ষেপ মা'র উপরে। কখনো কাঁদছে আকুল হয়ে, কখনো বা চেঁচিয়ে উঠছে আনন্দে। তন্ময় হয়ে গান

গাইছে কখনো, কখনো বা ধ্যানে নিঃসংজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। মা'র সঙ্গে কথা কইছে নির্ভয়ে। অভিমান করছে, আবদারে ছেলের মত আখখুটেপনা করছে।

এ কি দেখছেন মথুরবাবু!

তাঁর দুই হাতে কি কোনো শাসনের উদ্যতি ছিল? হঠাৎ সেই দুই হাত তাঁর অঞ্জলিবন্ধ হল কেন?

ঘুমঘোর ভাঙবে এবার মা'র। পাষাণী এবার প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। আর ভাবনা নেই। মিলেছে ওস্তাদ বাজীকর। ঘুম-ভাঙানে বাঁশিওয়ালা।

যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন চুপি-চুপি। জানবাজার থেকে ফরমান পাঠালেন, গদাধরকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। যেমন তার খুশি তেমনি ভাবেই পুজো করুক মাকে।

সীমা ছেড়ে চলে এসেছে সে অসীমায়। মাটির উপরকার বাঁধা-ধরা লাইন-ফেলা রাস্তা ছেড়ে সে চলে এসেছে আকাশের অনাবৃতিতে। ক্রিয়াকর্মের শাস্ত্র থেকে সর্বার্পণের অশাসনে। বৈধীভক্তি থেকে পরমপ্রেমরূপা ভক্তিতে। শুধু সন্তরণে নয়, নিমজ্জনে। ইন্দ্রিয়বিষয়ে অবিবেকীর যেমন আগ্রহ সেই 'পরানুরক্তিরীশ্বরে।' সর্ববন্ধনবিমোচনে।

'মা-মা যে করো, মাকে দেখতে পাও তুমি?' নরেন্দ্রনাথ জিগ্‌গেস করল ঠাকুরকে। জিজ্ঞাসার মধ্যে যেন বা একটু অবিশ্বাসের রহস্য।

'দেখতে পাই কি রে! মা'র সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মা'র পাশটিতে শুয়ে ঘুমুই—'

নরেন্দ্রের স্বরে তখনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ: 'ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনো? কোথায় সে?'

নিচে, উপরে, পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—স এবেদং সর্বমিতি। ভিতরে বাইরে—বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত তিনি। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং। দেখবি বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চক্ষু, তুই দেখবি নে?

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা গেড়েছে। সে হচ্ছে নগদ-বিদায়ের সাধু। তার মানে, ধর্ম-কর্ম করে কিন্তু সব সময়েই প্রত্যাশা করে কিছু চাল-কলা। যদি কিছু পার্থিব উপকার না হয় তবে কি হবে এ-সব জপতপে? সব খাটুনিরই মুনফা আছে আর এর বেলায়ই শুধু লবডঙ্কা! যদি জপতপ করে কিছু সিদ্ধাই হয় তবে হয়তো সংসারের অবস্থাটা ফেরানো চলে। মনে-মনে এই কামনা নিয়েই বসেছে পূজার্চনায়।

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দিতেন ভক্তদের, 'ওর কথা শুনিস নে তোরা কেউ।'

কিন্তু হাজরার কথা নরেনের মন্দ লাগে না। এই লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার কথা। যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে স্পর্শসহ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুনো। স্তবের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবেরও হিসেব নেওয়া। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্দেহ তো থাকবেই। হাজরার কথা তাই একেবারে ফেলনা নয়।

'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়—এ গানটা গা তো রে, নরেন।' ঠাকুর ফরমাশ করলেন। নরেন গান ধরল। তাকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যা কিছু তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে, সব তিনি। গাছ পাখি মানুষ পশু, সব। আকাশ মাটি বাতাস আগুন জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাতীত। স্বয়ংপ্রকাশ। কে ঈশ্বর?

কে ঈশ্বর! অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু আর বৃহতের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব আর তার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা—ঈশ্বর।

সহজ করে বলুন।

সহজ করে বলব! ঈশ্বর কে তাই জানতে চেয়েছিস? সহজ করেই বলি। 'তত্ত্বমসি'। অর্থাৎ তুই-ই সেই। হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

তবু সংশয় যায় না নরেনের।

সংশয় থাকলেই মীমাংসা। নির্ণয় তো সংশয়সাপেক্ষ। সংশয় আছে বলেই সংসার-বিচার। আত্মবিচার। থাক, থাক তুই সংশয়ে।

নরেন বারান্দায় এসে বসল হাজরার কাছে। তামাক সাজছে হাজরা। হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল নরেনের হাতে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নরেন বললে, 'বলে কি অসম্ভব কথা! এ কখনো হতে পারে?'

'কি বলে?' হাজরা কটাক্ষ করল।

'বলে কি না, ঘটি বাটি থালা গ্লাস সব কিছু ঈশ্বর। যা কিছু দেখছি চোখ মেলে তাই না কি তাই। এমন কি আপনি আমি—আমরাও না কি—'

হাসির রোল তুলল হাজরা। পাগল আর কাকে বলে! সে ব্যঙ্গের হাসিতে নরেনও যোগ দিলে।

ঘরের মধ্যে ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্যদশা। সে সব্যঙ্গ হাসির শব্দ তাঁর কানে এল। তিনি নিমেষে বালকের মতন হয়ে গেলেন। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

'কি বলছিস রে, নরেন?' হাসতে-হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন ঠাকুর। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর নরেন? নরেনের কি হল?

কি যে হল কে বলবে। চোখের সমুখ থেকে একটা পর্দা উঠে গেল। যেন চেতনান্তর হল। নিম্নস্থ দুই চোখ বুজে গিয়ে জেগে উঠল ললাটোর্ধ্ব তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ধূলিকণা থেকে আকাশ-বিকাশ সূর্য পর্যন্ত সব কিছু ঈশ্বর।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল না কি? চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ দরজা চৌকাঠ সব প্রাণময়। খেতে বসল, মনে হল, থালা-বাটি, ভাত-ডাল সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন। যিনি পরিবেশন করছেন আর যে খাচ্ছে দুই-ই তিনি। ভাতের থালার সামনে নিস্পন্দের মত বসে

রইল নরেন। 'কি রে, বসে আছিস কেন? খা।' মা মনে করিয়ে দিলেন। খেতে শুরু করল নরেন। কিন্তু যে খাচ্ছে সে কে! যাকে খাচ্ছে তাই বা কি!

ভোর হল তবুও ঘোর গেল না। কলেজে চলেছে, রাস্তায় বেরিয়েও সেই বিচিত্র অনুভূতি। সর্বানন্দপ্রদাতা ঈশ্বর সমস্ত কিছুর মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছেন। প্রায় গায়ের উপর গাড়ি এসে পড়ছে, তবু সরবার প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় গাড়িও যা সেও তাই, দুই-ই ঈশ্বরপূর্ণ। বিকেলে হেদোর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন : বল্, তুই কে? তুই কি ঈশ্বর?

কোথাও কি রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই? জাগরণে যে আছে সে কি স্বপ্নেও আছে? সুষুপ্তিতেও কি সেই? আর সব কিছুর অন্তরালেও কি সেই এক অখণ্ডস্বরূপ? সব সেই এক। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যক্‌গতি হয়ে এঁকে-বেঁকে চললেও সাপ। নিত্যেও যিনি লীলায়ও তিনি। সব একাকার। শুধু ঈশ্বর দেখছি এ হলেই চলবে না। তাঁকে ঘরে আনতে হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রাজাকে তো অনেকেই দেখে পথে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বাড়িতে এনে খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে দু-এক জন।

নরেন আকুল হয়ে উঠল। আমি কি পথে দাঁড়িয়ে রাজা দেখব? আমি কি তাকে টেনে আনতে পারব না ঘরের মধ্যে?

১৩

গদাধরের সমস্ত শরীরে ভীষণ জ্বালা। প্রায় ছ'মাস ধরে ভুগছে।

নানান ধরনের কবরেজি তেল এনে দিলে হৃদয়। গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিলে। কিছুতেই কিছু হল না।

পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছে গদাধর, হঠাৎ তার শরীর থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। ঘুটঘুটে কালো, চোখ দুটো লাল, ভয় পাওয়াবার মতন চেহারা। নেশাখোরের মত টলে-টলে পড়ছে। আরো একজন বেরিয়ে এল পিছু-পিছু। পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, প্রশান্ত মূর্তি। সেই ঘোরদর্শন কদাকারকে সে আক্রমণ করলে, নিপাত করলে। পাপ-পুরুষ ভস্ম হয়ে গেল।

মথুরের কাছে রানি শুনলেন সব কাণ্ড-কারখানা। ঠিক করলেন একদিন গদাধরকে দেখে আসবেন নিজের চোখে। তাই এসেছেন।

গঙ্গায় স্নান করে ঢুকেছেন মন্দিরে। মা'র মূর্তির কাছে বসেছেন শান্ত হয়ে। গদাধরের গান বড় ভালো লাগে। তাই বললেন, একটা গান ধরো।

গান ধরল গদাধর। রানি ধ্যানে চোখ বুজলেন।

হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, গদাধর রানির গায়ে এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠল, 'এখানেও ঐ চিন্তা?'

রানি হক্‌চকিয়ে উঠলেন। এস্টেট নিয়ে একটা কঠিন মামলা চলছে, তারই কথা ভাবছিলেন ধ্যানে বসে। কিন্তু, তাই বলে সামান্য একজন মন্দিরের পুরোত তাঁর গায়ে হাত তুলবে না কি?

মন্দিরের খাজাঞ্চি-গোমস্তারা উৎসুক হয়ে উঠল। এবার নির্ঘাত বরখাস্ত হবেন বাছাধন।

কথাটা মথুববাবুর কানে তুললে। বিরক্ত হলেন অত্যন্ত। এ কি অশোভন ব্যবহার! হৃদয় ছুটে এল মামার কাছে। ভীতকণ্ঠে বললে, 'এ তুমি কি করেছ!'

গদাধরের মুখে নির্মল প্রশান্তি। 'আমি তার কি জানি! মা বললেন, এখানে এসেও ও বিষয়সম্পত্তি ভাবছে, এক ঘা বসিয়ে দে পিঠের উপর। তাই বসিয়ে দিলাম। মা'র কথা অমান্য করি কি করে?'

মথুরবাবুকে ডেকে পাঠালেন রাসমণি। বললেন, 'ঠিকই করেছে গদাধর। ওর হাত দিয়ে মা আমাকে শাসন করেছেন।'

সত্যি?

'হ্যাঁ, আর সেই আঘাতে হৃদয় আলো করে দিয়েছেন।'

ভক্তি-ভাবের পাঁচটি প্রদীপ। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। পঞ্চভাবেই সাধনা করছে গদাধর।

শান্ত হচ্ছে ঐকাত্মজ্ঞান। নির্গুণ সাধন। স্বস্থ, নির্লিপ্ত, ব্রহ্মনিষ্পন্ন হয়ে বসে থাকো। আরগুলো গুণাত্মক, রাগরঞ্জিত। দাস্য হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব। সখ্য হচ্ছে বাসুদেবের প্রতি অর্জুনের। বাৎসল্য হচ্ছে গোপালের প্রতি যশোদার। আর মধুর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীর।

যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত নিজে মাংস খায়, তাই ভাবে মা-ও পাঁঠা খাবে—তাই বলিদান দেয়। রজোগুণীর বিস্তারে-বিলাসে বিশ্বাস, তাই সে নানান ব্যঞ্জনে ভোগ সাজায়। সত্ত্বগুণীর জাঁক নেই জৌলুস নেই। তার পুজো লোকে জানতেও পারে না। ফুল নেই তো বেলপাতায় আর গঙ্গাজলে পুজো করে। শীতল দেয় দু'টি মুড়কি কি বাতাসা দিয়ে।

আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। যে শুধু নাম করে। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁকে পুজো করা।

শান্ত হচ্ছে ঋষিদের ভাব। স্বানন্দভাবে পরিতুষ্ট। ভিক্ষান্নমাত্রে খুশি, ছেঁড়া কাঁথাই যেন লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য। শুধু মূল তরুতে আশ্রয়। শুধু আদি নিয়ে আছে, অন্ত-মধ্যের ধার ধারে না। 'অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ'—সেই যোগীর ভাব।

আর দাস্য হচ্ছে বলবানের ভাব। রামের কাজ করছে হনুমান, শত সিংহের শক্তি তার

শরীরে। কে অত বাছ-বিচার করে, গোটা গন্ধমাদনই নিয়ে এল। দ্বারকায় এসে হনুমান বললে, আমি সীতারাম দেখব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখানে সীতা পাবে কোথায়? তা জানি না। তুমি যখন আছ তখন সীতাকেও চাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বোস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষে নেই।' সীতার পাতালপ্রবেশের সময় এমন অবস্থা, রামকেই প্রায় মারতে যায়।

ধনমান দেহসুখ কিছুই চায় না, শুধু ঈশ্বরকে চায়। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, মন্দোদরী অনেক রকম ফল দেখিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে যদি অস্ত্রটা ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান কি ভোলবার ছেলে? বললে, আমার শ্রীরামই কল্পতরু, আমার কি ফলের অভাব?

লঙ্কাজয়ের পরে অযোধ্যায় ফিরেছেন রাম-সীতা। কত মিলন-উৎসব, কত আনন্দ-কোলাহল, পরিত্যক্তের মত এক কোণে পড়ে আছেন কৈকেয়ী। কই কই, আমার কৈকেয়ী-মা কই? হনুমান এসে তাঁকে সংবর্ধনা করলে। ভাগ্যিস তুমি রামকে পাঠিয়েছিলে! বনের মানুষ হয়ে তাই মনের মানুষকে পেলাম।

ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসেব থাকে না। একজন এসে হনুমানকে জিগ্‌গেস করলে, 'আজ কোন্ তিথি?' হনুমান বললে, 'কে তোমার বার-তিথির খোঁজ রাখে। রাম ছাড়া আর কিছু জানি না।'

আর সখ্যভাব কেমন জানো? এই—এসো ভাই এসো, কাছে এসে বোসো। অনেক দূর থেকে এলে বুঝি, বোসো, পাখার হাওয়া করি। হাত-মুখ ধোও, খাও পেট ভরে। গল্প করো।

বাৎসল্য ভাবে যশোদা ননী হাতে করে বেড়াতেন কখন গোপাল খেতে চাইবে। বলতেন, আমি না দেখলে গোপালকে দেখবে কে? তার অসুখ করবে। উদ্ধব বললে, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎচিন্তামণি।' যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণিকে চিনি না, আমার গোপাল কেমন আছে তাই বল।' কার কি জানি না, আমার গোপাল!

আর মধুর ভাব শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। মেঘ কি ময়ূরকণ্ঠ দেখছেন আর কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছেন। চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে চলেছেন, শুনলেন এ গাঁয়ের মাটিতে খোল হয়। যেমনি শোনা অমনি ভাবাবেশ। এ ভাব মহাভাব।

কি নিষ্ঠা গোপিনীদের! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তো সভায় ঢুকল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? দ্বারী নিয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বসে আছে। গোপিনীরা মুখ নামিয়ে রইল—এ আবার কে! এর সঙ্গে কথা কয়ে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব? চল ফিরে যাই। আমাদের সেই পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায়? আমরা তাকে চাই।

দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসত এক পাগলি। কি নাম কোথায় থাকে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরকে শুধু গান শোনাবে। বাধা দিলে বড় জ্বালাতন করে। ভক্তরা তাই ত্রস্ত থাকে সব সময়। একদিন কাছে এসে কান্না শুরু করল। সে কি কান্না! ঠাকুর জিগ্‌গেস করলেন, 'কাঁদছিস কেন?'

পাগলি বললে, 'মাথা ধরেছে।' এই ওজ্নহাতে কাছটিতে বসে রইল।

আরেক দিন, ঠাকুর খেতে বসেছেন, কোত্থেকে হঠাৎ পাগলি এসে হাজির। বললে, 'দয়া করলেন না? মনে ঠেললেন কেন?'

ঠাকুর জিগ্‌গেস করলেন, 'তোর কি ভাব?'

পাগলি বললে, 'মধুর ভাব।'

'ওরে, আমার যে সন্তান ভাব। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।'

'তা আমি জানি না। সে খবরে আমার কাজ নেই।'

গিরিশ ঘোষ শুনছিলেন ঠাকুরের মুখে। বললেন, 'পাগলি ধন্য, কৃতার্থজন্ম! পাগলই হোক আর মারই খাক ভক্তদের হাতে, সর্বক্ষণ তো আপনাকেই চিন্তা করছে। আপনাকে চিন্তা করে—আমিই বা কি ছিলাম আর কি হলাম!'

গদাধরের এখন দাস্য ভাব। হনুমানের ভাব। রঘুবীরের সেবক মহাবীর। অহং তো যাবে না সহজে। তাই বলি, থাক, দাস-আমি হয়ে থাক। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি সেব্য আমি সেবক। তুমি রাজাধিরাজ আমি অকিঞ্চন।

হনুমানের ধ্যানে ডুবে গিয়ে হনুমানের মতই হয়ে গেল গদাধর। পরনের কাপড়টা কোমরে বেঁধেছে আর পিছনের দিকে লেজ দিয়ছে ঝুলিয়ে। হাঁটে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে। বেশির ভাগ সময়ই গাছে উঠে বসে থাকে। খোসা না ছাড়িয়ে না কেটে আস্ত-আস্ত ফল খায়। আর আওয়াজ করে, রঘুবীর, রঘুবীর।

হনুমানের সাধনায় মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগটা এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল গদাধরের। সে ভাব চলে যাবার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

পঞ্চবটীতে শূন্যমনে চুপচাপ বসে আছে গদাধর, হঠাৎ জায়গাটা আলো হয়ে গেল। চেয়ে দেখল এক অপূর্বসুন্দরী নারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরূপ লাবণ্য, বেদনা করুণা ক্ষমা ও ধৃতির স্নিগ্ধতা। কে তুমি? উত্তরদিক হতে গদাধরের দিকে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে। চোখে সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্য। কে তুমি?

সহসা কোত্থেকে এক হনুমান উপ করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে।

চিনতে আর দেরি হল না। রামময়জীবিতা সীতা-দেবী এসেছেন।

'মা' 'মা' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে গদাধর, অমনি সেই মূর্তি তার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গদাধর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পঞ্চবটীর কাছেই হাঁসপুকুর। সে পুকুর ঝালাতে গিয়ে বাড়তি মাটি ফেলা হয়েছে এই পঞ্চবটীর গর্ভে। ফলে আমলকী গাছটা আর রইল না। মারা পড়ল।

ওরে হৃদে, আমার বসবার জায়গার একটা বন্দোবস্ত কর।

গদাধর নিজেই অশ্বত্থের চারা লাগাল। হৃদয় নিয়ে এল বট অশোক বেল আর আমলকী। তুলসী আর অপরাজিতার চারা পুঁতে জায়গাটা ঘিরে দিলে। ক'দিনেই ঘন ঝোপ হয়ে উঠল। ভিতরে ধ্যানে বসলে কেউ দেখতে পায় না বাইরে থেকে।

ওরে হৃদে, ছাগলে-গরুতে ঝোপঝাড় সব খেয়ে ফেললে যে। নতুন লাগানো গাছের চারাতেও দাঁত বসিয়েছে। ওরে, কাঠ-বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া লাগা—

কাঠ-বাঁশ কই? হৃদয় ফাঁপরে পড়ল। দড়ি-পেরেক কই?

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না।
প্রবল জোয়ারের জলে গঙ্গার এ-পারে ঠিক মন্দিরের ঘাটের সামনে এক বোঝা কাঠ-বাঁশ আর দড়ি-পেরেক ভেসে এসেছে।
যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।
তবে, যদি মুখে রাম নাম বলতে-বলতে হাত দিয়ে ফের কাপড় সামলাস, তাহলে হবে না। জানিস নে গল্পটা?
চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বুড়ি গয়লানীর নদী পার হয়ে দুধ যোগাতে যেতে হয়। সেদিন দুর্যোগে পারাপারের নৌকো পেল না। রাম-নামের কথা মনে পড়ল। ভাবলে, রাম-নামে ভবসমুদ্র পার হয়, আর আমি এই ছোট্ট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। রাম-নাম করতে-করতে নদী পার হয়ে গেল বুড়ি। যে বাড়িতে দুধ দেয় সে এক পণ্ডিত। সে তো অবাক, এ দুর্যোগে বুড়ি নদী পার হল কি করে? কেন বাবা ঠাকুর, রাম-রাম করে পার হয়ে এলুম। ওপারে কি কাজ ছিল পণ্ডিতের। বললে, বলিস কি রে? আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। দু'জন এল নদীর ধারে। বুড়ি রাম-রাম করে পার হতে লাগল। পণ্ডিতও রাম-রাম করে এগুতে লাগল, কিন্তু জলে নেমেই কাপড় গুটিয়ে নিলে। বুড়ি বললে, ঠাকুর, রাম-রামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে—তা হবে না। পণ্ডিত পড়ে রইল পিছনে। দিব্যি পার হয়ে গেল বুড়ি।
যদি ধরবি তো এমনি আঁকড়ে ধরবি। বিশ্বাস চাই। সরল বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস।
হাজরা টিপ্পনি কাটল: অন্ধ বিশ্বাস?
নিশ্চয়ই। বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কি! ছিদ্র কি! হয় বল, বিশ্বাস; নয় বল, জ্ঞান। জ্ঞান দুরূহ, বিশ্বাস সোজা। মা'র কাছে কেঁদে-কেঁদে বল, মা, আমাকে ভক্তি দে, বিশ্বাস দে।

১৪

দিনে-দিনে পাগলামি বেড়েই চলেছে গদাধরের।
মথুরবাবু পর্যন্ত বিচলিত হলেন। নিশ্চয়ই কিছু স্নায়ুবিকার ঘটেছে। কলকাতার সেরা-কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে ডেকে আনালেন।
কা কস্য পরিবেদনা। গঙ্গাপ্রসাদ বিফল হল। তবু গঙ্গাপ্রসাদকে ধন্বন্তরি বলেই

মানতেন ঠাকুর। ঈশ্বরের বিভূতি না থাকলে কি এত বড় চিকিৎসক হয়? যেখানেই গুণের বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। সেখানেই নত হবি।

'গঙ্গাপ্রসাদ বললে, আপনি রাতে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি ও সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

ধন্বন্তরিতে যখন কিছু হল না তখন নিজেই নিজেকে সামলে চলুন। আইনকানুনের মধ্যে নিয়ে আসুন নিজেকে। ছাড়ুন এ সব খেয়ালিপনা।

'ঈশ্বর যে ঈশ্বর—সে পর্যন্ত তার নিজের আইন মেনে চলে।' বললেন মথুরবাবু। 'নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার তাঁর ক্ষমতা নেই।'

গদাধর থমকে গেল। সে কি কথা? যে আইন তৈরি করেছে সে ইচ্ছে করলে তা রদ-বদল করতে পারে না? সে কি স্বাধীন নয়?

কি করে হবে? নিজে নিয়ম করে নিজেই আবার তা ভাঙলে নিজের কাছে কি জবাবদিহি দেবেন?

বা, সব তাঁর খেলা যে। ভাঙা-গড়ার খেলা। তাঁর কাছে আবার নিয়ম কি! তিনি সমস্ত নিয়মের বাইরে।

কিছুতেই মানলেন না মথুরবাবু। বললেন, 'লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, শাদা ফুল হয় না। কই ফুটুক দেখি তো শাদা ফুল।'

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে হতে পারে না এটুকু? অখিললোকনাথের হাত-পা কি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা? তিনি কি খর্ব না পঙ্গু?

পরদিন সকালে মন্দিরের বাগানে লাল জবাফুলের গাছে এ কী দেখ্ছে গদাধর! একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দু'টি ফুল রয়েছে ফুটে—একটি টুকটুকে লাল, আরেকটি ধবধবে শাদা।

উল্লাসে অধীর হয়ে গদাধর ডালটা ভেঙে ফেলল হাত বাড়িয়ে। চলল মথুরের কাছে। এই দেখ। ঈশ্বর কি অল্প না অক্ষম না আবদ্ধ? কৃপানিধি কি কখনো কৃপণ হতে পারেন?

মথুরবাবু হার স্বীকার করলেন। চেয়ে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে তাঁর গুরু দাঁড়িয়ে। যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান তিনিও গুরু। যিনি অন্ধকার দেশে আলোর সংবাদ নিয়ে আসেন তিনিও।

যদি তাপ বা আলো চাও, উদ্দীপিত আলোর আশ্রয় নিতেই হবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে সেই গুরু। গদাধর প্রজ্বলিত অগ্নি।

কিন্তু, যাই বলো, একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

শরীর ভেঙে পড়ছে গদাধরের, এর কারণ হয়তো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। নিবৃত্তির কাঠিন্য থেকে যদি ক্ষণিক মুক্তি পায় তাহলে হয়তো সে একটু স্বস্থ-সুস্থ হতে পারে। কিন্তু সরাসরি প্রস্তাব করতে গেলে মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে দেবে গদাধর। এ একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই গোপনে ফাঁদ পেতে তাকে বাঁধতে চাইলেন মথুরবাবু। শহর থেকে দু'টি পতিতা মেয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন চুপি-চুপি।

গদাধর মুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল : 'মা, মা এসেছিস?' বলেই তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

আরো একদিন চেষ্টা করলেন মথুরবাবু। গদাধরকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেলেন। মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে থামলেন এক বাড়ির কাছে। দোরগোড়ায় অনেকগুলি সাজগোজ-করা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘরে তাদের মাঝখানে গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন মথুরবাবু। পালিয়ে গেলেন মানে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর গদাধর?

'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—' সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই তিনি, জগজ্জননী। গদাধর মাতৃস্তব শুরু করল। শিশুর মত হয়ে গেল। লোপ পেল বাহ্যসংজ্ঞা। কোলাহল শুরু করল মেয়েগুলো। কান্নার কোলাহল। আত্ম-তিরস্কার। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল : আমাদের ক্ষমা করো। আমরা অভাজন, অকিঞ্চন—

গদাধরের মুখে শুধু মাতৃনাম। মা-ই সব হয়েছেন। রাজেশ্বরী হয়েছেন আবার পণ্যাঙ্গনাও হয়েছেন।

গোলমাল শুনে উঁকি মারলেন মথুরবাবু। দেখলেন, শম-দম শৌচ-মৌনের সৌম্য প্রতিমূর্তি গদাধর। সেদিন তিনি যা একবার দেখেছিলেন, তাই। ধূমস্পর্শহীন প্রজ্বলিত বহ্নি।

মেয়ের দল মথুরবাবুর উপর ঝাঁজিয়ে উঠল : 'আপনি বাবাকে এইখানে নিয়ে এসেছেন, এই আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে? আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলেন মথুরবাবু। গুরুপ্রাপ্তির গরিমায় অন্তরে লাল হয়ে উঠলেন।

পানিহাটিতে ফি-বছর মহোৎসব হয়। বাইশ বছর বয়েস, সেখানে গিয়েছে গদাধর। সেবার সেখানে বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা। বৈষ্ণবচরণ যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। ঠাকুরবাটিতে বসে আছে গদাধর, বৈষ্ণবচরণ তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। চিনে নিলেন এক নিমেষে। অলোকসুন্দর দিব্যপুরুষ।

পাঁচটা টাকা হঠাৎ দিতে চাইলেন গদাধরকে। কি করে আনন্দ জানাবেন যেন বুঝতে পারছেন না। বললেন, 'আম কিনে খাও।'

না, না, টাকা দিয়ে কি হবে? আম না খেলে কি হয়!

বৈষ্ণবচরণ ছাড়বার পাত্র নন। হৃদয়কে গছালেন। আম কেনালেন। বললেন, ভোগ হবে।

তারপর গদাধরকে মাঝখানে বসিয়ে কীর্তন শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সমাধি হয়ে গেল গদাধরের।

সমাধিভঙ্গের পর ভোগের দ্রব্য খেতে দেওয়া হল তাকে। আশ্চর্য, গলা দিয়ে কিছুই গলে না।

এক হাতে মাটি আরেক হাতে কটা টাকা নিয়ে গঙ্গাতীরে বসেছে গদাধর। মনে-মনে

ওজন নেবার চেষ্টা করছে, কোনটা ভারি! কোনটার বেশি দাম! টাকা না মাটি, মাটি না টাকা! বিচার করতে-করতে উন্মেষ হল মনের মধ্যে, দুই-ই তুল্যমূল্য, দুই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দুই-ই একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলল গঙ্গায়। নিঃশেষে নির্মুক্ত হয়ে গেল।

তাঁকে যদি একবার পাই তবে সব কিছুই পেয়ে যাব।

'সব কিছুই পেয়ে যাব।' বললেন ঠাকুর : 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন! লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! অমনি বললুম, মা, খোদ তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না। তোমাকে পেলেই সব কিছু পেয়ে যাব।'

ভবনাথ চাটুজ্জে কাছেই বসে ছিল। হাসতে-হাসতে বললে, 'এ পাটোয়ারি।'

'হ্যাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি।' ঠাকুরও হাসলেন। 'ঈশ্বরানন্দ পেলে কোথায় বা বিষয়ানন্দ, কোথায় বা রমণানন্দ!' বললেন, 'ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেখা দিলেন। বললেন, বর নাও। ভক্ত বললে, বর দিন যেন সোনার থালায় বসে নাতির সঙ্গে ভাত খাই। পাটোয়ার ভক্ত—এক বরে অনেকগুলি মেরে দিলে। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল—আয়ুও পেল মন্দ নয়।'

তাই তেমন জিনিস সন্ধান করো যা চরম যা চূড়ান্ত, যার আর পরতর নেই।

নারাণ বড়-ঘরের ছেলে। অল্প বয়স, ছাত্র, কিন্তু ভগবানে অর্পিতচিত্ত, দক্ষিণেশ্বরে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে। দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে অভিভাবকেরা মারে। তবু না এসে পারে না। ঠাকুরের কোলের কাছটিতে তার স্থান।

'মাস্টার,' মহেন্দ্র গুপ্তকে জিগ্গেস করলেন ঠাকুর : 'একটি টাকা দেবে?'

'কাকে?'

'নারাণকে। দেবে? না কালীকে বলব?'

'আজ্ঞে বেশ তো, দেব।'

'ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে তাদের দেওয়া ভালো। তাহলে টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?'

অধরচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—মাইনে তিনশো টাকা। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে—মাইনে হাজার টাকা! অনেক চেষ্টা-চরিত্র করছে যাতে চাকরিটি হয়। সই-সুপারিশ যোগাড় করেছে অনেক। তবু যেন এগোয় না। প্রতাপ হাজরা এসে বললে ঠাকুরকে, 'অধরের কাজটি হবে, তুমি মাকে একটু বলো।'

অধরও বললে, 'একবারটি বলুন।'

ঠাকুর রাখলেন ওদের অনুরোধ। মাকে একটি বার, একটুখানি বললেন। বললেন, 'মা, অধর তোমার কাছে আনাগোনা করছে, যদি হয় তো হোক না।' বলেই সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বললেন, 'কী হীনবুদ্ধি মা! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

টাকা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল গদাধর। 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হয়ে গেল। আরো কত অভিমান না জানি আছে! কাঙালীরা খেয়ে গেছে, মাথায় করে তাদের পাত ফেলে নিজে ঝাঁটা ধরে জায়গা পরিষ্কার করে দিলে। মেথরের কাজ করতে লাগল স্বচ্ছন্দে। শুধু তাই? কাঙালীদের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করলে প্রসাদ-জ্ঞানে। শুধু তাই! জিভ দিয়ে চন্দন আর বিষ্ঠা স্পর্শ করলে! সর্বত্র ব্রহ্মস্বাদ।

ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর গদাধর। পূজা-সেবার রীতিনীতি দূরস্থান, কালাকালই ঠিক থাকছে না। পূজা না করেই ভোগ দিয়ে দিলে। পূজার ফুলচন্দন দিয়ে নিজেকেই সাজিয়ে রাখলে! বেলা বয়ে যাচ্ছে, হয়তো ধ্যানই ভাঙল না!

ক্রমে-ক্রমে কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের। আসন্নপ্রসবা গর্ভিনীর মত।

একদিন ভাবাবেশে গদাধর বলে উঠল মথুরবাবুকে : 'আজ থেকে হৃদে পুজো করবে।'

মথুরবাবুর কাছে দৈবাদেশের মত শোনাল। হৃদয় বসল পূজার আসনে।

গদাধরের ছুটি। ছুটি মানে মা'র জন্যে ছুটোছুটি। মা'র জন্যে কান্না।

মাকে দেখতে যদি কখনো একটু দেরি হয় আথাল-পাথাল করে গদাধর। আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। কোথায় পড়ল, আগুনে না জলে, তার জ্ঞান নেই। দম আটকে-আটকে আসে, কাটা ছাগলের মত ছটফট করে। সমস্ত গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, ভ্রূক্ষেপ করে না। মাটিতে মুখ ঘষতে-ঘষতে কাঁদে আর চেঁচায় : মা, মা গো—

পথ-চলতি লোক বলে, 'আহা শূলব্যথা উঠেছে বুঝি—'

১৫

এ আবার কে এল দক্ষিণেশ্বরে?

গদাধরের খুড়তুতো দাদা, রামতারক চাটুজ্জে। গদাধর নাম রেখেছিল হলধারী। হৃদয়ের মত চাকরির খোঁজে এসেছে। তবে হৃদয়ের মত সে মাঠো নয়। পণ্ডিত-প্রধান। ভাগবত আর গীতা, বেদান্ত আর অধ্যাত্ম রামায়ণ তার নখমুকুরে। মস্ত বড় বৈষ্ণব।

'একটা কাজকর্ম যদি কিছু দেন—' হলধারীর মধ্যে লুকোছাপা কিছু নেই, সরাসরি দাঁড়াল গিয়ে মথুরবাবুর দরবারে।

পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়ে গেলেন মথুরবাবু। এ তো চাওয়ার মতই পাওয়া হয়ে

গেল দেখছি। ঈশ্বরের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে গদাধর। পুজো-আচ্চার আর ধার ধারে না আজকাল। কি যে করে আর কি যে করে না সে জানে আর তার মা-ই জানে। 'ভালোই হল।' মথুরবাবু সহজ মনুষের মত নিশ্বাস ফেললেন : 'তুমি কালীঘরের পুজোর ভার নাও।'
প্রথম পংক্তির বৈষ্ণব, শক্তিপূজার ভার নেবে! এক মুহূর্ত দ্বিধা করল হলধারী। আপত্তি কি? শক্তিও যা মধুরতাও তাই। 'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।' আবার শোনো : 'শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে, প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥' 'না' বলবার কিছু নেই।
কিন্তু আর যাই বলুন, গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাব।
'কেন, গদাধর তো মা'র প্রসাদ খাচ্ছে আজকাল। তোমার আবার খুঁতখুঁতুনি কেন?' টিপ্পনি কাটলেন মথুরবাবু।
হলধারী হাসল। কার সঙ্গে কার তুলনা! মনে করুন, গোড়ায় গদাধরও গঙ্গাতীরেই রান্না করে খেয়েছে। এখন সে উঠে এসেছে সাধনার উচ্চস্তরে। এখন সে ইচ্ছে করলে ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ কেন, ছোটজাত কাঙালীরও উচ্ছিষ্ট খেতে পারে। তার সইবে, সে এখন সহিষ্ণুতার সমুদ্র। কিন্তু আমার সইবে না। যেটুকু বা নিষ্ঠা আছে তাও যাবে নষ্ট হয়ে।
তার স্পষ্টতার সারল্যে খুশি হলেন মথুরবাবু।
কিন্তু, এ তো এক রকম হল—এদিকে আবার বলি বন্ধ করবার বায়না ধরলে হলধারী। বহু কালের প্রথা, বললেই কি আর বন্ধ করা যায়? ক্ষুণ্ণ হল হলধারী, পূজায় সেই প্রাণঢালা আনন্দ যেন খুঁজে পেল না। খোলা হাওয়ায় না থাকলে মন খোলসা হয় কি করে?
একদিন, সন্ধ্যা করছে হলধারী, দেবী ভবতারিণী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধ হয়েছেন মা, মা'র এখন উল্লাসিনী মূর্তি নয়, প্রচণ্ডিকা মূর্তি। বললেন, 'তোকে আর আমার পুজো করতে হবে না। এমনি আধাখেঁচড়া পুজো যদি করিস তো ছেলের মরা-মুখ দেখবি।'
হলধারী গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে, চোখে বুঝি ঘোর দেখেছে। হয়তো বা মাথার খেয়াল!
কিন্তু, আশ্চর্য, ক'দিন পরেই খবর এল, মারা গেছে হলধারীর ছেলে।
হলধারী গদাধরের শরণাপন্ন হল। গদাধর বললে, দেবীপূজা ছাড়ান দিন। যেমন করছিল হৃদয়, হৃদয়ই করুক, আপনি যান রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে।
রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে এসে হলধারী মধুর ভাবের পরিচর্যায় পরকীয়া নিয়ে মেতে উঠল। বৈষ্ণব মতে এও এক রকম সাধনা বটে, কিন্তু অপকৃষ্ট, অধোগত সাধনা। ক'দিনেই নানান কথা রটতে লাগল হলধারীর নামে—শুরু হল নানা কানাকানি। কিন্তু কারুর সাধ্য নেই, মুখের উপর বলে কিছু পষ্টাপষ্টি। বিরুদ্ধতা করে। হলধারীকে সক্কলকার ভয়। তার মুখ বড় খারাপ। কথায় কথায় শাপ দেয়। আর সে-শাপ ভীষণ ফলে। বাক্‌সিদ্ধ হলধারী।

কিন্তু গদাধরের কানে এলে গদাধর বরদাস্ত করতে পারল না। দাদাই হোক আর যাই হোক, চলবে না এমন কদাচার। হলধারীকে কড়কে দিল গদাধর।

'কি? তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!' হলধারী হুমকে উঠল: 'আমার ভাই হয়ে, আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে তুই আমাকে শাসন করতে এসেছিস? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

আপনি চটছেন মিছিমিছি। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম। পাঁচ জনের কান-কথা থেকে রেহাই পান তারি জন্যে।

হলধারী গুম হয়ে রইল। কথা ফিরিয়ে নিলে না কিছুতেই। যা বলেছি তো বলেছি। ক'দিন পরে, একদিন সন্ধ্যের পরে গদাধরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল সত্যিসত্যি। কালো, ঘন রক্ত। কতক বেরিয়ে আসছে, কতক জমে থাকছে মুখের মধ্যে। কতক বা দাঁতের গোড়া থেকে ঝুলছে সুতোর মত।

এ কি হল? রক্ত থামছে না যে! ঝলকে-ঝলকে বেরুচ্ছে।

মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল গদাধর। তবু রক্তের নিবৃত্তি নেই। এ কি হল? মা, তুই এ কি করলি?

সবাই ছুটে এল আশ-পাশ থেকে। দ্রুতপায়ে হলধারীও।

'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি করেছ দেখ।' ডুকরে উঠল গদাধর।

চোখে দেখে সহ্য করতে পারল না হলধারী। কাঁদতে লাগল। কথা ফিরিয়ে নেবার কথা ওঠে না আর। হাতের তীর আর হাতে নেই। কান্নার মধ্যেও একটু গর্ব মিশে আছে হলধারীর। অব্যর্থবাক সে।

চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সমস্ত বলিদানের রক্ত বুঝি গদাধর দিলে!

'তুমি কি হঠযোগ করো?'

গদাধর চোখ তুলে তাকাল। দক্ষিণেশ্বরে ক'দিন থেকে আছে যে প্রাচীন সাধু, সে। 'দেখি রক্তের রঙ। দেখি মুখের কোনখানটা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই,' সাধু জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই তুমি হঠযোগ করো। তাই না?'

'করি।'

তবে আর ভয় নেই। সাধনায় সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়েছে। দেহের রক্ত সব মাথায় গিয়ে উঠেছিল। আপনা থেকে যে মুখের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পেরেছে সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। জানো তো, হঠযোগে জড়সমাধি হয়ে যায়। রক্ত যদি সব মাথায় গিয়ে একবার জমতে পারত তাহলে তোমার সমাধি আর ভাঙত না।

সবই মা'র ইচ্ছা।

'একশো বার। মা'র ইচ্ছেতেই তুমি আজ বেঁচে গেলে। তোমাকে দিয়ে মা'র কত না জানি কাজ আছে।'

হৃদয়কে কাছে ডেকে নিল হলধারী। বললে, 'আচ্ছা হৃদু, তুই বল এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

কোনটা?

'এই যে কাপড় ফেলে পৈতে ফেলে সাধন করা?'

হলধারীকে হৃদয়ের বড় ভয়। বললে, ‘কখনো না। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিলে চলে কি করে?’

‘বল্‌ সেই কথা।’ উৎফুল্ল হল হলধারী। ‘কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম। সেই ব্রাহ্মণত্বকে উনি এক কথায় নস্যাৎ করে দেবেন?’

এক কথায় আর সবাইর মত হৃদয়ও নস্যাৎ করে দিল। বললে, ‘পাগল! বদ্ধ পাগল!’

‘তবু তোর কথাই যা হোক কিছু শোনে। তুই দৃষ্টি রাখবি, বাধা দিবি, যেন ও-সব অনাচার না করে। দরকার হয় তো বেঁধে রাখবি দড়ি দিয়ে।’

পাগল বলে কেটে পড়তে চাইল হৃদয়। কিন্তু, মুখে যাই বলুক, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না হলধারী। অন্তত যখন পূজা দেখে গদাধরের। দেখে উৎসর্গের উন্মাদনা। ঈশ্বরের আবেশ না হলে কেউ কি এমন বিভোর হয়ে পূজা করতে পারে? ছুটে যায় হৃদয়ের কাছে। ‘ওরে হৃদু, পাগল নয়। অলৌকিক।’

তাই না কি? হৃদয় বোকা সাজে।

‘অলৌকিক না হলে এমন কখনো হতে পারে? কেউ পুজো করতে পারে এমন ভাবে? তুই বল দেখি সত্য করে ওর মধ্যে তোর কিছু আশ্চর্যদর্শন হয়েছে?’

‘আমার কী দর্শন হবে! আমি দর্শনের জানি কী!’

‘নইলে ওকে তুই রাত-দিন এমন চাকরের মতন সেবা করিস কেন?’

‘তবু মনে হয় আরো কেন করতে পারি না।’ তবু হৃদয়ের মুখে তৃপ্তির তন্ময়তা। চিনতে পেরেছে হলধারী। আর তার ভুল হবে না।

‘এবার আমি তোকে ঠিক চিনতে পেরেছি। নিশ্চয়ই তোর মাঝে দিব্যাবেশ হয়েছে। হিসেবে আর ভুল হবে না আমার।’

গদাধর হাসে। আবার কখন ‘গোলেমালে চণ্ডীপাঠ’ হবে তার ঠিক কি।

মন্দিরের কাজ সেরে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে পড়তে বসে হলধারী। মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টিপ নস্যি নেয়। সেই এক টিপ নস্যিতেই খুলে যায় বুদ্ধি। ভাবে, এত শাস্ত্র-শাসন কিছু পড়েছে গদাধর? বোঝে কিছু?

ডাকো গদাধরকে।

‘তুই এ সব কিছু জানিস? বুঝতে পারবি?’

‘খুব।’

‘কি করে পারবি? তুই তো আকাট মূর্খ—’

‘আমি মূর্খ হলে কি হয়, আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বজ্ঞান। তিনিই সকল কথা বুঝিয়ে দেন আমাকে।’

‘ইস্‌, মস্ত বড় পণ্ডিত এসেছিস! সব যে তুই বুঝবি, তুই কি অবতার?’ হলধারী গরম হয়ে ওঠে।

‘এই যে বলেছিলে, আর গোল হবে না হিসেবে—’ মনে করিয়ে দেয় গদাধর।

‘রাখ্‌, তোর কথায় আমার গা জ্বলে। শাস্ত্র পড়িসনি যখন, আমার সঙ্গে কথা বলতে আসিস নে। কলিতে কল্কি ছাড়া আর অবতার নেই। যা, চলে যা। ঠিক চিনেছি তোকে। আর ভুল হবে না। তুই আস্ত আকাট—’

ছুটে গিয়ে হৃদয়কে ধরে এনেছে হলধারী। ঐ দ্যাখ। তুই বলিস পাগল হয়েছে, আমি বলি ব্রহ্মদৈত্যে পেয়েছে। তা না হলে এমন দশা হয়?

তাকিয়ে দেখল হৃদয়। দেখল বস্ত্র ত্যাগ করে গদাধর গাছের মগডালে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে কালীকে হলধারী তমোময়ী বলে মনে করত। তমোময়ী মানে তমোগুণান্বিতা। যে তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা তার যে অধিষ্ঠাত্রী। অবিবেক বা প্রমাদমোহের যে উৎপাদিকা। যে 'জঘন্যগুণবৃত্তস্থা'। একদিন মুখোমুখি বললে তাই গদাধরকে। 'তুই ও তামসী মূর্তির পুজো করিস কেন? ওতে কি কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে? বরং ও তোকে অধোগামী করবে। জানিস না, গীতায় কি বলেছে? "অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ"।'

ইষ্টনিন্দা শুনে বিমর্ষ হয়ে গেল গদাধর। কিন্তু সাধ্য কি হলধারীর সঙ্গে সে তর্ক করে। শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেবারই বা তার বিদ্যে কোথায়? সে সোজাসুজি মাকেই গিয়ে জিগ্‌গেস করতে পারে, মা, তুই কী! তোর রূপে যে এত অন্ধকারের ঐশ্বর্য সে কি অজ্ঞানের অন্ধকার?

মাকে সে তাই বললে সরল ভাবে। বল, তুই কী, তুই কে। তুই না বলে দিলে আমি বুঝব কি করে? আমি কি শাস্ত্র জানি না ব্যাকরণ জানি? যখন তুই আমাকে তা শেখালি না তখন নিজে থেকে আমাকে সব দেখিয়ে দে। নইলে হলধারীর সঙ্গে আমি লড়ব কি দিয়ে? ও শাস্তর-জানা পণ্ডিত, কত শত বচন ওর মুখস্থ। ওর সঙ্গে আমি পারব কেন? তুই যদি কিছু না বোঝাস, তবে বুঝব হলধারীর কথাই ঠিক। তুই তামসী, তুই—

মা দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, আমি ত্রিগুণাতীত, আবার সর্বগুণাশ্রয়ী। স্বরূপতঃ নির্গুণ আবার মায়ারূপে সগুণ। নির্গুণ সগুণের অধিষ্ঠান। সগুণ নির্গুণের উদ্ঘাটন। সমুদ্রকে আশ্রয় করেই তরঙ্গের লীলা। তরঙ্গকে আশ্রয় করে সমুদ্রের উন্মোচন। আবার আমি আকাশ। সমস্ত গুণের অতীত। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শূন্য।

'তবে রে—' দ্রুত বেগে ছুটল গদাধর। হলধারী পুজো করছিল, একেবারে তার ঘাড়ে চেপে বসল। 'তবে রে, তুই আমার মাকে তামসী বলিস? মা আমার সর্ববর্ণময়ী আবার ত্রিগুণাতীতা! এত শাস্ত্র পড়িস আর তুই এটুকু জানিস না?'

মুহ্যমানের মত তাকিয়ে রইল হলধারী। কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতে পেল না। মনে হল এ যেন গদাধর নয়, তার মাঝে সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব।

ফুল-বেলপাতা হঠাৎ গদাধরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বসল।

হৃদয় কাছেই ছিল। শুনিয়ে দিল টাস-টাস।

'কি গো মামা, বলতে না গদাধর পাগল হয়েছে? এখন? এখন যে নিজেই বড় পায়ে ফুল দিয়ে পুজো করছ?'

'কি জানি, আমিই বুঝি পাগল হয়ে গেলাম!' বিহ্বলের মত বললে হলধারী: 'তার মাঝে আমার স্পষ্ট ঈশ্বরদর্শন হল।'

কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের।
গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখে আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। ছুটে গেল হলধারীর কাছে। শুধোলে, 'দাদা, এ কি হল?'
'একে গলিতহস্ত বলে।' বললে হলধারী: 'তোর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, ঈশ্বরদর্শনের পর তর্পণ থাকে না।'
কোনো কর্মই থাকে না সমাধি হলে।
ঠাকুর বললেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে: 'যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে কত কথা। কত গুণগুঞ্জন। যাই তুমি এসে পড়েছ অমনি সব কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তোমার দর্শনেই সুখ।'
যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখা চালানো। যখন হাওয়া আপনি আসে তখন আর পাখার দরকার কি। তখন তার স্পর্শনেই আনন্দ।

১৬

রাসমণির কালীমন্দিরে গদাধর আর পুজো করছে না—কামারপুকুরে চন্দ্রমণির কানে খবর পৌঁছুলো।
কেন করছে না রে পুজো? কী হয়েছে আমার গদাধরের?
মাথা-খারাপ হয়েছে। হারিয়েছে সমস্ত মাত্রাজ্ঞান। এমন কাণ্ডকারখানা সব করছে যা সব সময় পাগল-ছাগলেও করে না। তোমার ছেলেকে বাড়ি আসতে বলো।
চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। চিঠির পর চিঠি লেখাতে লাগলেন রামেশ্বরকে দিয়ে। তুই আমার কাছে চলে আয়। ছেলেবেলায় তোর যে রকম অসুখ হত, তাই বোধ হয় আবার শুরু হয়েছে। এখানে গাঁয়ের জল-হাওয়ায় তোর শরীর ভালো হবে। ভালো হবে আমার যত্ন-আত্তিতে। ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়। তোকে না দেখে-দেখে আমার দুই চোখ ক্ষয় হয়ে গেল।
কামারপুকুরে, মা'র অঞ্চলের ছায়ায় ফিরে এল গদাধর।
কিন্তু এ কী হয়ে গেছে সে! কখনো জড়ের মত উদাসীন হয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে হাসে, কখনো বা 'মা' 'মা' বলে কেঁদে আকুল। এই ব্যাকুল-করা মা-ডাকেই বেশি কাতর হন চন্দ্রমণি। কি ভাবে প্রতিকার করবেন বুঝতে পারেন না। প্রাণের সমস্ত স্নেহ আর আশীর্বাদ দুই করতলে ডেকে এনে ছেলের বুকে-পিঠে হাত

বুলিয়ে দেন। একটু বা সুস্থির হয় গদাধর। হাসি-খুশি হয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-গল্প করে।

কিন্তু কতক্ষণ সেই স্বভাবস্থিতি! কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই ভাবাবেশ। সেই বহির্জ্ঞানশূন্যতা। আচরণে না আছে লজ্জা, না আছে ঘৃণা, না আছে ভয়লেশ। একেবারে নির্মুক্ত-নিঃসীম। ঘর-সংসার বলে কিছু আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা নেই। লোকলজ্জা বলে কিছু আছে, নেই সেই সংকীর্ণ সংস্কার।

ঠিক পাগল হয়নি। পাগল হলে মাকে, চন্দ্রমণিকে, এত ভালোবাসে কি করে, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেই বা কেন এত ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আসল কথা, উপদেবতা ভর করেছে। ওঝা ডাকাও।

পাঁচ জনের পরামর্শে ওঝা ডাকালেন চন্দ্রমণি। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করলে, মন্তর আওড়ালে। একটা পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিলে গদাধরকে। বললে, ভূত যদি হয় এতেই পিঠ্‌টান দেবে। আর যদি না হয়—মনে-মনে হাসল গদাধর। ওতে কিছু হবে না। চণ্ড নামাতে হবে।

এল চণ্ডর ওঝা। মস্ত বড় গুনিন। তন্ত্রে-মন্ত্রে নিপুণ।

চণ্ড নামবে—গ্রাম্য লোকজন এসে ভিড় করেছে। এবারে অব্যর্থ ব্যাধি-শান্তি হবে গদাধরের। যথাবিধি পুজো হল, বলি দেওয়া হল চণ্ডকে। চণ্ড এসে অধিষ্ঠান হল শূন্যে। ওঝাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে ভূতে পায়নি, ওর কোনো আধি-ব্যাধি নেই—' পরে সম্বোধন করলে গদাধরকে : 'কি হে সাধু, সাধুই যদি হবে, তবে অত সুপুরি খাও কেন?'

সময় নেই অসময় নেই, সুপুরি খেত গদাধর। কথা শুনে সে তো হতবাক। 'বেশি সুপুরি খেলে কাম বাড়ে। ও খাবে না।'

সুপুরি ত্যাগ করল গদাধর।

গ্রামের দুই ধারে দুই শ্মশান—ভূতির খাল আর বুধুই মোড়ল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই শ্মশানবাস করে গদাধর। হাঁড়ি করে মেঠাই নিয়ে যায়, শিবা আর প্রমথদের ভোগ দেয়। যে হাঁড়ি শেয়ালের জন্যে, কোত্থেকে দলে-দলে এসে খেয়ে যায় নিশ্চিন্তে। আর যে হাঁড়ি ভূত-প্রেতের জন্যে তা হঠাৎ শূন্যে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আধার বা আধেয় কিছুরই পাত্তা পাওয়া যায় না। কোনো-কোনো দিন বা স্পষ্ট সাক্ষাৎ হয় পিশাচদের সঙ্গে। রঙ্গ-রহস্যও হয় কিছু-কিছু।

একদিন নিশীথ রাত্রেও গদাধরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। মা'র কাছে ছোট ছেলে চিরকালই ছোট ছেলে—চন্দ্রমণি শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন রামেশ্বরকে। গদাধরকে গিয়ে ধরে নিয়ে আয়। ও কি মা'র ঘর শ্মশান করে শ্মশানেই বসতি করবে?

শ্মশানের প্রান্তে এসে নিঃসাড় অন্ধকারে ডাকতে লাগল: গদাই, গদাই, ওরে গদাই আছিস্?

'যাচ্ছি গো দাদা—' প্রতিধ্বনি করল গদাধর। চেঁচিয়ে বললে, 'এদিক পানে আর এগিয়ো না। আমার সঙ্গে তো এঁটে উঠছে না, তাই তোমার এরা অনিষ্ট করবে। তুমি ফিরে যাও।'

শ্মশানে বসতে পেয়ে অনেক শান্ত হয়েছে গদাধর। একটি বেলগাছ পুঁতেছে। আর বুড়ো যে অশ্বত্থ গাছ ছিল ডাল-পালা ছড়িয়ে, তারই তলায় সে আসন নিলে। সেখানে ঘন-ঘন কালীদর্শন হতে লাগল তার। দেখতে লাগল সে কর্ত্রীকারয়িত্রী সংসারৈকসারাকে। যে সাকারশক্তিস্বরূপা দিগন্তবসনা খড়্গমুণ্ডাভিরামা। আগম-নিগম-ফলময়ী, বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী।

শান্ত হয়েছে বটে কিন্তু ঔদাসীন্য যায় না। যায় না সংসার-অস্পৃহা। বসনেই আঁট নেই, আর কোথায় তবে আঁটা থাকবে? কি করে সংসারে একটু মন পড়বে? মনে কি করে আসবে একটু মোহ-মমতা?

বিয়ে দাও গদাধরের।

রামেশ্বরে আর চন্দ্রমণিতে লুকিয়ে-লুকিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। পাছে গদাধরের কানে গেলে সে সব ভণ্ডুল করে দেয়। কিন্তু তুমি দেয়ালের কান এড়াতে পারো, গদাধরের কান এড়াতে পারো না। ঠিক সে শুনে ফেললে।

শুনে তার কেমনতরো ভাব হল না জানি!

'ওরে, আমার বিয়ে হবে!' উল্লাসে উথলে উঠল গদাধর। শিশুর মত উল্লাস। শিশুর মতই নৃত্যানন্দ। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে বা প্রিয় আত্মীয়ের আসার সম্ভাবনা ঘটলে শিশু যেমন মাতামাতি করে তেমনি। যেন সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কে আসছে তার সংসারে। তার সমস্ত প্রার্থনার প্রতীক, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী।

বিয়েতে মন আছে গদাধরের। নিশ্চিন্ত হলেন চন্দ্রমণি, নিশ্চিন্ত হলেন রামেশ্বর। ঘটক লাগালেন। ঘটক আর কেউ নয়, হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুজ্জে।

শিওড়ে, হৃদয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে গদাধর। যাচ্ছে পাল্কিতে চড়ে। মুক্ত নীল আকাশ আর ঢেউ-খেলানো অঢেল ধান-খেত দেখতে-দেখতে গদাধরের ভাবাবেশ হল। তার ভিতরে যে আদিকবি ধ্যানস্থ ছিলেন, তিনি যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলন করলেন। গদাধর দেখল তার দেহ থেকে দু'টি কিশোর বয়সের ছেলে বেরিয়ে এসে মাঠময় ছুটোছুটি করে খেলা করছে। কখনো যাচ্ছে অনেক দূরে চলে, কখনো বা এসে পড়ছে পাল্কির কাছটিতে। নীরব ছায়ার মত ভাসছে না, দস্তুরমত হাসছে, কথা কইছে, গান গাইছে। কারা এই দু'টি ছেলে? কোন দেশের? তার শরীরের মধ্যে বাসা নিল কি করে?

অনেক দিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। বছর দেড় বাদে দক্ষিণেশ্বরে বামনিকে প্রশ্ন করেছিল গদাধর: 'ঐ দু'টি ছেলে কে বলতে পারো? আমি ভুল দেখিনি তো?'

'না বাবা, ভুল দেখনি। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। তোমার মাঝে এবার চৈতন্য আর নিত্যানন্দ দুই-ই এসে বাসা নিয়েছেন। ঐ দু'টিতেই খেলছিল ছুটোছুটি করে।'

শিওড়ে হৃদয়ের বাড়িতে গান হচ্ছে। তাই শুনতে এসেছে গদাধর। ভিড় হয়েছে বিস্তর। পুরুষ মেয়ে—আর, সর্বত্রগামী অনুষঙ্গ, ছেলেপিলেও অনেক এসেছে। এক স্ত্রীলোকের কোলে তিন-চার বছর বয়সের এক খুকি। ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে সভার মধ্যে। স্ত্রীলোকটি তাকে রঙ্গ করে জিগ্গেস করছে: বিয়ে করবি?

সম্মতিতে ঘাড় হেলায় মেয়ে। এত লোকের মধ্যে কা'কে বিয়ে করবি? কা'কে তোর পছন্দ? হাত তুলে নিকটে-বসা গদাধরকে দেখিয়ে দিল স্বচ্ছন্দে।

ঐ যে স্ত্রীলোকটি মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে সে শিওড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরী। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এসেছে বাপের বাড়িতে বেড়াতে। কোলে প্রথম সন্তান সারদা।

বাপের বাড়িতে শ্যামাসুন্দরীর তখন অসুখ। একদিন এল্লা-পুকুরের পাড়ে বাইরে গেছে—ঠাহর নেই—বসে পড়েছে এক বেল গাছের তলায়। কাছেই গাঁয়ের কুমোরদের পোয়ান, যেখানে পোড়ানো হয় হাঁড়িকুঁড়ি। সেখানে হঠাৎ ছোট-ছোট পায়ে নূপুর বেজে উঠল রুনুঝুনু। দেখতে-দেখতে ছোট একটি মেয়ে ছুটে এল নাচতে-নাচতে। শ্যামাসুন্দরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরলে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল শ্যামাসুন্দরী। মনে হল সেই মেয়ে তার পেটে ঢুকেছে।

তেমনি রামচন্দ্র একদিন দুপুরে ঘুমুচ্ছে, স্বপ্ন দেখল একটি ছোট্ট মেয়ে তার পিঠের উপর পড়ে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরছে। হাতে-গায়ের গয়নায় মেয়ের রূপ যেন আরো খুলেছে। এই গরিবের ঘরে কে মা তুমি? এখানে কি করতে এলে? মেয়েটি বললে, 'এই এলুম তোমার কাছে।'

আটুই পৌষ, বারোশো ষাট সাল, গদাধরের জন্মের প্রায় আঠারো বছর পর, জয়রামবাটিতে শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে হল। নাম রাখলে সারদা।

ঠাকুর বললেন, 'ও সরস্বতী। ও সারদা। ও জ্ঞান দিতে এসেছে।'

ভক্তির পথও সত্যি, জ্ঞানের পথও সত্যি। ভক্তি মানে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। 'সুখানুশয়ী রাগঃ'। বিষয় যত সুখকর তত তীব্র তাতে অনুরাগ। আর যাতে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় তাই ঈশ্বর। অনুরাগের ধর্মই হচ্ছে স্মরণ-চিন্তন-অনুধ্যান। সুতরাং অনুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত হয়ে থাকাই ভক্তি। যোগশাস্ত্রের ভাষায় তাই সমাধি। তাই ভক্তি আর যোগে কোনো ভেদ নেই। জ্ঞানও অভিন্ন। যখন পরমাত্মবোধ জেগে থাকবে তখনই জ্ঞান। যোগশাস্ত্রে তাকে বলে 'অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি'। অন্য বিষয় ত্যাগ করে পরমাত্মাকেই সর্বদা বোধগম্য রাখাই প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ।

ভক্তিই বলো, যোগই বলো আর জ্ঞানই বলো, অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততাই মুখ্যবৃত্তি।

কিন্তু যতই বিচার-আচার করো, মা'র কৃপা না হলে কিছুই হবার জো নেই। মানুষের কতটুকু শক্তি? কতটুকু সে চেষ্টা করতে পারে? কাম-কাঞ্চন ঠিক-ঠিক মিথ্যে, জগৎ তিন কালেই ঠিক-ঠিক অ-সৎ, মনে-জ্ঞানে এ ধারণা করা কি যে-সে কথা? মা'র দয়া না হলে কি হয়? কথায় বলে, এক-একটি জোয়ানের দানায় এক-একটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয় তখন একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না। শুধু মাকে প্রসন্ন করো, মা'র কৃপার জন্যে বসে থাকো। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।'

জয়রাম মুখুজ্জের মেয়ে কালীর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। কিন্তু জয়রাম বেঁকে বসল ভাঙড় না হোক, ক্ষ্যাপা তো বটে—তাকে জামাই করব কি। তাছাড়া কোনো-

কোনো জায়গায় রামেশ্বরই নিজে এগোতে চাইল না। তখনকার দিনে কন্যা-পক্ষেরই পণ নেবার প্রথা। এক-এক জায়গায় এমন দর হাঁকল, যা রামেশ্বরের নাগালের বাইরে। তবে? এখন ইতিকর্তব্য কি?

খুব সোজা। চাষাদের শশার খেত দেখেছ?

বিরস ও বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন চন্দ্রমণি। পাশে রামেশ্বর। দু'জনেই চমকে উঠলেন।

যে শশাটি ভালো ফলেছে তাতে চাষা একটি কুটো বেঁধে রাখে। কুটো বেঁধে চিহ্ন দিয়ে রাখে ভগবানকে ভোগ দেবে বলে। যাতে ভুলে বা গোলমালে না বিক্রি হয়ে যায়। তেমনি—

তেমনি কি? মা-দাদা উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'তেমনি আমার বিবাহের পাত্রী জয়রামবাটি গাঁয়ের রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটো-বাঁধা হয়ে আছে।' বললে গদাধর, 'মিছে তোমরা এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করছ। এতে ভাবনারও কিছু নেই, হয়রানিরও কিছু নেই।'

জয়রামবাটিতে লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি। কিন্তু খবর যা এল তা বিশেষ উৎসাহ-বর্ধক নয়। আর সব মিলেছে বটে কিন্তু পাত্রীর বয়স মোটে পাঁচ বছর।

হোক পাঁচ বছর! গুপ্তভাবেই আপ্ত লীলা জগন্মাতার। হয়তো এই জনকনন্দিনী সীতা। এই কৃষ্ণ-উন্মাদিনী রাধিকা। শিবভাবভাবিনী ভগবতী। চন্দ্রমণি মত দিলেন।

কন্যা-পক্ষের পণ তিনশো টাকা। তা হোক, যোগাড় করলেন রামেশ্বর। বিয়ের দিন ঠিক হল ১২৬৬ সালের বোশেখ মাসের শেষ বরাবর। গদাধর চব্বিশ বছরে পা দিয়েছে, সারদা ছ' বছরে।

জয়রামবাটিতে বিয়ে। জয়রামবাটি কামারপুকুর থেকে মাইল চারেকের পথ—পশ্চিমে। বরবেশে গদাধরকে না-জানি কেমন দেখাচ্ছে! শক্ত করে কসি-বাঁধা সুন্দর ধুতি পরনে, গায়ে কুর্তা, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনলেপ। প্রতিবেশিনীরা এসে সাজিয়ে দিয়েছে গদাধরকে কিন্তু মেজ বৌঠানের মনে দুঃখ, বাজনা নেই। অন্তত ঢোল আর কাঁসর না হলে বিয়ে কি!

দাঁড়াও, আমিই ঢোল বাজিয়ে দিচ্ছি।

দু'হাতে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগল গদাধর। মুখে বোল তুললে ঢোলের। রঙ্গ দেখে সকলে হেসে খুন। মেজ বৌঠানের মনেও আর খেদ নেই।

বিয়েতে চলেছে—এমন সময় ঢোলের বাজনা!

বাল্যভাব না ধরলে গদাধরকে বুঝতে পারবে না কেউ।

খালি পায়ে, খোলা গায়ে বরযাত্রী চলেছে সব। কোমরে চাদর, কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি। যেন শিবের বিয়েতে চলেছে সব তাল-বেতাল, ভূত-প্রেতের দল। মধ্যে চলেছেন কন্দর্পদর্পনাশী ব্যোমকেশ।

সারদার সঙ্গে কেমন না-জানি শুভদৃষ্টি হল গদাধরের। অপর্ণার সঙ্গে মহাদেবের। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষ-প্রকৃতির যোগই যোগমায়া। বঙ্কিম ভাব ঐ যোগের জন্যে। এই যোগ দেখার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তো যেহেতু শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তোর মত উজ্জ্বল। শ্রীমতীর বসন নীল বলে পীতাম্বর হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়েও নূপুর। তার মানে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে-বাহিরে মিল। যেমন ধরো আবার শিব-কালীর মূর্তি। শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কালী, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন পদতলে। আর কালী তাকিয়ে আছেন শিবের দিকে। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্তা। তাই শিব শব হয়ে আছেন। কিন্তু পুরুষের যোগেই প্রকৃতির লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রাসোৎসব। শিব আর শক্তি ভিন্ন সংসারে আর কিছু নেই।

শিব আর শক্তির চারি চক্ষুর মিলন হল।

সাতাশ কাঠি জেবলে এয়োরা বরকে প্রদক্ষিণ করছে, হঠাৎ জ্বালা-কাঠি লেগে গদাধরের হাতে-বাঁধা হলুদে-মাখানো মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

এটা কি হল?

অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অবিদ্যা-মুক্ত শক্তিকে গ্রহণ করল গদাধর।

ঠাকুর বললেন, 'এই অবিদ্যাকে জয় করবার জন্যেই তো শক্তির পূজা-পদ্ধতি। তাকে প্রসন্ন করবার জন্যেই দাসী ভাবে, বীর ভাবে, সন্তান ভাবে আরাধনা। রমণ দ্বারা প্রসন্ন করার নাম বীর ভাব। সে বড় উৎকট সাধনা। আমার সন্তান ভাব। স্ত্রীলোকের স্তন আমি মাতৃস্তন মনে করি। মা'র দাসী ভাবে, সখী ভাবে ছিলাম দু'বছর। মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। বিয়ের সময় বাঙলা দেশে বরের হাতে জাঁতি থাকে, পশ্চিমে থাকে ছুরি। তার মানে, ঐ শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়া-পাশ ছেদন করবে। এটিও বীর ভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিয়েতে বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে। কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।'

বাসর সাজাচ্ছে মেয়েরা। ওদিকে পাত পড়েছে নিমন্ত্রিতদের।

রঙ্গিনীরা ধরলে গদাধরকে, গান ধরো একখানা।

কত রসরঙ্গই যে করছে মেয়েরা, কত লীলা-চাপল্য। দেখতে-দেখতে ভুবনরঙ্গিনীর কথা মনে পড়ে গেল গদাধরের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, গান গাইবে বৈ কি। মুক্ত-উদার গলায় শ্যামাগুণগান শুরু করলে।

যারা খাচ্ছিল, খাওয়া ভুলে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। রঙ্গিনীরা রঙ্গ ভুলে পাষাণবৎ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। গদাধর তন্ময়, বিভোর, বাহ্যজ্ঞানহীন। লুটিয়ে পড়ে রঙ্গিনীদের প্রণাম করতে ব্যস্ত। মা, মা গো, সর্বত্রই তুই, সর্বত্র তোর আনন্দের ছড়াছড়ি।

মধুর স্বরে নামোচ্চারণ করছেন ঠাকুর। আর বলছেন মাকে: 'ও মা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস নে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! শুঁটকে সাধু আমি হব না।'

১৭

ঘর-আলো-করা বউ এসেছে সংসারে।

বরবধূকে দেখবার জন্যে কত লোক এসেছে আনন্দ করে। কত শান্তির দিন আজ চন্দ্রমণির! কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও একটা দুঃখের কাঁটা তাঁর মনের মধ্যে খচ-খচ করছে। বউয়ের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

বউকে গয়না গড়িয়ে দেবেন এমন সঙ্গতি নেই চন্দ্রমণির। লাহা বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এসে বিয়ের দিন সাজানো হয়েছিল বউকে। ফিরিয়ে দেবার দিন আজ। লাহা বাবুদের কাছে মুখ থাকবে না নইলে। কিন্তু কোন মুখেই বা ঐ কচি গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নেব?

মা'র মনের ব্যথাটা বুঝতে পেরেছে গদাধর। বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমিই খুলে নিতে পারব।

ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। শৈশবশান্তিতে ঘুমিয়েছে।

ডান হাতখানি আলগোছে আলতো করে তুলে ধরছে গদাধর, সন্তর্পণে খুলে নিচ্ছে গয়না। তেমনি এক সময়ে আবার বাঁ হাত থেকে। ক্রমে-ক্রমে একে-একে আর সব-গুলিই। সারদা যেমন ঘুমে তেমনি ঘুমে।

টের পেল ঘুম থেকে জেগে উঠে। এ কি, তার গায়ের গয়না কি হল? কে নিল? কাঁদতে বসল সারদা।

চন্দ্রমণির বুক ফেটে যাচ্ছে। সারদাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। বললেন, 'গেলে গেছে। তুমি কেঁদো না, এর চেয়ে ঢের ভালো গয়না কত দেবে তোমাকে গদাই।'

সারদা শান্ত হল বটে, কিন্তু তার খুড়ো মেনে নিতে চাইলেন না ঘাড় পেতে। নতুন বালিকা-বধূকে একেবারে বৈরাগিনী সাজিয়ে দেওয়া। যা নয় তাই দিয়ে সাজিয়ে ফের সেই সাজ লুকিয়ে খুলে নিয়ে যাওয়া। এ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি। ঘোর বিরক্ত হলেন। সারদাকে নিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জয়রামবাটি।

'কোথায় আর যাবে?' পরিহাসচ্ছলে মাকে প্রবোধ দিল গদাধর। 'ও ফিরে না আসুক কিন্তু বিয়ে তো আর ফিরবে না।'

শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপর-হাতে তাবিজ আর নিচের হাতে বালা।

ওরে, বালা কিন্তু ডাইমন-কাটা হবে।

ঠাকুরের দেখি গয়নার নক্সার উপরেও নজর।
ওরে, পঞ্চবটীতে যখন সীতা দেবীকে দেখেছিলাম তখন তাঁর হাতে ডাইমন-কাটা বালা ছিল। সেই রকম বালা দেব ওকে।
বিষ্ণুঘরের যখন গয়না চুরি গেল, মথুরবাবু ঠাকুরকে খোঁটা দিলেন: 'ছি ঠাকুর, তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!'
ঠাকুর বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব? তুমি কী ঐশ্বর্য তাঁকে দিতে পারো? ও গয়না তোমার পক্ষেই একটা ভারি জিনিস, মস্ত জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মাটির ড্যালা।'
সেই কথাই আবার বলছিলেন কেশব সেনকে। 'তোমরা অত ঐশ্বর্য বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর, তুমি সূর্য করেছ, চন্দ্র করেছ, আকাশ করেছ—এ সব বলার কী দরকার? শুধু বাগান দেখেই তারিফ করে লাভ কি? বাগানের মালিক বাবুকে দেখবে না? বাগান বড় না বাবু বড়? নরেন্দ্রকে যখন আমি দেখলাম, তখন আমি শুধু তাকেই দেখলাম—তার কোথায় বাড়ি, বাবার কি নাম, কি করে, তারা ক'টি ভাই ভুলেও একদিন জিগ্‌গেস করলাম না। আমার অত খবরে কাজ কি? আমি আম খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে ক'টা গাছ, ক'টা তার ডাল-পালা, কত তার পাতা—ও খোঁজে আমার কি হবে? মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসেবে আমার কী দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে গেছে।'
তবে কি জানো? মানুষ নিজে ঐশ্বর্য ভালোবাসে বলে ভাবে ঈশ্বরও বুঝি তাই ভালোবাসেন। ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। ঈশ্বরের কাছে ও-সব বাজিকরের বাজি। পঞ্চভূতের কুহক-কৌশল।
ঠাকুর যখন কলকাতায় আসতেন হৃদয় তাঁকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শহর দেখাত। একদিন বললে, 'এই দেখ মামা, লাট সাহেবের বাড়ি। দেখেছ? কত বড়-বড় থাম!'
ঠাকুর মাকে দেখলেন। মা-ই সব দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির চাক থাক-থাক করে সাজানো।
শম্ভু মল্লিক মস্ত বড়লোক—মা-অন্ত প্রাণ। মথুরবাবু মারা যাবার পর মা'র নির্দেশে তিনিই হলেন ঠাকুরের রসদদার। ঠাকুরকে বললেন, 'এখন এই আশীর্বাদ করো, যাতে আমার যা-কিছু ঐশ্বর্য সব তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'
ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কী দেবে? কী আছে তোমার দেবার? তাঁর কাছে এ সব ধুলো-মাটি।'
যদি কিছু দিতে চাও ভক্তি দাও, প্রাণঢালা ভক্তি। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ, তিনি ভাবের বশ। তিনি কি তোমার কাছে টাকা-কড়ি ধন-দৌলত চান? তিনি চান ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা।
গদাধর সেবার প্রায় বছর দুই ছিল কামারপুকুরে। শরীর ভালো করে না সারলে চন্দ্রমণি তাকে কিছুতেই আর যেতে দেবেন না কলকাতায়। এদিকে সারদা সাত বছরে পা দিল। এবার একবার গদাধরকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। 'জোড়ে' ফিরতে হয় বউ নিয়ে। তাই গেল গদাধর।

সাত বছরের মেয়ে সারদা—তাকে কে বলে দিলে কে জানে—ঘটি করে জল নিয়ে এল। নিয়ে এল পাখা। রূপের পুতলি সেই মেয়ে, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জল ঢেলে গদাধরের পা ধুয়ে দিতে লাগল সারদা। জল-ভরা ছোট-ছোট দু'টি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ের উপর। শেষে হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে মাথার চুলে পা মুছে দিতে লাগল।

পা-ধোয়ানোর পর কাছে এসে দাঁড়াল সারদা। ছোট হাতে পাখা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দিতে লাগল গদাধরকে।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বসেছেন বিষ্ণুর পদসেবায়। কিংবা, সারদা গদাধরের।

এই সেবাতেই নিয়তস্থিতা সারদা। বারো শো একাত্তর সালে দুর্ভিক্ষ লেগেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সারদার তখন এগারো বছর বয়েস, আছে বাপের বাড়িতে। খিদের তাড়নায় কত লোকই যে আসছে কাতারে-কাতারে। রামচন্দ্র, সারদার বাবা, চালে-ডালে খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখছেন হাঁড়ি-হাঁড়ি। বলছেন, 'বাড়ি আর বাড়ির বাইরের সবাই খাবে এ খিচুড়ি। যে আসবে সে। শুধু আমার সারদার জন্যে দু'টি ভালো চালের ভাত করবে—'

তাকে তো শুধু খাওয়ানো নয়, তাকে একটু ভোগ দেওয়া!

এক-এক দিন এত লোক এসে পড়ে যে রাঁধা খিচুড়িতে কুলোয় না। আবার চড়ানো হয় তক্ষুনি। আর সেই গরম খিচুড়ি ঢেলে দেয় ক্ষুধার্তের পাতায়। যেমন তপ্ত খিদে তেমনি তপ্ত খিচুড়ি।

সারদা পাখা নিয়ে এসে দুই হাতে বাতাস করে। আহা, শিগগির করে জুড়োক, খিদের অন্ন কতক্ষণ মুখে না দিয়ে থাকা যায়!

এগারো বছরের বালিকা নয়, স্বয়ং বিশ্বমাতা। দুঃখার্ত জীবের ক্ষুধাহরণ করতে এসেছেন।

তার আগে, পাঁচ বছরের যখন মেয়ে, তখন থেকে সে সংসারের কাজে সাহায্য করছে। খেত থেকে তুলো তুলে এনে চরকায় পৈতে কাটছে। মুনিষদের মুড়ি-গুড় দিয়ে আসছে মাঠে। একবার পঙগপাল এসে সমস্ত ধান নষ্ট করে দিলে। মাটি থেকে ধান কুড়োবার পালা পড়ল। সারদার ছোট-ছোট দু'টি মুঠিতে কি কম জায়গা? সেও লেগে গেল ধান কুড়োতে। আকণ্ঠ জলে নেমে গরুর জন্যে দলঘাস কাটছে। একবার দলঘাস কাটবার সময় দেখলে, তারই সমবয়সী আরেকটি মেয়ের হাতে দা, সেও কাটছে দলঘাস। কে মেয়ে, কেন কাটছে, কে বলবে। কাটছে বটে কিন্তু নিচ্ছে না। একটি দল কেটে উপরে রেখে এসে সারদা দেখছে আরেকটি দল কেটে রেখেছে মেয়েটি, সারদাকে আর কাটতে হচ্ছে না।

এমনি আরো কত দেখেছে সারদা। তেরো বছর বয়সে যখন সে আবার কামারপুকুরে যায় তখন হালদার-পুকুরে একা-একা নাইতে যেতে তার ভয় হত। নতুন বউ, একলা ঘাটে যাবে কি! খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, আটটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। তারাও নাইতে চলেছে। আর তবে কিসের ভয়! রাস্তায় নামল সারদা, মেয়েছেলেদের চারজন তার আগে, চারজন তার পিছনে। তার সঙ্গে তারাও আগে-

পিছে হয়ে স্নান করলে। তেমনি করে পোঁছে দিয়ে গেল বাড়ি। এমনি শুধু একদিন নয়, নিত্যি।

কিন্তু কারা এরা, গ্রামের নতুন ছুটুলে বউ সারদা, তার সে কি জানে!

এবার, সাত বছর বয়সে, স্বামীর সঙ্গে 'জোড়ে' এসেছে সে কামারপুকুরে। কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবার পরেই গদাধর জেদ ধরল, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাব। চন্দ্রমণি আর পীড়াপীড়ি করতে পেলেন না। গদাধর এখন অনেক সুস্থ হয়েছে, শান্ত হয়েছে। তারপর বিয়ে করেছে সজ্ঞানে। চন্দ্রমণির এখন অনেক আশ্বাস, অনেক জোর। সারদাই তাঁর সেই বল-ভরসা।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার যে-কে-সে। কোথায় তার মা-ভাই, কোথায় তার স্ত্রী-সংসার! আবার, দেখতে-দেখতে, বুক তার লাল হয়ে উঠল, শুরু হল দুঃসহ গাত্রদাহ। আর চোখের কোণ থেকে ঘুম গেল অদৃশ্য হয়ে। আবার দেখা দিল সেই অসাধ্য রোগ।

আবার শুরু হল মা'র জন্যে কান্না।

'তোকে ডাকার এই ফল হল, মা? শরীরে এই বিষম ব্যাধি দিলি? যায়-যাক এই শরীর, তবু তুই আমাকে ছাড়িসনি। তুই আমাকে দেখা দে, আমায় শুধু তুই এইটুকু কৃপা কর। আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই তুই ছাড়া—'

১৮

দেখুন দেখি আবার কি হল।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে গদাধরকে আবার নিয়ে এসেছেন মথুরবাবু।

ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে। এ কি উন্মাদ না মূর্চ্ছারোগ? রাতে এক ফোঁটা ঘুম নেই, একটা বাঁশ কাঁধে করে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরকে খেতে দিয়ে তার ভুক্তাবশেষ মুখে পোরে। সর্বাঙ্গে জ্বালা, বুক-পিঠ লাল। আগের ওষুধে তো কিছু হল না। অন্য কিছু ব্যবস্থা করুন।

গঙ্গাপ্রসাদ ভাবতে বসলেন। পাশেই উপস্থিত ছিলেন আরেক জন কে কবিরাজ। কেউ বলেন, গঙ্গাপ্রসাদের ভাই দুর্গাপ্রসাদ, কেউ বলেন, পূর্ববঙ্গের এক নামী বৈদ্য। তিনি বললেন, এ রোগ ওষুধে মালিশে সারবার নয়। এ হচ্ছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। এ ব্যাধি যোগজ ব্যাধি—

দিব্যদ্রষ্টা আয়ুর্বেদী। ইনিই প্রথম বুঝতে পারলেন রোগের মূল কোথায়।

কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে। বাইরের শাখা-পল্লব নিয়েই সকলের মাথাব্যথা। তেল-বড়ি, ভস্ম-চূর্ণ।

আস্তে-আস্তে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গদাধর। নিজের চোখ দেখে। স্থির, বন্ধ, নিশ্চল চোখ। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা দু'টো টানতে চেষ্টা করে, নড়াতে চেষ্টা করে। নড়ে না, পলক পড়ে না চোখের। কাচের চোখের মত নিস্পন্দ হয়ে আছে। চোখে খোঁচা মারে আঙুলের। তবু নিষ্পলক।

চন্দ্রমণির কানে খবর পৌঁছুল। নিরুপায় হয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়লেন। আমার গদাধরকে ভালো করে দাও। তার চোখে ঘুম দাও, তার গায়ের দাহ নিবারণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত না শুনছ আমার প্রার্থনা, জলস্পর্শ করব না আমি।

মুকুন্দপুরের শিবের কাছে যা। সেখানে গিয়ে হত্যে দে!

প্রত্যাদেশ পেলেন চন্দ্রমণি। ছুটলেন মুকুন্দপুর। দু-তিন দিন পড়ে রইলেন ধন্না দিয়ে, নিরম্বু নিরশনে। স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাদেব। পরনে বাঘছাল, মাথায় জটাজুট, হাতে ত্রিশূল। শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই, তোর ছেলে পাগল হয়নি। তার মাঝে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে, তাই তার ঐ বৈলক্ষণ্য। বাড়ি যা, মন ঠাণ্ডা করে থাক—

চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হলেন। শিবের পুজো দিয়ে মন খাঁটি করে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরলেন তাঁর কুলদেবতা রঘুবীরের আশ্রয়ে। সেবা করতে লাগলেন প্রাণ ঢেলে। আমার গদাধরকে দেখো। রেখো তাকে বাঁচিয়ে।

কিন্তু গদাধরের মন ঠাণ্ডা হয় না। নিয়তজাগ্রত নিষ্পলক দুই চক্ষু দিয়ে দীর্ঘ ধারায় তার জল পড়ে। বলে, মা, মা গো, দুই চোখ আমার নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে। যাতে এক নিমেষও তোকে না হারাই। যাতে পলক ফেলতে না ফেলতে পালিয়ে না যাস ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু তুই কই? এমনি করে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুই শেষে ঘুমিয়ে পড়বি নিশ্চিন্ত হয়ে? এই তোর বিচার? তোর বিবেচনা? রোগের যন্ত্রণায় বিনিদ্র সন্তান ছট্‌ফট্ করলে তার মা কি ঘুমোয়? না, তার ঘুম আসে?

এমনি ছ' বছর চোখের পাতা একত্র করেনি গদাধর। ছ' বছর সে পলক ফেলেনি। ঘুমোয়নি এক বিন্দু। দিনে-রাত্রে, আলোতে-অন্ধকারে, নির্জনে-জনতায় সর্বক্ষণ দুই চোখ সে খুলে রেখেছে। একটি তীব্র দৃষ্টিতে আবিদ্ধ করে রেখেছে। স্থির-নিবদ্ধ তীব্র দৃষ্টি।

মা কি পারেন না এসে? ঐ দৃষ্টির আহ্বান, ঐ দৃষ্টির আকর্ষণ এড়াতে পারেন এমন তাঁর সাধ্য নেই। ঐ পাথুরে কান্নাই মমতার নির্ঝরিণীকে ডেকে আনে।

বসেন এসে পাশটিতে। বলেন, ওরে আর কাঁদিস নে। আমি এসেছি। ডাকার মত ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি? এখন কি বলবি আমাকে বল। তাকা, কথা ক—

চাই এই একগুঁয়ে ব্যাকুলতা। অবাধ্য উন্মাদনা। যদি দেখা না দিবি তো রাত-দিন চোখ চেয়ে থাকব। দাঁতে কুটোটিও কাটব না। অনশনে দেহপাত করব। যদি বেশি দেরি করিস নিজের গলা কাটব। দেখি তুই টলিস কি না। চাই এই একবগ্‌গা গোঁ।

'মাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে এক গামলা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে বাবুদের লজ্জা হয়!' বললেন ঠাকুর : 'টাকার জন্যে খুব ছটফটানি। কিন্তু টাকায় হয় কি? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। ভগবান লাভ হবে না তো মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?'

কিন্তু কি করে পাবো ঈশ্বরকে?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। পড়ে-বুঝে-শুনে কিছুতেই পাবি না। যদি তিনি কৃপা করেন তবেই পাবি। তবে এই কৃপা উদ্রেক করবি কি করে? খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে। ছেলে অনেক ছুটোছুটি করছে দেখে মা'র দয়া হয়। খেলায় এসে মা লুকিয়েছিলেন, এসে দেখা দেন। তাঁরই ইচ্ছে বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হোক। তাঁর এ সংসার যে লীলার সংসার। তিনি যে ইচ্ছাময়ী।

চাই ব্যাকুলতা, চাই আনন্দসান্দ্রা ভক্তি, চাই অচল-অনল বিশ্বাস। তিন টান হলেই তবে দেখা দেন ভগবান। বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, পতির উপর সতীর টান আর সন্তানের উপর মা'র টান। এই তিন টান যদি মেশাতে পারিস তবে ভগবান সটান এসে মিশে যাবেন।

মা'র আঁচল ধরে ছেলে পয়সা চাচ্ছে, ঘুড়ি কিনবে। মা পাড়াবেড়ানীদের সঙ্গে গল্পে মত্ত, লক্ষ্যও নেই ছেলের দিকে। ছেলেও তেমনি নাছোড়, নাকী সুরে শুরু করে কাকুতি-মিনতি। মা তখন ওজর আপত্তি তোলে : না, উনি বারণ করে গেছেন। ঘুড়ি কিনে শেষে একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি। বলে আবার ছেঁড়া গল্পের সুতো ধরে। ছেলেও তেমনি ধুরন্ধর। কাকুতি-মিনতিতে যখন কিছু হল না, তখন সে স্রেফ কান্না জোড়ে। গল্প করা মাথায় ওঠে। তখন পাড়াবেড়ানীদের মা বলে, তোমরা একটু বোস ভাই, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়েছে মা, কিন্তু ব্যাকুলতার কাছে হার মেনেছে।

অনুরক্ত না করতে পারিস বিরক্ত করে মা'র থেকে আদায় করে নে। যা বিরক্তি তাই তাঁর অনুরক্তি।

তার জন্যে এক অস্ত্র ব্যাকুলতা। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন আমাদের, সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। বিষয়ের ভাগের জন্যে ব্যতিব্যস্ত করে তোল তাঁকে, আগেই দেখিস তোর হিস্যা ফেলে দেবেন। মা'র উপর জোর খাটবে না তো কার উপর খাটবে? আগে আমার হিস্যা ফেলে দাও তো দাও, নইলে গলায় ছুরি দেব।

নে বাবা, নে তোর হিস্যা, শান্ত হ।

ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? এক শিষ্য জিগ্‌গেস করলে গুরুকে। গুরু বললে, এস দেখিয়ে দিই। বলে এক পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। এই জলের মধ্যে

ঢোকো। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল শিষ্যকে। কতক্ষণ পরে টেনে তুললে হাত ধরে। জিগ্‌গেস করলে, কেমন লাগছিল? শিষ্য হাঁফ নিয়ে বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল, যেন প্রাণ যায়। গুরু বললে, যখন ভগবানের জন্যে প্রাণ এমনি আটুবাটু করবে, তখন জানবে দর্শনের আর দেরি নেই।

তোমার ব্যাকুলতা, তাঁর কৃপা। কিন্তু ব্যাকুলতা হয় কি করে?

অনুরাগে। পরম প্রেমভাবে। সে প্রেমভাব কোত্থেকে আসবে? শুধু নামে। নামানন্দে। 'তবে কি জানো? ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কাম-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মাতে তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, মা যাবো। হৃদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করত, পায়রাকে ডাকত, আয় তি-তি, তি-তি! যাই তৃপ্তি হল খেলা, অমনি কান্না ধরল, মা যাবো। কত ভোলাতে চেষ্টা করতুম, সে ভুলত না। খেলা-টেলা আর তার কিছুই ভালো লাগছে না, সন্ধ্যা হয়-হয়, তার এখন মাকে চাই। তাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতুম। এমনিই তো ঈশ্বরের জন্যে কান্না। ছেলে আমার কাছে যাবে না, কিন্তু যেই এক জন অচেনা লোক এসে বললে, চল তোকে তোর মা'র কাছে দিয়ে আসি, অমনি তার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

আসলে যত দিন ভোগান্ত না হয় তত দিনই ভোগান্তি।

তার পর আবার উপাধি আছে না? এদিকে পিলে-রুগী, পরেছে কালোপেড়ে কাপড়, অমনি নিধু বাবুর টপ্পা ধরেছে। রোগা লোকও যদি বুট-জুতো পরে, অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়ে ফুটফাট ইংরিজি কথা বেরোয়। সামান্য একটু আধার হয়েছে, গেরুয়া পরেছে, অমনি অহংকারে ডগমগ। একটু ত্রুটি হলেই ক্রোধ, অভিমান।

টাকা একটা বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আরেক রকম হয়ে যায়, সে আর মানুষ থাকে না। সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে আছে রে তোর হৃদে? এখানে আসা-যাওয়া করত, বাইরে বেশ বিনয়ী, বেশ সরল-কোমল। সেবার কোন্নগর যাচ্ছি, তুই সঙ্গে আছিস। নৌকো থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ বসে আছে গঙ্গার ধারে। বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলছে, কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন? আমি থমকে গেলুম। তার কথার স্বর শুনেই তোকে বললুম, ওরে হৃদে ওর নিঘঘাৎ টাকা হয়েছে, নইলে গলা দিয়ে অমন সুর বেরোয়? তুই হাসতে লাগলি।

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুর: 'যতক্ষণ উপাধি আছে, ততক্ষণ তিনি নেই। উপাধি যতই যাবে ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না, খাল জমিতে জমে। তাই যেখানে অহংকার, সেখানে জমে না তাঁর কৃপাবারি। তাই দীন-হীনের ভাব ভালো, নিঃস্ব-নিষ্কিঞ্চনের ভাব।'

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে!

সেই শ্যামা এসেছেন গদাধরের কাছে। দুধের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছেন। মা গো, কেন এত ছুটোছুটি করিয়ে বেড়াস? তুই যখন হাতের এত কাছে কেন তোকে ছুঁতে দিস না?

বুড়িকে যদি আগে থাকতেই সকলে ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা কেমন করে হয়? খেলা চললেই তো বুড়ির আহ্লাদ। তার মায়াতেই বন্ধ, তার দয়াতেই আবার মুক্ত। সব যে তার ইচ্ছা, তার খেলা। তার যে খুশি এমনি করেই খেলা হোক। একবার মায়ার খেলা, তার পর আবার দয়ার খেলা।

মা যখন আসেন না তখন গদাধরের শরীর থেকে আরেক জন কে বেরিয়ে আসে। অবিকল আরেক জন গদাধর। পবিত্র-পাবক সন্ন্যাসীমূর্তি। তার যে আত্মস্বরূপ, সে। সেই তার সচ্চিদানন্দ গুরু।

যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। তখন নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য। বা, তখন গুরুও নেই শিষ্যও নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই। তাই শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে জনকরাজার কাছে গিয়েছিলেন, জনক-রাজা বললেন, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললেন, আগে জিনিস না পেলে কি করে দক্ষিণা হয়? জনকরাজা হাসতে লাগলেন। বললেন, ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কি আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকবে? তখন কে বা জনক, কে বা শুক, আর কী বা দক্ষিণা! তাই বলি, বাপু দক্ষিণাটি আগে দাও।

একদিন এক শিবমন্দিরে ঢুকে গদাধর 'মহিম্ন স্তোত্র' পড়ছে। পড়তে-পড়তে সেই শ্লোকে এসেছে যেখানে বলেছে শিবমহিমার আর পারাপার নেই। হিমালয় যদি হয় কালির বড়ি, সমুদ্র হয় দোয়াত, কল্পতরুশাখা কলম, সমস্ত পৃথিবী কাগজ আর স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা, তবু সেই কালির দোয়াতে সেই কলম ডুবিয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাগজে অনন্ত কাল ধরে লিখে-লিখেও শিবমহিমার কথা সে লেখিকা শেষ করতে পারবেন না।

পড়তে-পড়তে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। দরদরধারে কাঁদতে লাগল। কথা আর পাঠ সব গুলিয়ে যেতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠল আকুল হয়ে : মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব! শুধু নীরবে অশ্রু-বিসর্জন নয়, একেবারে কান্নার রোল তুলল গদাধর। মুক্তকণ্ঠের কান্না। আন্তরিকতার আর্তনাদ।

মন্দিরের আমলা-ফয়লারা ছুটে এল চার দিক থেকে। ওরে, ছোট ভটচাজ আবার পাগলামি শুরু করেছে। সেই পেটেণ্ট পাগলামি। ভাবলুম বুঝি অন্য রকম কিছু হবে। না রে, আজ কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি। ঐখানে দাঁড়িয়ে আছিস কি, সেজবাবু আছেন আজ ঠাকুরবাড়িতে, পাগলাকে বেঁধে রাখ। নইলে বলা যায় না শেষ কালে হয়তো শিবের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসবে।

টেনে রাখ, হাত ধরে রাখ কেউ—

গোলমাল শুনে স্বয়ং মথুরবাবু এসে উপস্থিত। দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। শিব-ভাবে বিভোর হয়ে আছে গদাধর। উদাসীন আর উপশান্ত। আত্মবিভূতিতে বৈভবময়।

কিন্তু ওরা ওদিকে সবাই গোলমাল করছে কেন?

'বলছি কি, বিগ্রহের থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখুক কেউ। কি অঘটন করে বসে তার ঠিক কি।'

'খবরদার।' গর্জে উঠলেন মথুরবাবু, 'কার ঘাড়ে দুটো মাথা ছোট ভটচাজের গায়ে হাত দেয়!'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সবাই চুপ হয়ে গেল।

মুগ্ধ নেত্রে মথুরবাবু তাঁর গুরুকে দেখতে লাগলেন। দুস্তর ভব-সমুদ্রের নিপুণ কর্ণধারকে।

দেবতার চেয়েও গুরু গরীয়ান্। 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।'

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল গদাধরের। চোখ চেয়ে দেখল এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে—মাঝখানে সেজবাবু।

বেসামাল হয়ে কিছু অঘটন করে ফেলেছে হয়তো। গদাধর শিশুর মত ভয় পেল। বললে সেই শিশুর মত সারল্যে : 'কিছু অন্যায় করে ফেলেছি না কি?'

গদাধরকে প্রণাম করলেন মথুরবাবু। বললেন, 'না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে, তাই সকলে শুনছিলাম।'

আরেক দিন।

তার ঘরের উত্তরের বারান্দায় পায়চারি করছে গদাধর, কাছেই 'বাবুদের কুঠি' বা কাচারি-ঘরে কাজ করছেন মথুরবাবু। গদাধরকে দিব্যি দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে। কাজ করছেন আর একবার তাকাচ্ছেন ওদিকে। গদাধরের সেদিকে লক্ষ্যও নেই। এক বার পশ্চিম থেকে পুবে, আরেক বার পুব থেকে পশ্চিমে টহল দিয়ে ফিরছে। কে তাকে দেখছে বা না-দেখছে তা কে দেখে!

হঠাৎ এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! মথুরবাবু পাগলের মত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসেই গদাধরের পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

গদাধর তো হতবুদ্ধি!

'এ কি, তুমি এ কী করছ! তুমি রানির জামাই, একটা গন্যিমান্যি লোক, তোমায় এমন করতে দেখলে লোকে বলবে কী? ওঠো, ঠাণ্ডা হও—'

আর কি সে কথা শোনেন মথুরবাবু! কান্না কি আর থামে!

বললেন, 'অপরূপ এক দর্শন হল আজ তোমার মধ্যে। পুব থেকে পশ্চিমে আসছ, স্পষ্ট দেখছি, তুমি নও, মন্দিরের মা আসছেন। আবার যেই পিছন ফিরে পুবে যাচ্ছ, দেখছি, সাক্ষাৎ মহাদেব চলেছেন। ভাবলাম বুঝি চোখের ভুল। চোখ মুছে আবার তাকালাম। আবার সেই শিবকালী—আবার—যত বার দেখি তত বার—'

কান্নায় গলে যেতে লাগলেন মথুরবাবু।

'কই বাপু আমি তো কিছু টের পেলুম না। ও সব ধোঁকা—' উড়িয়ে দিতে চাইল গদাধর।

কিন্তু সে-কথা আর কানে নেন না মথুরবাবু। পা ছাড়েন না। তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর জগৎগুরুকে। ভবভয়বৈদ্য সর্বকারণকারণকে।

ভড়কে গেল গদাধর। শেষে এ ব্যাপার কেউ দেখে ফেলে রানির কাছে গিয়ে লাগাক। রানি হয়তো ভাববেন, জামাইকে ছোট ভটচাজ গুন করেছে!

অনেক করে ঠাণ্ডা করল মথুরবাবুকে। আমি কে, আমি কি—মা-ই সব দেখিয়ে দিচ্ছেন তোমাকে। নইলে আমারটা তুমি এত করবে কেন, সর্বস্ব দিয়ে কেন ভালোবাসবে আমাকে?

গদাধরের শখ হল মাকে পাঁয়জোর পরাবে, মথুরবাবু অমনি গড়িয়ে দিলেন পাঁয়জোর। সখীভাবে সাধন করবার সময় স্ত্রীলোকের বেশ ধরবে গদাধর, মথুরবাবু বেনারসী শাড়ি, ওড়না আর এক সুট ডায়মনকাটা গয়না কিনে দিলেন। শুধু তাই নয়, পানিহাটির উৎসবে যাচ্ছে গদাধর, দারোয়ান নিয়ে গুপ্ত ভাবে সঙ্গে চলেছেন মথুরবাবু। ভিড়ে-ভাড়ে গদাধরের না কষ্ট হয় সেই তদারকে।

ভৃত্য, ভক্ত আর ভাণ্ডারী। মথুরবাবু এক আধারে ত্রিমূর্তি।

বললেন, 'আমার ঠিকুজির কথা ফলল এত দিনে।'

'কি আছে তোমার ঠিকুজিতে?'

'আমার ইষ্টের এত কৃপা থাকবে আমার উপর যে, সে শরীর ধারণ করে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরবে। তুমিই আমার সেই ইষ্ট, আমার অভিলষিত—আমার পরম প্রার্থনার চরম পুরস্কার।'

তুমি কৃপানিধি।

তুমি আগে মায়া, পরে দয়া। আগে মায়ারূপে এসে মনোহরণ কর, পরে দয়ারূপে এসে কর মায়ামোচন। মায়ার পারে এসে তোমার দয়ার জন্যে বসে আছি।

১৯

'পদ্ম সই দিলে না?' রানি রাসমণি কাতর চোখে তাকালেন চার দিকে : 'কেন এমন হল?'

শেষ শয্যায় শুয়েছেন রাসমণি। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

এত বড় কীর্তি করে গেলেন জীবনে, তবু মৃত্যুতে নেই কেন শান্তি? দেবীসেবার জন্যে দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকায় তিন লাট জমিদারি কিনেছেন কিন্তু এখনো দেবোত্তর করেননি সম্পত্তি।

চার মেয়ের মধ্যে দু'জন শুধু এখন বেঁচে আছে। প্রথমা পদ্মমণি আর সব চেয়ে ছোট জগদম্বা। দেবতার নামে দানপত্র সম্পাদন করেছেন রানি, সেই সঙ্গে মেয়েরাও একটা একরারনামা দস্তখৎ করে দিক, ঐ সম্পত্তিতে তাদের কোনো

দাবি-দাওয়া নেই। জগদম্বা সই করে দিল একবাক্যে। কিন্তু কলম স্পর্শ করল না পদ্মমণি।

সেই ভেবে রানি বড় অসুখী। মা গো, তোর খেলা তুই জানিস। তোর মনে কি আছে যার জন্যে পদ্মমণির মনে এই নেওয়ালি!

আঠারো শো একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি দানপত্রে সই করলেন রাসমণি। আর তার পরের দিনই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। সময় আসন্ন হয়ে এলে আদি গঙ্গার পারে তাঁকে নিয়ে আসা হল। অনেকগুলি আলো জ্বলছিল সামনে। হঠাৎ রাসমণি চেঁচিয়ে উঠলেন : 'সরিয়ে দে, নিবিয়ে দে ও সব রোশনাই। অন্ধকার করে দে। এখন আমার মা এসেছেন, তাঁর অঙ্গের আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে!'

রাত্রি দ্বিতীয় যাম। রানি সহসা আকুল হয়ে উঠলেন : 'এসেছিস মা? নে, টেনে নে কোলের কাছে। কিন্তু শেষ কথাটা তোকে বলি—পদ্ম যে সই দিলে না!'

মা হাসলেন। তাতে তোর কি। হয়তো ঢের মামলা-মোকদ্দমা হবে তোর দৌহিত্রদের মধ্যে, হয়তো দেবোত্তর সম্পত্তি তছনছ হয়ে যাবে। তার জন্যে তোর ভাবনা কেন? যা থাকবার নয় তা যাক না। তুই থাকবি আর তোর গদাধর থাকবে।

'এ আমার কি স্বভাব হলো বলো দেখি।' গদাধর বললে গিয়ে হলধারীকে : 'জপ করতে বসে কেউ অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি তাকে এক চড় মেরে বসি। সেই কালী-ঘরে রাসমণিকে এক চড় মেরেছিলাম, আজ আবার বরানগরের ঘাটে জয় মুখুজ্জেকে দুই চড় মেরে বসেছি। ঠাট করে জপ করতে বসেছেন, কিন্তু মন রয়েছে অন্য দিকে।'

তুই উন্মাদ। বললে হলধারী।

তাই হবে। তাই হক কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। কাউকে মানি না। বড়লোককে কেয়ার করি না কানাকড়ি।

দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন। ঠাকুরও গিয়েছেন সেখানে। যতীন্দ্র বললেন, 'আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন তো আমরা কোন ছার।'

করেছিলেন তো করেছিলেন। কথা শুনে ঠাকুরের রাগ হল। বললেন, যুধিষ্ঠির বুঝতে শুধু ঐ নরকদর্শনটুকুই মনে করে রেখেছ? তার সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, বৈরাগ্য—তার কৃষ্ণভক্তি এ সমস্ত ভুলে যাবে? আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলেন ঠাকুর, হৃদয়ের বড়লোককে বড় ভয়, তাড়াতাড়ি ঠাকুরের মুখ চেপে ধরল।

আর, যতীন্দ্র করলেন কি?

যতীন্দ্র বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে।' বলে সরে পড়লেন।

আরেক দিন গিয়েছিলেন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। তাঁকে দেখেই বললেন, 'দেখ বাপু, তোমাকে কিন্তু রাজা-টাজা বলতে পারব না। তুমি যা নও তাই তোমাকে বলি কি করে?'

রজোগুণী লোক সৌরীন্দ্র, রাজা না বলাতে ষোলো আনা খুশি হলেন না হয়তো। একা-একা কি আলাপ করবেন, যতীন্দ্রকে খবর পাঠালেন। যতীন্দ্র বলে পাঠালেন, 'আমার গলা-ব্যথা হয়েছে, যেতে পারব না।'

তুমি উন্মাদ। বললে কৃষ্ণকিশোর। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর। সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম। উন্মাদ নও তো পৈতে-ধুতি উড়িয়ে দিলে কেন?

ঠাকুর বললেন, 'তোমার একবার উন্মাদ হয় তা হলে বোঝ।'

হলও তাই। কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ হল। একা এক ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর কেবল ওঁ-ওঁ করে। সকলে বললে, মাথা খারাপ হয়েছে, কবরেজ ডাকো। কবরেজ এল নাটাগড় থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে, 'আমার রোগ আরাম করো আপত্তি নেই, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।'

নদীয়ায় ন্যায় পড়তে এসেছিল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাড়ি রাজপুতানায়, গুরুগৃহে পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছে। জয়পুরের মহারাজা বড় চাকরিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। জ্ঞানের মতন আনন্দ নেই। শাস্ত্র-দর্শন সব তিনি মন্থন করে দেখবেন কোথায় সেই বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মের ঠিকানা। কিন্তু বই পড়ে মন ভরল না নারায়ণ শাস্ত্রীর। অস্তি—তিনি আছেন, শুধু এইটুকুই বলা যায়, তার বেশি আর উপলব্ধি হয় না। 'অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।'

শুনলেন দক্ষিণেশ্বরে সেই উপলব্ধির অব্ধি বিরাজমান। ছুটলেন সেখানে। বুঝলেন আহারের চেয়ে আস্বাদ বড় জিনিস। ঠিকানা জানার চেয়ে একখানা চিঠি পাওয়ার বেশি দাম।

কিন্তু এসে দেখলেন কি? গদাধর বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে। কাঙালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতা চাটছে, মাথায় ঠেকাচ্ছে। কোথাকার কে নিচু জাতের স্ত্রীলোক, খাচ্ছে তার হাতের শাকান্ন।

সবাই বলছে, উন্মাদ। কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রী দেখল, জ্ঞানোন্মাদ। পরে দেখল, শুধু জেনে উন্মাদ নয় পেয়ে উন্মাদ।

কিন্তু হলধারী এল মুখসাট মেরে: 'তুই এ-সব করছিস কি? কাঙালীদের এঁটো খাচ্ছিস তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?'

কথা শুনে ক্ষেপে গেল গদাধর: 'তবে রে শালা, তুমি না গীতা-বেদান্ত পড়ো? তুমি না শেখাও জগৎ মিথ্যে ব্রহ্ম সত্য আর সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি? ভেবেছ আমি জগৎ মিথ্যে বলব আর ছেলেপুলের বাপ হব? তোর শাস্ত্রপাঠের মুখে আগুন!'

কি হবে শাস্ত্র পাঠে? ভাবল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাজনার বোল মুখস্থ বলা সোজা, হাতে আনাই দুষ্কর।

রানির মারা যাবার পর সম্পত্তির এক্সিকিউটর হলেন মথুরবাবু। এক দিন গদাধরকে বললেন, 'তোমার নামে কিছু জমি-জায়গা লিখে দি, কি বলো?'

গদাধর রেগে টং। কি, আমাকে তোমার বিষয়ী করবার মতলব? আমিও কি কলাইয়ের ডালের খদ্দের?

ভগবানের আনন্দের কাছে আর কিছু আনন্দ আছে? ভগবানের স্বাদ পেলে সংসার আলুনি লাগে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না।
এ আনন্দ কি বলে বোঝানো যায়? বিয়ের পর অনেক দিন বাদে মেয়ের কাছে তার স্বামী এসেছে। রাত্রিশেষে সখীরা ঘিরে ধরল মেয়েকে। হ্যাঁ লো, কেমন আনন্দ করলি কাল? মেয়েটি বললে, কি করে বোঝাই বল। সে বলে বোঝানো যায় না। যখন তোদের স্বামী আসবে তখনই বুঝতে পারবি, তার আগে নয়।
তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে চাতকের! সাত সমুদ্র তেরো নদী খাল-বিল পুকুর-দিঘি সব জলে ভরপুর। অথচ সে-জল সে খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু না। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্যে হাঁ করে আছে। 'বিনা স্বাতী কি জল সব ধুর'।
মিছরির পানা যে খেয়েছে সে কি আর চিটে গুড়ের পানা খাবে?
'কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই—' ত্রৈলোক্য সান্যাল বললেন, 'সঞ্চয়ও দরকার। পাঁচটা দান-ধ্যান—'
'রাখো। কত তোমাদের দান-ধ্যান! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দু'টি চাল দিতে কষ্ট হয়—দিতে-থুতে অনেক হিসেব! খেতে পাচ্ছে না—তা আর কি হবে! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। এদিকে মুখে বলে, সর্বজীবে দয়া!'
আগে ঈশ্বর লাভ করো, পরে সংসারে থাকো। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তখন 'কলঙ্কসাগরে ভাসি, কলঙ্ক না লাগে গায়।'
এই দেখ না জয়গোপাল সেনকে। বিস্তর টাকা, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না।
'গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, হাসপাতাল ফেরত দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দুটো পচা ডালিম!'
এই তো টাকার কেরামতি!
মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর কাশীতে তীর্থ করতে এসেছেন, উঠেছেন রাজাবাবুর বাড়িতে। সেখানেও সর্বক্ষণ বিষয়-আশয়ের কথাবার্তা। ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন : 'মা, এ কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরেই খুব ভালো ছিলাম। সেখানে বিষয়ের কথা শুনতে হয়নি।'
ছাদের উপর ঠাকুর-ঘর, নারায়ণ পুজো হচ্ছে। বাড়ির গিন্নি-বান্নিরা চন্দন ঘষছে, নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, করছে নানান রকম আয়োজন। কিন্তু মুখে একটিও ঈশ্বরের কথা নেই। কি রাঁধতে হবে, আজ বাজারে কিছু ভালো পেলে না, কাল অমুক রান্নাটি বেশ হয়েছিল—এই সব কথাবার্তা।
মথুরবাবু কথা ফিরিয়ে নিলেন। কত লোক তাঁকে আশ্রয় করে ফিরিয়ে নিল অবস্থা। আর এ এমন এক গুণী-গুরু যে তাঁরই অবস্থান্তর ঘটালেন।
'বাবা, তোমার জন্যে এই শাল এনেছি দেখ।'
হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছেন মথুরবাবু। গদাধরের গায়ে নিজেই পরিয়ে দিলেন আদর করে।

শাল গায়ে দিয়ে শিশুর মত সরল আনন্দে নেচে উঠল গদাধর। ডেকে দেখাতে লাগল সকলকে। ওরে শুনেছিস হাজার টাকা দাম!

পরক্ষণেই অন্য চিন্তা মনে এল। এই শালের মধ্যে আছে কি? কতগুলো ছাগলের লোম বই কিছু নয়। তারই এত চটকদারি! শীত ঠেকাতে সামান্য একখানা কম্বলই তো যথেষ্ট। বলি, এই শালে ঈশ্বরস্পর্শ পাওয়া যাবে? বরং বিকার বাড়বে, মনে হবে আমি এক জন মস্ত এলেমবাজ। আর সকলের চেয়ে বড়, এক জন কেষ্ট-বিষ্টু। আর জানো না, বিকার হলে কি বলে? বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো। বদ্যি বলে, বেশ তো খাবি, নিশ্চয় খাবি। বলে বদ্যি নিজে তামাক খায়। বিকারের পর কি বলবে তারি জন্যে অপেক্ষা করে।

হঠাৎ গা থেকে শালখানি খুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল গদাধর। থুতু ফেলতে লাগল তার উপর, পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘষতে লাগল ধুলোয়। তাতেও ক্ষান্তি নেই, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব এই জঞ্জাল।

কে এক জন ছুটে এসে উদ্ধার করলে শালখানি। জানালে গিয়ে মথুরবাবুকে।

মথুরবাবু বললেন, 'বেশ করেছে। ঠিক করেছে। যেমনটি চেয়েছিলাম তাই করেছে।'

এ চমৎকার পরিহাস ঈশ্বরের। গদাধরকে কয়েক দিনের জন্যে নিজের কাছে জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন মথুরবাবু। সোনার থালায় করে ভাত খেতে দেন, রুপোর বাটিতে করে পঞ্চ ব্যঞ্জন। যে খাচ্ছে তার কিন্তু থালা-বাটির দিকে নজরও নেই, খাওয়া শেষ হলে চেয়েও দেখে না এঁটো বাসনের কি হল। মথুরবাবুরই যত গরজ। দেখ, ঠিকমত মাজা-ঘষা হল কি না, ভাঙা-ফুটো হল কি না, চোরে নিয়ে গেল না কি চুরি করে! তাঁরই যত হাঙগামা পোয়ানো। আর যে ভোজন করে গেল তার কাছে সব কিছুই একটা অসার ভোজবাজি।

চন্দ্র হালদার মথুরবাবুদের কুল-পুরোহিত। আছে বাবুদের আশ্রয়ে কিন্তু গদাধরের প্রাধান্য দেখে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। কী কৌশলে যে বাবুকে হাত করল তাই বুঝে উঠতে পারছে না। কোথাকার কে বিদেশী, তার কিনা এত প্রতাপ! যাই বলো, আর আস্কারা দেওয়া চলে না। একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। বাইরের ঘরে একা বেহুঁস হয়ে বসে আছে গদাধর, চন্দ্র হালদার কাছে গিয়ে তার গায়ে ঠেলা মারতে লাগল : 'ও বামুন, বল্ না বাবুকে কি করে বশে আনলি?'

গদাধর নিঃসাড়।

'আহা, ঢং দেখ না! ঝিমুচ্ছে বসে-বসে! বল্ না সত্যি করে, কি করে বাগালি বাবুকে?'

গদাধর নিঃসংজ্ঞ।

'উঃ, খুব ফুটুনি হয়েছে!' বলেই গদাধরকে সে লাথি মারলে। একবার নয়, তিন-তিনবার।

গদাধর চোখও মেলল না।

পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তারও চেয়ে বড়। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিন ভুবন আবৃত করেছেন।

সাধুর হৃদয়ের মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। আর সেই পদচ্ছায়ে অনন্ত সহ্যশক্তি!
সহ্য করে গেল গদাধর। মথুরবাবুকে বললে চন্দ্র হালদার আর আস্ত থাকত না।
ঠাকুর তাই বলতেন হৃদয়কে : 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো—তবে হবে। তা না হলে তখন খাজাঞ্চীকে ডাকো।'
যে সয় সেই রয়। যাকে রাখো সেই রাখে।

২০

বকুলতলার ঘাটে এসে নৌকো লাগল। সকাল বেলা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদাধর ফুল তুলছে। সহসা চোখ পড়ল ঘাটের দিকে। কে এল নৌকোয়?
আশ্চর্য, স্ত্রীলোক! কিন্তু এ কী তার অদ্ভুত বেশবাস! পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, ঘাড়ে-পিঠে অসম্বদ্ধ চুল—এ যে সন্ন্যাসিনী! এ এখানে এল কি করে? এখানে তার কি কাজ? কে তাকে পথ দেখাল?
তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল গদাধর। ডাকলে হৃদয়কে। ওরে, দ্যাখ্ গিয়ে, ঘাটে এক ভৈরবী এসেছে। কি তার গায়ের রঙ, কি তার চোখের ছটা! কি তার ভঙ্গির তেজ! চাঁদনিতে রয়েছে। যা, তাকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় এখানে।
হৃদয় তো অবাক। সে এখানে আসবে কেন? তুমি ডাকলে তার কি?
'তুই যা না। গিয়ে বল আমি এখানে আছি। তা হলেই সে আসবে।'
তাই গেল হৃদয়। গিয়ে দেখল, ঘাটের চাঁদনিতে ভৈরবী বসে আছে চুপচাপ। যেন বা তারই সংবাদের প্রতীক্ষায়। বললে তার মামার কথা। মামা যেতে বলেছে তাকে।
হৃদয় তো অবাক! এক বাক্যে উঠে পড়ল ভৈরবী। বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করলে।
চলে এল গদাধরের ঘরের দরজায়। গদাধরকে দেখেই আনন্দে আর বিস্ময়ে কেঁদে ফেলল। বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে : 'বাবা, তুমি এখানে? শুধু এইটুকু জেনেছি তুমি গঙ্গাতীরে আছ। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এত দিনে দেখা পেলাম।'
বছর চল্লিশ বয়েস হবে ভৈরবীর—অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল গদাধর। বললে, 'আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, মা? কিন্তু আমার কথা তুমি জানলে কি করে?'
'মা মহামায়া জানিয়ে দিলেন। বললেন, এই তিন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।'
'তিন জন?'

'হ্যাঁ, আর দু'জনের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলায় দেখা হয়েছে। বাকি তোমাকেই এত দিন খুঁজছিলাম।'

গৃহহারা শিশু যেন মাকে ফিরে পেয়েছে এমনি আগ্রহে গদাধর আঁকড়ে ধরল ভৈরবীকে। কত দিনের কত সুখ-দুঃখের কথা বলতে বাকি। মা গো, সব বলি তোকে বসে-বসে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, অলৌকিক কত কি দেখি-শুনি, সমস্ত গা জ্বলে-পুড়ে যায়, চোখের পাতা এক করতে পারি না। সবাই বলে পাগল হয়ে গেছি। তাই কি সত্যি? রাত-দিন মাকে ডেকে-ডেকে শেষে পাগল হয়ে গেলাম? মাকে ডাকার এই পরিণাম?

'কে তোমাকে পাগল বলে?' ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে অমৃত-আশ্বাস ঝরে পড়ল : 'একে বলে, মহাভাব। এ ভাব চেনে এখানে এমন কারু সাধ্যি নেই। তাই যেমন সব পণ্ডিত তেমনি সব ভাষ্য।'

'মহাভাব!' গদাধরের দুই উন্নিদ্র চক্ষু জ্বলজ্বল করে উঠল।

'হ্যাঁ, এই ভাব হয়েছিল রাধারানির, এই ভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। ভক্তিশাস্ত্রে এ সব লেখা আছে। আমি পড়ে সব দেখিয়ে দেব তোমাকে। মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখিয়ে দেব।'

ভৈরবী তার ঝুলি ঘাঁটতে লাগল। ঝুলিতে খান কয়েক পুঁথি আর দু'-একখানা কাপড়। জীবনের পথবাহনের যা-কিছু সম্বল।

দেবীর কিছু প্রসাদ খাও মা। কিছু মাখন আর মিছরি ভৈরবীকে নিবেদন করল গদাধর। কিন্তু ছেলে না খেলে কি মা আগে খায় কখনো? গদাধর তাই মুখে দিল খানিকটা। তবেই ভৈরবী জলযোগ করলে।

কিন্তু কে মা তুমি সংসারত্যাগিনী? কেন তোমার এই সন্ন্যাসসজ্জা?

কেউ কিছুই জানে না—আমিও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, যশোর জেলায় আমার বাড়ি আর ব্রাহ্মণের ঘরে আমার জন্ম। যদি কিছু নাম দিতে চাও, বলো, যোগেশ্বরী। এই যোগে বসেই জানতে পেলাম তিন জনকে সাধনায় সাহায্য করতে হবে। প্রথম দু'জনের নাম হচ্ছে চন্দ্র আর গিরিজা—দুয়ের বাড়িই বরিশালে। আর তৃতীয় জন তুমি। চন্দ্র আর গিরিজাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এসেছি, এবার তোমার পালা।

ওরা কী শিখল?

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। ওদের নিয়ে আসব দক্ষিণেশ্বরে। তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। আমার তিন শিষ্য একত্র হবে।

মন্দির ঘুরে সব দর্শন করলে যোগেশ্বরী। গলায় ঝুলছে যে রঘুবীর শিলা, এখন তার ভোগের যোগাড় দেখতে হয়। সিধে এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। তাই নিয়ে সে পঞ্চবটীতে রাঁধতে গেল।

মহাভাব! মহাভাব কাকে বলে?

যেমন শ্রীমতীর হত। এক সখী ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত, ওরে এখন কৃষ্ণ-বিলাসের অঙ্গ, ছুঁসনি—এঁর দেহের মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন। মহাভাব

ঈশ্বরের ভাব—দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা মস্ত হাতি নাড়াকুচির কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকছে। ঘর চুরমার। ঈশ্বরের বিরহ-আগুন প্রলয়ের আগুনের মত। সে কি সামান্য? রূপ-সনাতন যে গাছের তলায় বসতেন, সে গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত।

'এই অবস্থায় তিন দিন ঠায় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।' বললেন এক দিন ঠাকুর : 'অনড় হয়ে পড়েছিলাম এক জায়গায়। হুঁস হলে বামনি আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে হাত ঠেকাবার কি জো আছে! গা মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে। সেই চাদরের উপর দিয়ে ধরলে আমাকে। ধরে নিয়ে গেল গঙ্গায়। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল—'

শ্রীমা বলতেন, 'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত, মনে হত বুকের ভিতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে।' বলতে-বলতে ভাবারূঢ় হতেন : 'আহা, সে কী গায়ের রঙ! সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে থাকত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে! যখনই কালী-বাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে পড়ত, বলত, ঐ তিনি যাচ্ছেন। বেশ মোটাসোটা ছিলেন। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থসথস করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, রূপের সে কি ঢেউই উঠত! বেড়ার ফাঁকে দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখতুম। মথুরবাবু একখানা পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলোত না—ছাপিয়ে পড়তেন—'

'আমাকে তিনি কি বলতেন জানো?' বললেন এক দিন শ্রীমা : 'বলতেন, তাঁর দেহ দেখিয়ে বলতেন, আমার এই দেহটি গয়া থেকে এসেছে। তাই তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে তিনি বললেন, তুমি গিয়ে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস। সে কি কথা? পুত্র বর্তমান থাকতে আমি পিণ্ড দেব কি! হবে গো হবে, তুমি দিলেই হবে। বললেন তিনি, আমার কি আর ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো? চমকে উঠলুম। কাজ নেই তবে গিয়ে। আমিই যাব। বুড়ো গোপালকে নিয়ে পরে আমিই গিয়েছিলুম গয়ায়।'

রান্না করে রঘুবীরের সামনে ভোগ্য-ব্যঞ্জন রেখে ধ্যানে বসেছে ভৈরবী। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে, গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দবৃষ্টি। ধ্যানে দেখছে, স্বয়ং রঘুবীর যেন খাচ্ছে সেই তার নিবেদনের অন্ন। আহা, খাক তৃপ্তি করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে।

জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে নিজেই আনন্দে আত্মহারা। যে খাচ্ছে এ ভাত সে গদাধর। অনাহূত কখন চলে এসেছে পঞ্চবটীতে। চলে এসেছে অদৃশ্য কোন প্রাণের টানে। অদৃশ্য কোন নিমন্ত্রণের সংবাদে।

ভৈরবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জ্ঞানভূমিতে নেমে এল গদাধর। অপ্রস্তুতের মত বললে, 'কখন কি যে গোলমাল হয়ে যায়, যত সব আজব কাণ্ড করে বসি।'

ভৈরবীর মুখে প্রশান্ত অভয়। বললে, 'বেশ করেছ, প্রাণ যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি করেছ। ধ্যানে যা দেখেছি তাই প্রত্যক্ষ করলাম চোখ মেলে। আমার আর

বাইরের পুজোয় দরকার নেই, আমি পেয়ে গেছি আমার রঘুবীরকে।' বলে সে খেতে লাগল সেই উচ্ছিষ্টান্ন। তার দেবতার প্রসাদ।

খাওয়ার শেষে এল গঙ্গাতীরে। কী হবে আর শিলামূর্তিতে। পেয়ে গেছি প্রাণ-স্বরূপকে। এত দিন গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল যে শিলাখণ্ড, নিমেষে তা ফেলে দিলে গঙ্গায়।

মাকে বলত গদাধর : মা আমাকে দেখিয়ে দে, শিখিয়ে দে। তোর ছেলে হয়ে আমি কি আকাট হয়ে থাকব?

তাকে শেখাবার জন্যেই মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ভৈরবীকে, তাঁর জ্ঞানবতী যোগেশ্বরী মেয়েকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বিধিবেত্তা, বহুদর্শিনী ভৈরবী। পুত্রবৎ পড়াতে লাগল গদাধরকে। কাকে বলে দিব্য-দর্শন, কাকেই বা বলে দিব্যোন্মাদনা, বইয়ের লিখনের সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল। বহু জিজ্ঞাসার সমাধান হল গদাধরের, হল বহু সংশয়ছেদন। পঞ্চবটীতে বইতে লাগল দিব্যানন্দের ঢেউ। 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।'

দিন সাতেক কেটে গেল অলৌকিক ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু বাইরের সংসার এ ঘনিষ্ঠতাকে কি চোখে দেখছে কে জানে। হয়তো বা ভৈরবীর নামে অন্যায় কিছু রটনা করে বসবে। তাই গদাধর ভৈরবীকে বললে, গাঁয়ের মধ্যে তুমি কোথাও একটু দূরে সরে থাকো না—

ঠিক বলেছ। তবে কোথায় কে জায়গা দেয় কে জানে। তবে যেখানেই থাকি রোজ আসব আমি গোপালকে ননী খাওয়াতে। গোপালকে না দেখে যে আমার সূর্য-চন্দ্র উদয় হবে না।

খানিক দূরে উত্তরে দেবমণ্ডলের ঘাটে বামনি থাকবার আশ্রয় পেল। মণ্ডলরাই সাদরে জায়গা করে দিলে তার। চাঁদনিতে তক্তপোশ পেতে দিব্যি থাকো তোমার খুশি-মত।

গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে দু'দিনেই সকলের মন টেনে নিলে ভৈরবী। যেই কাছে আসে সেই মনে-মনে হাত জোড় করে। মুখে-মুখে মধুরতার রসদ জোগায়। এ বলে আমার থেকে সিধে নাও, ও বলে আমার বাড়িতে এসে থাকো। কারুর সাহস নেই দুর্নামের কাদা ছোঁড়ে।

গোপাল! গোপাল! ননী হাতে করে বসে-বসে কাঁদছে বামনি।

প্রায় দু'-মাইল দূর। সে কান্না কালীবাড়িতে গদাধরের কানে এসে লাগে। মা খাবার খেতে ডাকছে শুনে ছেলে যেমন ছোটে তেমনি হঠাৎ ছুট দেয় গদাধর। দু'-মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে পার হয়ে যায়। দম না নিয়েই বামনির হাতের থেকে ননী তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে।

কোনো-কোনো দিন পোশাক বদলায় ভৈরবী। গাঁয়ের মেয়েদের থেকে শাড়ি-গয়না চেয়ে নিয়ে সাজগোজ করে। ওদেরই সাহায্যে তৈরি করে নানা ভক্ষ্যভোগ্য। থালায় করে সাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে চলে আসে কালীবাড়ি। নিজের হাতে খাওয়ায়

গদাধরকে, তার গোপালকে। বলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব। গদাধরের মনে হয় এ যেন সেই নন্দরাণী যশোদা। বাৎসল্যরসের সুরধুনী।

শুধু জননী নয়, জগৎগুরু। বলে, একে-একে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখাব তোমাকে। মা'র আদেশ। মা'র আশীর্বাদ।

গদাধরের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

ঠাকুরের ধর্মজীবনের প্রথম গুরু নারী। যে নারী মাতৃত্বময়ী মঙ্গলস্বরূপিণী।

২১

এ সব কী দেখছে ভৈরবী?

ভগবানের কথা বলতে গেলেই ভাববিভোর হয়ে যায়। কীর্তনে গলে পড়ে, ঢলে পড়ে। ধ্যানে বসলেই সমাধিস্থ। এ সব সেই চৈতন্যদেবের লক্ষণ। সেই জ্ঞান সেই ভক্তি সেই তীব্র বৈরাগ্য। চৈতন্যদেবের জিভে সার্বভৌম চিনি ঢেলে দিলে, চিনি ভিজলই না, ফরফর করে উড়ে গেল হাওয়ায়। তেমনি বহ্নিময় সন্ন্যাস। প্রজ্বলন্ত অনাসক্তি। যাকে ছুঁচ্ছে তাকেই ঈশ্বরভাবিত করে দিচ্ছে। যাকে ধরছে তাকেই নাচিয়ে ছাড়ছে। এমন প্রিয় যে নিজের দেহ, তাই ভুল করে ফেলছে। শুধু ভুল কি, শরীরের বোধই নেই এক বিন্দু। চেতনার চিহ্ন নেই এক কণা।

এ সবই চৈতন্যদেবের হয়েছিল। যাকে বলে প্রেমোন্মাদ। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নেই। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন, শরীর সেই মাটির চেয়েও তুচ্ছ। বন দেখে ভাবলেন বৃন্দাবন, সমুদ্র দেখে যমুনা। যেমন গোপিনীদের হয়েছিল। রাসমণ্ডলের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, গোপিনীরা উন্মাদিনী হয়ে উঠল। গাছ দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছন্ন মাটিকে দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছ কেন? আবার মঞ্জরিত মাধবীকে দেখে বললে, ও মাধবী, আমার মাধবকে এনে দে। সেই প্রেমোন্মাদ। প্রেমে হাসে প্রেমে কাঁদে প্রেমে নাচে প্রেমে গায়। সেই 'চিদানন্দ সিন্ধুতীরে প্রেমানন্দের লহরী'।

চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে পড়েছে ভৈরবী, মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। দুঃখ ও অজ্ঞান থেকে জীবোদ্ধার করবার জন্যে অবতীর্ণ হবেন পৃথিবীতে। সন্দেহ নেই, ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। তিনিই এসেছেন।

'মা গো, বুক-পিঠ জ্বলে যাচ্ছে। কত চিকিৎসা করালাম, কিছুতেই কিছু হল না।' ভৈরবীকে বললে গদাধর। 'কি করি বলতে পারো? কিসে যাবে এই জ্বালা-পোড়া?'
সূর্যোদয়ে শুরু হয়, বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে। দুঃসহতম হয় দুপুরে। মাথায় গামছা দিয়ে গদাধর তখন গঙ্গায় ডুবে থাকে। রোজ তিন-চার ঘণ্টা। তবু জ্বালার উপশম হয় না। আরো বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে সাহস হয় না, পাছে অন্য কোনো অসুখ হয়। মর্মরের মেঝে ভিজে গামছা দিয়ে মুছে-মুছে ঠাণ্ডা করে। তার পর তার উপর পড়ে থাকে। তবু নিবৃত্তি নেই।
'কিসে যাবে এই দেহের দাহ? কিছু বলতে পারো?'
'পারি।' প্রসন্নচোখে তাকাল ভৈরবী।
এমন কথা শুনতে পাবে গদাধর যেন ভাবতেও পারত না। বিস্ময়ে চমকে উঠল। 'কিসে? কী সেই প্রতিষেধ?'
ভেবেছিল, কি না-জানি কঠিন ক্লেশসাধনা করতে হবে। ভৈরবী নির্মল বয়ানে হাসল। বললে, 'প্রতিষেধ অত্যন্ত সোজা। শাস্ত্রেই তার উল্লেখ আছে।'
কি? কি? সবাই ঘিরে ধরল ভৈরবীকে।
শুধু চন্দনে গা চর্চিত করো। আর গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা পরো একটি। সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে।
উড়িয়ে দিলেই তো আর উড়ে যায় না। এমনি দাহ শ্রীরাধিকার হয়েছিল। আর যদি প্রত্যক্ষ ইতিহাস চাও, এমনি দাহ হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের। এ দাহ চর্মদাহ নয়, এ মর্মদাহ। এ ঈশ্বরবিরহের যন্ত্রণা।
মথুরবাবু বললেন, 'দেখা যাক না এর চিকিৎসাটা।'
সুবাসিত ফুলের মালা পরল গদাধর। সারা গায়ে চন্দন মাখল।
ভালো হয়ে গেল তিন দিনে। গদাধরের গায়ের জ্বালা শীতল হয়ে গেল। পরীক্ষায় সিদ্ধকাম হল ভৈরবী। ঐ দেহে কে বাস করছে—সন্দেহের আর অবকাশ রইল না সিদ্ধান্তে। তার পর গদাধর যখন বললে সেই শিওড়ে যাবার সময়কার ভাবদর্শনের কথা, কেমন দু'টি ছেলে তার গা থেকে বেরিয়ে এসে ছুটোছুটি করে খেলা করছিল মাঠে-মাঠে, তখন ভৈরবীর সিদ্ধান্তে আরো পাকা হল। ভৈরবী ঘোষণা করলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব।
তুমি সামান্য মানুষ নও। নও বা তুমি শুধু সম্পূর্ণ মানুষ। নও বা তুমি শুধু অতিমানুষ যে উপলব্ধির উচ্চতম চূড়ায় এসে উঠেছে। তুমি অবতার। তুমিই তিনি। অনন্ত ঈশ্বর তোমার মাঝে অন্তবান হয়েছেন। তোমার মূর্তিতে প্রতিমূর্ত হয়েছেন। তোমার মা যা তুমিই তা। তোমার কায়ায় বাসা বেঁধেছেন মহামায়া। তুমি আবির্ভূত দেবতা। তুমি প্রতিভাত ব্রহ্ম। তারণ করতে তোমার অবতরণ।
এক দিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করল ভৈরবী।
কিন্তু মথুরবাবু মানতে চান না। কি করে মানবেন? খবরের কাগজে লেখেনি যে। এক জন তার বন্ধুকে বললে, কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা

বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বন্ধু বললে, দাঁড়াও, আগে খবরের কাগজখানা দেখি। খবরের কাগজ খুলে দেখল বাড়ি পড়ার কথা কিছু লেখা নেই। কি বলছ হে, খবরের কাগজে তো কিছু নেই। খবরের কাগজে যখন নেই তখন তোমার কথা বিশ্বাস করি কি করে? তুমি দেখবে চলো সেই ভাঙা বাড়ি। ভাঙা বাড়ি তো দেখব কিন্তু হুড়মুড় করে যে পড়েছে তার প্রমাণ কি?

ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করছেন এ তো ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব নয়, ভক্তির তত্ত্ব। অবতার তো জ্ঞানীর জন্যে নয়, ভক্তের জন্যে। নইলে চৌদ্দ পোয়ার মধ্যে অনন্ত এসেছেন এ কি সহজে বিশ্বাস করবার? নরলীলায় ভগবান যদি মানুষ হয়েছেন তো একেবারে ঠিক-ঠিক মানুষ হয়েছেন। এতটুকু ভুলচুক নেই, নেই এতটুকু এদিক-ওদিক। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নিখুঁত মানুষ। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক—কখনো বা ভয়, সব ঠিক মানুষের মত। কি করে তাকে চিনতে পারে অবতার বলে? রামচন্দ্র সীতার শোকে অস্থির হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে পড়ল তখনও তাঁর কাতরতার অন্ত নেই। মানুষ হয়ে তেমনিই যদি তিনি হাসেন-কাঁদেন, খান-দান, রোগে-কষ্টে জর্জর হন, তবে তাঁকে তুমি চেনো কি করে? মনে হবে এ তো মামুলি মানুষই, নারায়ণ কোথায়? বহুরূপী সাধু সেজে এসেছে, ত্যাগী সাধু। সাজ একেবারে নিখুঁত। সাজ দেখে বাবুরা খুব খুশি। যেই একটি টাকা দিতে চেয়েছে, উঁহু করে হাত গুটিয়ে চলে গেল। ত্যাগী সাধু টাকা নেয় কি করে? তার পরে সাজ খুলে যখন সে সহজ হয়ে এল, বললে, টাকা দাও। তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ সেজে আসেন, তখন হুবহু মানুষের মতই আচরণ করেন।

দেহটি আবরণ, ঘেরাটোপ, কিন্তু চেয়ে দেখ, লণ্ঠনের ভিতরে আলো জ্বলছে।

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বললেন মথুরবাবু, 'শাস্ত্রে আছে বিষ্ণুর দশাবতার। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ আর কল্কি। এই দশের বাইরে আর অবতার নেই। অনুভাগবতে যে কল্কির কথা লেখে সে তো বাবা তুমি নও।'

'তার আমি কি জানি!' গদাধর সরলতার প্রতিমূর্তি। বললে, 'তবে বামনি বলছে—'

'কে বামনি?'

'তাকে তুমি এখনো দেখনি বুঝি?' কথাটা সংক্ষেপে সারল গদাধর। বললে, 'সর্বশাস্ত্রে বিদুষী। ঝোলার মধ্যে এক রাশ পুঁথি। সে পুঁথি দেখে মিলিয়ে-মিলিয়ে বলে আমার দেহে আর মনে না কি অবতারের চিহ্ন। কী যে বলে তা কে জানে।'

বিশেষ আমোল দিলেন না মথুরবাবু। বললেন, 'অবতারতত্ত্বের সে জানে কি! বেমক্কা একটা কিছু বললেই তো আর হল না। তবে, হ্যাঁ, কালাকালের যে মহিষী সেই কালীকে তুমি পেয়েছ বটে—'

এক থালা মিষ্টি নিয়ে এদিক পানে আসছে ভৈরবী। আসছে গদাধরকে খাওয়াতে। আনন্দময়ী নন্দরাণীর আবেশে। প্রেমময় মাতৃমূর্তিতে। কাছে এসেই মথুরবাবুকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। খাবারের থালা হৃদয়ের হাতে ধরে দিলে।

'এই বুঝি তোমার সেই বামনি?' কটাক্ষ করলেন মথুরবাবু।

'হ্যাঁ, এই সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী।' বলেই ঠাকুর ভৈরবীকে সম্বোধন করলেন : 'ওগো, তুমি যা বলছিলে তা ইনি মানতে রাজী নন। বলেন, দশের বেশি অবতার নেই।'
'মিথ্যে কথা।' ভৈরবী হুঙ্কার করে উঠল : 'ভাগবতে বাইশ অবতারের উল্লেখ আছে। তার পরেও সম্ভবামি যুগে-যুগে—অসংখ্য বার ভগবানের অবতীর্ণ হবার কথা বলে গেছেন ব্যাসদেব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। তা ছাড়া গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের কাঁটায়-কাঁটায় মিল—'
এ আরেক পাগলি জুটল দেখি দক্ষিণেশ্বরে। মনে-মনে হাসলেন মথুরবাবু। আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন ভৈরবীকে। এত রাজ্যের রূপ নিয়ে দেশে-দেশে একা-একা ঘুরে বেড়ায়, যোগিনী না নাগিনী, তা কে জানে। দেখি একবার যাচাই করে।
কালীমন্দিরের বারান্দায় তাকে পাকড়াও করলেন মথুরবাবু। বিদ্রূপের টান দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, বেড়ে ভৈরবী তো সেজেছ কিন্তু তোমার ভৈরব কোথায়?'
এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ভৈরবী। মন্দিরে কালীর পায়ের তলায় যে মহাকাল শুয়ে আছে তার দিকে স্পষ্ট আঙুল দেখাল। বললে, 'ঐ ভৈরব।'
মথুরবাবু ঠোঁট বেঁকালেন। 'ঐ ভৈরবটি তো অচল। বলি সচল ভৈরবটি কোথায়?'
ফণিনীর মত মাথা তুলল ভৈরবী। দৃঢ়স্বরে বললে, 'ঐ অচলকে যদি সচল করতে না পারি তবে মিছিমিছি ভৈরবী হয়েছি।'
মথুরবাবু ধাক্কা খেলেন। কিন্তু সন্দেহ যায় না।
গায়ের জ্বালা ঠান্ডা হয়েছে গদাধরের, কিন্তু এ আবার কি উপসর্গ শুরু হল!
'মা গো, নিদারুণ খিদে! এই খাচ্ছি আবার অমনি খিদে পাচ্ছে।' ভৈরবীর কাছে নালিশ জানাল গদাধর : 'রাত-দিন আর কোনো চিন্তা নেই, কেবল খাবার চিন্তা। এ আবার আমার কি হল?'
'কোনো ভাবনা নেই।' অভয় দিল ভৈরবী। বললে, 'সবই সেই একই কাহিনী। তোমার মাঝে যে ভাবস্বরূপ বিরাজ করছেন এ তাঁরই ভাব।'
'না মা, এ বুঝি আরেক রকম রোগ হল আমার—'
'দাঁড়াও, সারিয়ে দিই।'
মথুরকে বললে যত রাজ্যের বিচিত্র খাবার পাও সব এক ঘরে জড়ো করো। গদাধরকে বললে, ঐ খাবারের ঘরে খিল চাপিয়ে একা-একা বাস করো দিন-রাত। যত ইচ্ছে তত খাও, যখন যেমন খুশি। যখন যেমন খিদে। নাও আর খাও, ফেল আর ছড়াও।
অদ্ভুত ব্যবস্থা! কখনো এটা খাচ্ছে কখনো ওটা খাচ্ছে। যত খাচ্ছে ততই খিদে পাচ্ছে। যত খিদে পাচ্ছে ততই খাচ্ছে। কিন্তু তিন দিনের দিন, আশ্চর্য, আর সেই চন্ডাল খিদে নেই। গদাধর আবার সেই স্বাভাবিক মানুষ।
এ সব নির্ভুল অবতারলীলা। বামনি আবার ঘোষণা করল। গদাধর নরদেহে ভগবান।

মথুরবাবু তবুও নারাজ।

'তুমি সভা ডাকাও।' তেজতপ্ত কণ্ঠে গর্জে উঠল ভৈরবী : 'আমি শাস্ত্রের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। সাধ্য থাকে কেউ এসে আমাকে খণ্ডন করুক।'

কালীমন্দিরে সাড়া পড়ে গেল। এ বলে কি বামনি?

'ঠিকই বলছি। তোমরা যাকে এত দিন পাগল ভেবে এসেছ, সে স্বয়ং নরদেহী রামচন্দ্র।' ভৈরবী আবার হুঙ্কার ছাড়ল : 'এ শুধু আমার মুখের কথা নয়, এ শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র যদি মানো তবে আমার প্রমাণও মানবে।'

গদাধর বললে, 'বসাও না পণ্ডিত-সভা। মজাটা দেখা যাক না—'

কালীঘরের আমলারা মথুরবাবুর দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই উপহাস করে উড়িয়ে দেবেন কথাটা। একটা মাথা-খারাপ বাউণ্ডুলে, সে না কি ঈশ্বর!

না, না, বসাক না সভা। মন্তব্য করলে কেউ-কেউ। সভা করলেই বুজরুকিটা বেরিয়ে পড়বে।

গদাধর নিজে যখন সভার কথা বলছে তখন মথুরবাবু আর আপত্তি করতে পারেন না। মন্দ কি, নিজের সন্দেহেরও একটা শান্তি হবে। কিন্তু ডাকাই কাকে? সে যুগে সব চেয়ে বড় পণ্ডিত আর সাধক হচ্ছে বৈষ্ণবচরণ আর গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। তাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন মথুরবাবু।

আমি মূর্খ। তবু পণ্ডিতেরা আমার কাছেই আসবে! আমারই জন্যে! ভাবলে গদাধর। ভেবে অবাক হয়ে গেল। মা গো, এ তোর কি আশ্চর্য খেলা!

যে ধান মাপে তার পিছনে বসে আরেক জন কে রাশ ঠেলে দেয়। তুই তেমনি আমাকে রাশ ঠেলে দিস।

২২

সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে বৈষ্ণবচরণ চলে এল দক্ষিণেশ্বরে। বসল পণ্ডিত-সভা। ভৈরবী সওয়াল শুরু করল। অবতারের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলে আর গদাধরের মধ্যে সে কী পর্যবেক্ষণ করছে তারই বিবৃতি দিলে। প্রায় প্রতিটি লক্ষণ গদাধরের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখুন সবাই মিলিয়ে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৈষ্ণবচরণকে সরাসরি সম্বোধন করলে ভৈরবী, গদাধর মর্তদেহী ভগবান। আপনি যদি তা না মানেন, বলুন, কেন, কি কারণে আপনি তা মানছেন না—

সাহসিকা জননীর মত আশ্রয়পক্ষপুট বিস্তার করে দাঁড়াল ভৈরবী। দেখি কে আমার গদাধরকে মন্দ বলে। কার সাধ্য ছোট করে গদাধরকে।

আর গদাধর? সে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। যাকে নিয়ে এত হট্টগোল, সে হাঁ-ও জানে না, না-ও জানে না। আত্মভোলা শিশুর মত সভার মাঝখানে বসে আছে। কখনো হাসছে কখনো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, কখনো বা বটুয়া থেকে মশলা তুলে মুখে ফেলছে। অবতার হলেই বা কি, না হলেই বা কি—তার কী যায়-আসে! সে যেমন আছে বেশ আছে!

বৈষ্ণবচরণ প্রশ্ন করতে লাগল গদাধরকে।

হ্যাঁ, জ্যোতি দেখি। নিদারুণ আনন্দ হয়। বুকের মধ্যে তুবড়ির মত গুরগুর করে মহাবায়ু ওঠে। নাভি থেকে যে শব্দ ওঠে শুনি সেই অনাহত শব্দ। শব্দ-কল্লোল ধরে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছুই। সেই সমুদ্রই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তাই পরম পদ। 'যত্র নাদো বিলীয়তে।' সেখানে আমিও নেই তুমিও নেই, একও নেই অনেকও নেই। সে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার।

বিজ্ঞানী সাধু। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান। আর যে দুধ খেয়েছে সে বিজ্ঞানী।

শুধু যে জ্ঞানী তার বসবার ভঙ্গিই অন্য রকম। সে গোঁফে চাড়া দিয়ে বসে। লোক দেখলে ডেকে শুধোয়, তোমার কিছু জানবার আছে? আছে তো বোসো, শোনো। কিন্তু বিজ্ঞানী—যে সর্বদা ঈশ্বরকে দেখছে, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছে, তার ধরন-ধারণ অদ্ভুত। সে কখনো জড়, কখনো পিশাচ, কখনো বালক, কখনো উন্মাদ। বেশ আছে, হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে অসাড়-অস্পন্দ হয়ে গেল। তাই জড়। জগৎ ব্রহ্মময় দেখছে, তাই শুচি-অশুচি মেধ্য-অমেধ্য জ্ঞান নেই। এমন যে ভাত আর ডাল—তাও অনেক দিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়। তাই খাদ্যে আর ত্যাজ্যে সমান ব্রহ্ম-স্বাদ। তাই আবার পিশাচ। তার রকম-সকম সাধারণের শাদা চোখে স্বাভাবিক নয়। তাই সে পাগল। সে যে খাপ-খোলা তলোয়ার। তাই সে খাপ-ছাড়া। আবার পর মুহূর্তেই সে বালকের মত। কোনো পাপ নেই, লজ্জা-ঘৃণা নেই। ছলা-কলার ধার ধারে না। একেবারে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা।

আরো অনেক সব উত্তর দিল গদাধর। এটা হয় ওটা হয়, এটা দেখি ওটা দেখি—এই ধরনের উত্তর। নিজে কিছুই জানে না। যার খোঁজ তার খবর নেই!

ভৈরবীর সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সায় দিল বৈষ্ণবচরণ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য অবতারে শাস্ত্রোক্ত যত লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি—প্রায় সমস্তগুলিই—বিকশিত। যে পরমা ভক্তির ফল মহাভাব তা গদাধরে সবিশেষ দেদীপ্যমান। সন্দেহ নেই, গদাধর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বলছে। মথুরবাবু থ হয়ে রইলেন। আমলারা যারা ছিল তারা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ক'দিন পরে হাজির হল এসে গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দেশে। বৈষ্ণবচরণ কর্তাভজা, গৌরীকান্ত তান্ত্রিক। মহা শক্তিশালী তান্ত্রিক। প্রতি দুর্গা-

পূজায় স্ত্রীকে ভগবতীজ্ঞানে আরাধনা করত। যজ্ঞ করার রীতি ছিল অলৌকিক। যজ্ঞের কাঠ মাটিতে সাজাত না, বাঁ হাতের তালুর উপর সাজাত। বাঁ হাত প্রসারিত, করতলের উপর কাঠ সাজিয়ে রাখছে—দু-চারখানা নয়—সম্পূর্ণ এক মণ কাঠ—আর তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে ডান হাতে। যতক্ষণ অনুষ্ঠান না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ হাতের উপর জ্বলছে সেই কাঠ। নিজের চোখে একদিন তা দেখেছিলেন ঠাকুর।

সেই গৌরীকান্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। যেমন পণ্ডিত তেমনি তার্কিক। তার সঙ্গে সহজে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। দাঁড়াতে পারে না মুখের সামনে। সবাই বলে এও তার তন্ত্রবল।

তর্কসভায় যখন সে ঢোকে তখন প্রাণপণ শক্তিতে একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কোনো স্তোত্রের বিশেষ একটা অংশই আবৃত্তি করে হয়তো, কিন্তু কণ্ঠস্বরে গগন-বিদার বজ্রের কাঠিন্য। আওয়াজ শুনে ছাদ-দেয়াল ফেটে পড়বে মনে হয়, ভয়ে হৃৎকম্পন স্তব্ধ হয়ে যায়। এই চীৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। কেউ-কেউ বলে অমনি চীৎকার করেই না কি সে নিজের মধ্যে তার আশ্চর্য শক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে। সে যে একজন অসীম শক্তিধর ঐ চীৎকারই তার অভিজ্ঞান!

কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে যথারীতি হুঙ্কার ছাড়ল গৌরীকান্ত।

নিজের ঘরের নিরিবিলিতে বসেছিল গদাধর। চীৎকার শুনে চমকে উঠল। কোথাকার কোন পণ্ডিত এসেছে, কি তার শক্তি-সাধনা, কিছুরই সে খবর রাখে না। কিন্তু কি স্তোত্রাংশ বলেছে চীৎকার করে তা ঠিক ধরতে পেরেছে। তার অন্তরে যে বসে আছে সেই বলে দিলে গোপনে। বললে, তুইও ঐ ভাঙা লাইনটা আবৃত্তি কর। কিন্তু খবরদার, ও যতটা জোরে চেঁচিয়েছে, তার চেয়ে আরো জোরে চেঁচানো চাই।

তাই সই। গদাধর চীৎকার করে উঠল। প্রবলতর, পুরুষতর কণ্ঠে। মনে হল যেন ডাকাত পড়েছে। যে যেখানে ছিল হকচকিয়ে উঠল। লাঠি হাতে ছুটে এল দারোয়ানেরা। কি ব্যাপার? ডাকাত-কোথায়?

ডাকাত-টাকাত কিছু নয়। গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে পাগলা-পুরোতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—কার গলার কত জোর! সবাই অবাক মানল। পাগলা-পুরোতের গলা এত দরাজ! এমন সাংঘাতিক!

হার মানল গৌরীকান্ত। মুখ গম্ভীর করে ঢুকল এসে মন্দিরে। এক ডাকে এত নাজেহাল হবে স্বপ্নেও ভাবেনি। কে এ কালীর বরপুত্র!

তর্কে অজেয় ছিল গৌরী। দেখল তারো চেয়ে আশ্চর্যতর শক্তি আছে। তার যা শক্তি তা তাকে তর্কেই আবদ্ধ করে রেখেছে, তর্কাতীতকে দেখতে দেয়নি। সে শুধু রৌদ্রই পেয়েছে, রুদ্রকে পায়নি। কিন্তু কে এ অলোকসম্ভব, যে একটি ধ্বনিতেই সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ করে দেয়! একটি উক্তিতেই শান্ত করে দেয় সমস্ত জিজ্ঞাসা!

গদাধরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল গৌরীকান্ত।

এততেও মথুরবাবু তুষ্ট হলেন না। তিনি আরও পণ্ডিত ডাকালেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শাস্ত্র মিলিয়ে বিচার হোক। মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমন্দিরে বিচারসভা।

সে-সভায় ঢোকবার আগে গদাধর মন্দিরে ঢুকল কালী-প্রণাম করতে। কালী-প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ বৈষ্ণবচরণ তার পায়ে পড়ল। অমনি ভাবসমাধি হল গদাধরের। বৈষ্ণবচরণের অন্তরে বইতে লাগল দিব্যানন্দের প্রবাহ। মুখে-মুখে সে তক্ষুনি এক সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করে ফেলল। সে স্তোত্রে শুধু গদাধরের স্তুতি।

'বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে তর্ক করতে এসেছি আমি।' সমবেত পণ্ডিতদের উদ্দেশ করে বললে গৌরীকান্ত। 'আপনারা এসেছেন সে বাগ্‌যুদ্ধ দেখতে। সে যুদ্ধে কে জেতে তাই নির্ণয় করতে। কিন্তু সে যুদ্ধের আর দরকার নেই। বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণু-চরণের স্পর্শ পেয়েছে—তাকে পরাস্ত করা মানুষের অসাধ্য। তা ছাড়া তর্ক করার আছে কি। শাস্ত্র মিলিয়ে দেখেছি আমরা দু'জনে, গদাধর ভগবানের মহাবতরণ।'

ওরা বলে কি! গদাধর বালকের মত অবাক মানল। কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ঈশ্বরের স্বভাবই তো বালকের মত। ছোট ছেলে যেমন খেলাঘর করে, একবার গড়ে, একবার ভাঙে, ঈশ্বরও তেমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। ছোট ছেলে যেমন কোনো গুণের বশ নয়, ঈশ্বরও তেমনি তিন গুণের অতীত।

তাই ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেশ, তাদের সঙ্গে থাকো। তা হলেই তাদের স্বভাব আরোপ হবে। ওদের কথাই চিন্তা করো। তা হলেই সত্তা পাবে ওদের। তদাকারিত হবে।

ঈশ্বর কেমনতরো? না, যেন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে রাস্তায় বসে আছে। কত লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। অনেকে চাচ্ছে তার কাছে রত্ন। কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলছে, না, দেব না। আবার যে হয়তো চায়নি, চলে যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছু-পিছু ছুটে যেচে সেধে তাকে দিয়ে ফেলছে।

ভৈরবীর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তার কথা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মথুরের বুক ফুলে উঠল দশ হাত। তিনি যাকে গুরু বলে শিরে ধরেছেন সে গুরুর গুরু, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ—নিত্য সত্য জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অবতার।

অবতার বলে সবাই মেনে নিলেও গদাধর ক্ষান্ত হবার নয়। লোকের কথায় তার সান্ত্বনা কোথায়? সে চায়, নিজের অনুভব, নিজের উজ্জীবন। বোধ থেকে বোধির আস্বাদ। নতুন সাধনায় তাই সে আত্মনিয়োগ করলে। কঠিনতর তপস্যায়। বিধিগত যোগচর্চায়। তারই নাম তান্ত্রিক সাধনা। আর সে সাধনায় তার গুরু হল ভৈরবী যোগেশ্বরী।

এ পর্যন্ত গদাধর নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরকে ধরতে চেয়েছে। নিজের চেষ্টায় মানে শুধু অন্তরের ব্যাকুলতায়। দেখা যাক পরের সাহায্যে কত দূর যেতে পারি। পরের সাহায্যে মানে গুরুর নির্দেশে।

সেই গুরু যোগেশ্বরী। একজন কি না স্ত্রীলোক।

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন ঠাকুর। অথচ কি না এক নারী তাঁর গুরু!

তার মানে নারীর মধ্যে যে কামিনী যে তামসী তাকে ত্যাগ করবে। যে যোগিনী, যে মহিমাময়ী মাতৃস্বরূপিণী তাকেই গ্রহণ করবে। অভিনন্দন করবে।

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুই দ্যাখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি
আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি
সে যেন মা বলে ডাকে॥'

জনক রাজার আরেক নাম বিদেহ, যেহেতু তিনি নির্লিপ্ত, তাঁর দেহে দেহবুদ্ধি নেই। সেই জনক রাজার সভায় একদিন এক ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক হেঁটমুখ হয়ে চোখ নিচু করে রইলেন। ভৈরবী বললে, 'তোমার এখনো স্ত্রীলোক দেখে ভয়! তোমার তবে এখনো পূর্ণজ্ঞান হয়নি। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ বলে ভেদ থাকে না।'

আমাদের গদাধর সেই পাঁচ বছরের ছেলে। স্ত্রীলোক মাত্রই তার মা'র প্রতিমা।

তা ছাড়া কামিনীকাঞ্চনত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে, সংসারীর পক্ষে নয়। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কেমনতরো জানো? যেমন আচার-তেঁতুল। মনে করলে মুখে জল সরে। আচার-তেঁতুল সামনে আনতে নেই।

'কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে, সংসারীদের পক্ষে নয়।' বললেন ঠাকুর, 'আপনারা যদ্দুর পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকো। মাঝে-মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করো। সেখানে ওরা যেন কেউ না থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি এলেই অনেকটা অনাসক্ত হতে পারবে। দু-একটি ছেলেপুলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ভাই-বোন হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিয়সুখে মন না যায়, ছেলেপুলে আর না হয়।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'কামিনীকাঞ্চন ছাড়ে কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্যে প্রার্থনা করো। ঈশ্বরই খাঁটি আর সব ভেজাল, অসার—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা এক দিকে পড়ে, ভালো জল এক দিকে পড়ে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। তাই হবে বিদ্যার সংসার।'

আর অবিদ্যার সংসারে দেখ না মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি! পুরুষগুলোকে বোকা অপদার্থ করে রেখে দিয়েছে। হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনিতে পেয়েছে। ওরে, হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল? আর হারু কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নেই সে তেজ নেই সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেতনি হারুকে পেয়েছে। পেতনি যদি বলে, যাও তো একবার, হারু অমনি উঠে দাঁড়ায়। আবার যদি বলে, বোসো তো, অমনি বসে পড়ে।

তবু ঠাকুর বিয়ে করলেন।

'আচ্ছা, আমার বিয়ে কেন হল বল্ দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই।—তার আবার স্ত্রী কেন?'

নিজেই আবার উত্তর দিলেন ঠাকুর: 'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়। ব্রাহ্মণ-শরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিয়ে তার মধ্যে একটা। শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্যে। ঐ দশ রকম সংস্কার হলেই তবে আচার্য হওয়া যায়। সব ঘর ঘুরে এলেই তবে ঘুঁটি চিকে ওঠে।'

বিয়ে করলেন অথচ সংসার ভোগ করলেন না। বিয়ের কত বড় আদর্শ হতে পারে তাই দেখালেন সংসারকে। স্বামী-স্ত্রী ভোগাসনে না বসে বসলেন যোগাসনে। যে কামিনী হতে পারত সে হয়ে দাঁড়াল জ্যোতিষ্মতী জগদ্ধাত্রী। রতির পৃথিবীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন মূর্তিমতী বিরতিকে—অতৃপ্তির জগতে সন্তোষময়ীকে। নারীর সব চেয়ে যে বৃহত্তম মহিমা তাই অর্পণ করলেন নারীকে।

'এখনকার যা কিছু করা সব তোদের জন্যে।' ঠাকুর বললেন ভক্তদের: 'ওরে, আমি ষোলো টাং করলে তবে তোরা যদি এক টাং করিস—'

ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নিবৃত্তি, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু সংযম। ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নির্বাসনা, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু অস্পৃহা।

'বাতাস করো তো মা, শরীর জ্বলে গেল।' অস্থির হয়ে বললেন একদিন শ্রীমা: 'গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারু বা পঁচিশটে ছেলেমেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই, কিছু নেই। ঠাকুর তাই বলতেন, ওরে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে-ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল। কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে কথা কয়ে বাঁচি। ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।'

২৩

মা গো, বামনি বলছে তন্ত্রমতে সাধন করতে। করব?

করবি বৈ কি, সম্পূর্ণ ভাবে করবি। ইঙ্গিত করলেন জগদম্বা। বললেন, তন্ত্রসাধনা জীবনের সর্বাঙ্গীন সাধনা। সত্তার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের ক্রম-

উন্মোচন। বোধ থেকে বিকাশে চলে আসা, ভোগ ছেড়ে যোগৈশ্বর্যে। জীবসত্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। চিত্ত থেকে চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া। শক্তিই তন্ত্রের সর্বস্ব। তন্ত্রে কোথাও কিছু তুচ্ছ নেই হেয় নেই পরিত্যাজ্য নেই। সব কিছুর থেকেই ঈশ্বরী শক্তিকে আহরণ করা, আকর্ষণ করা। আত্মশক্তিকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শক্তিকে ছুটিয়ে এনে শিবত্বে পৌঁছে দেওয়া। সমস্ত গতিকে একটি পরম ধৃতির মধ্যে শান্ত করা।

মা গো, তোকে তো আমি দেখেছি, তবে আমার আবার সাধন কি?

দরকার আছে। লাউ-কুমড়োর দেখেছিস তো, আগে ফল হয় পরে ফুল ফোটে। তেমনি তোর আগে সিদ্ধি, পরে সাধন।

তুমি যদি আমাকে অবতারই বলো, বামনিকে গিয়ে ধরল গদাধর, তবে আমার আবার সাধন কেন?

দেখি না তোমার নরদেহে তা কী অপূর্ব ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। দেহ যখন ধরেছ তখন নিয়েছ সকল বিকারের ভার। তাই দেহের পক্ষে যা সাধ্য সকল সাধনা তোমাকে করতে হবে। এ জৈব দেহকে নিয়ে যেতে হবে শৈব স্থিতিতে। মৃণ্ময় থেকে চিন্ময়ে। নইলে জীবোদ্ধার হবে কি করে?

পার্বতী ভগবতী হয়েও শিবের জন্যে কঠোর সাধন করেছিলেন। পঞ্চমুণ্ডীর উপরে বসে পঞ্চতপা। শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে থাকা। অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা সূর্যের দিকে।

তেমনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হলেও, অনেক সাধন করেছিলেন রাধাযন্ত্র নিয়ে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও'। নরদেহ ধরেও কোথায় চলে আসা যায় কোন অলৌকিক তীর্থভূমিতে, তাই তুমি প্রমাণ করো। দেহী হয়েও দেহোত্তীর্ণ হবার আদর্শ তুলে ধরো। তুমি নইলে এই সব দুর্বল অবিশ্বাসী জীব কোথায় আশ্বাস পাবে? কোথায় এসে ত্রাণ খুঁজবে? রাগ-বেগ থেকে চলে আসবে বৈরাগ্য-আবেগে?

তা ছাড়া, শাস্ত্রের মর্যাদা তো রাখতে হবে ষোলো আনা। সংস্কারপালনের জন্যে যেমন বিয়ে করেছ তেমনি শাস্ত্রপালনের জন্যেও তোমাকে তন্ত্রসাধন করতে হবে। তন্ত্র সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ।

> 'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
> তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥'

তন্ত্রের তিন রকম আচার—পশু, বীর আর দিব্য। পশ্বাচার সাধারণ জীবের জন্যে। এতে শুদ্ধ শম-দম যম-নিয়ম ধ্যান-পূজা যত সব আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি। কামনার থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা—এতে করে হয়তো বা সেই কামনাকেই মূল্য দেওয়া। এ পথে যতটুকু সম্ভব, জীবভাবের সংস্কার চলে মাত্র, কিন্তু জীবভাবের লয় হয় না। অর্থাৎ জীবত্ব আরূঢ় হয় না শিবত্বে।

বীরাচার অন্য জাতের। কামনার মধ্যে বাস করে তাকে উপেক্ষা করা, উদাসীন থাকা। উল্লাসকে অনুভব করা কিন্তু তাতে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ না হওয়া। মৌমাছি হয়ে পদ্মের উপর বসেও মধুপান না করা। ফল পেয়েও ফলত্যাগ করে যাওয়া। সমস্ত স্থূলাধারকে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। পশু শক্তি দ্বারা চলছে কিন্তু শক্তিকে চালাচ্ছে বীর। বীর শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে এসে শিবভাবে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। শক্তিকে রূপান্তরিত করছে শান্তিতে। স্থূলকে সূক্ষ্মে। বোধকে বিভূতিতে।
আর দিব্য? তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মমগ্ন। শক্তিতেও তিনি নেই, বিভূতিতেও তিনি নেই। তাঁর স্থিতিতেও ব্রহ্ম, প্রাপ্তিতেও ব্রহ্ম। তিনি প্রশান্ত ও প্রসারিত।
এখন কী করতে হবে?
সর্বপ্রথমে মুণ্ড সাধন করো। যে দেশে গঙ্গা নেই সে দেশ থেকে আগে মুণ্ডমালা সংগ্রহ করি। স্থাপন করি মুণ্ডাসন।
বাগানের উত্তরসীমায় বেল গাছ। তার নিচে বেদী তৈরি হল। সেই বেদীর নিচে তিনটি নরমুণ্ড পুঁতলে। বিকল্প আসন হল পঞ্চবটীতে। সে বেদীর নিচে পঞ্চজীবের পঞ্চমুণ্ড। শেয়াল, সাপ, কুকুর, ষাঁড় আর মানুষ। বামনিই সব যোগাড় করেছে ঘুরে-ঘুরে। যেটার জন্যে যে আসন দরকার তাতেই বসে তন্ত্রসাধন শুরু করলে গদাধর।
অনেক রকম পুজো অনেক রকম জপ, অনেক রকম হোম-তর্পণ। উগ্র হতে উগ্রতর তপস্যা। এক-একটা সাধন ধরে আর দু-তিন দিনের মধ্যেই নিরাপদে পার হয়ে যায়। শাস্ত্রে যে ফল নির্দিষ্ট আছে তাই প্রত্যক্ষ করে। দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির পর অনুভূতি।
এমনি করে গুনে-গুনে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখালে বামনি।
এতটুকু পদস্খলন হল না গদাধরের। কি করে হবে? মা যে তার হাত ধরে আছেন। এক দিন রাত্রে বামনি কোত্থেকে এক স্ত্রীলোক ধরে আনল। পূর্ণযৌবনা সুন্দরী স্ত্রীলোক। তাকে বেদীর উপর বসালে। গদাধরকে বললে, 'বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে পূজা করো।'
স্ত্রী-মাত্রেই মাতৃজ্ঞান গদাধরের। তার ভয় কি। সে তন্ময় হয়ে পূজা করতে লাগল। পূজা সাঙ্গ হলে ভৈরবী বললে, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে এর কোলে বোস। কোলে বসে তদ্‌গত হয়ে জপ করো।'
শিউরে উঠল গদাধর। রমণী দিগম্বরী।
এ কি আদেশ করছিস মা? তোর দুর্বল সন্তান আমি, আমার কি এ দুঃসাহসের শক্তি আছে?
কে বলে তুই আমার দুর্বল সন্তান? তুই আমার সব চেয়ে জোরদার ছেলে। ওখানে ও বসে কে? ও তো আমি। তুই আমার কোলে বসবি নে? এতো সহজ অবস্থা। এতে আবার দুঃসাহস কি!
'নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অরূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।' সত্যিই তো, মা-ই তো বসে আছেন। অমনি সমস্ত দেহপ্রাণ

অনন্ত দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। রমণীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হল গদাধর। বামনি বললে, 'পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছ বাবা।'

আরেক দিন শবের খর্পরে মাছ রাঁধলে ভৈরবী। জগদম্বাকে তর্পণ করলে। গদাধরকে খেতে বললে মাছ। নির্ঘৃণ হয়ে খেল তাই গদাধর।

তার পরে সেদিন যা হল তা কল্পনায়ও ভয়াবহ। ভৈরবী কোত্থেকে গলিত নরমাংস যোগাড় করে আনলে। দেবী-তর্পণের শেষে গদাধরকে বললে, 'এ মাংস জিভে ঠেকাও।'

'অসম্ভব! এ আমি পারব না।' ঝটকা মারল গদাধর।

'কেন, ঘেন্নার কি! কোনো কিছুকেই ঘেন্না করতে নেই। এই দেখ না, আমি খাচ্ছি।' বলেই এক টুকরো নরমাংস নিজের মুখে ফেলে চিবুতে লাগল বামনি।

'এইবার তুমি খাও।' গদাধরের মুখের সামনে ধরল আরেক টুকরো।

মা, তুই বলছিস? খাব?

দেহে-প্রাণে চণ্ডীর প্রচণ্ড উদ্দীপনা এসে গেল। 'মা' 'মা' বলতে-বলতে ভাবাবিষ্ট হল গদাধর। অমনি বামনি তার মুখের মধ্যে মাংসের টুকরো পুরে দিল।

ভয় নেই লজ্জা নেই ঘৃণা নেই গদাধরের। সে ত্রিপাশমুক্ত।

শেষ তন্ত্র এখনো বাকি। এবার শিব-শক্তির লীলা-বিলাস দেখতে হবে। এই বীরাচারের শেষ সাধন।

এক চুল বিচলিত হল না গদাধর। নির্বিকল্প সমাধিতে প্রশান্ত হয়ে রইল।

সমস্ত স্ত্রীত্বেই সে মাতৃত্ব নিরীক্ষণ করছে। রমণী মাত্রেই মা। মাতৃভাবেই আদ্যা-শক্তির অধিষ্ঠান।

মাতৃভাব নির্জলা একাদশী—ভোগের গন্ধ নেই এক বিন্দু। ফল-মূল খেয়েও একাদশী হয়। কোথাও বা লুচি ছক্কা খেয়ে। সে সব বামাচার। বামাচারে ভোগের কথা আছে। ভোগ থাকলেই ভয়। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই তার পতন। যেন থুতু ফেলে আবার সেই থুতু খাওয়া।

'আমার নির্জলা একাদশী। সব মেয়ে আমার মূর্তিমতী মহামায়া।' বললেন ঠাকুর। 'এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা। তুমি মা আমি তোমার ছেলে—এর পরে আর কথা নেই, এর বাইরে আর সম্পর্ক নেই।'

'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।' বললে ভৈরবী।

সাধনাসম্ভূত সে কী রূপ এল গদাধরের শরীরে। সে এক জ্যোতির্ময় দেহ। রোদে গিয়ে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে না। সর্বাঙ্গে সুধাংশু-কান্তি। যেন ধবলগিরি-শিরে শিব বসেছেন পদ্মাসনে।

'মা, আমার এই বাইরের রূপে কী হবে? আমাকে অন্তরের রূপ দে। যেন সকল সুরূপে-কুরূপে তোকেই কেবল দেখতে পারি।'

এক দিন কালীঘরে পূজার আসনে বসে ধ্যান করছে গদাধর, কিন্তু কিছুতেই মা'র মূর্তি মনে আনতে পারছে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে—ও কে? ও তো রমণী, পতিতা, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে যে প্রায়ই স্নান করতে আসে!

সে কি কথা! মা আজ পতিতার বেশে পূজা নিতে এলেন? 'ও মা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ, যেমন তোর খুশি তাই হ। তেমনি হয়েই তুই পুজো নে।'

আরেক দিন থিয়েটার দেখে ফিরছেন ঠাকুর। গণমোহিনীরা সেজে-গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। 'ওমা, মা, তুই এখানে এ ভাবে রয়েছিস?' বলে ঠাকুর প্রণাম করলেন ওদের।

জননী, জায়া আর জনতোষিণী—সব সেই জগদম্বার অংশ।

তুমি মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যাতে মহা বিদ্যাও আছে, আবার মহা অবিদ্যাও আছে। তেমনি বেদ-বেদান্তও তুই, খিস্তি-খেউড়ও তুই।

'মা, তুই তো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-রূপিণী। তোর যে সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো ফের খিস্তি-খেউড়ে। তোর বেদ-বেদান্তের ক-খ আলাদা, আর খিস্তি-খেউড়ের ক-খ আলাদা—এ তো নয়! ভালো-মন্দে পাপে-পুণ্যে শুচি-অশুচিতে সর্বত্র তোর আনাগোনা।'

সর্বত্র সমবুদ্ধি। সকলের জন্যে স্থান, সকলের জন্যে মান, সকলের জন্যে আশ্বাস। পাপী আর তাপী, আর্ত আর পীড়িত, অবর আর অধম—কেউ তোমরা হেয় নও, অপাঙ্‌ক্তেয় নও। কেউ নও নিঃস্ব-নিরাশ্রয়। যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই চলে এস। সব অবস্থায়ই সন্তানের স্থান আছে মা'র কোলে। সে যদি আমাদের মা, তবে তার কাছে লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি! আর, যদি দেরি একটু আমাদের হয়েই থাকে, তাই বলে কি মা'র কখনো দেরি হয়?

ভৈরবী বললে, 'একটু কারণ খাও।'

কারণ? জগৎকারণ ঈশ্বরের অমৃতই তো খেতে চলেছি। এ তুচ্ছ মদিরা তার কাছে কী?

'বাবা, বীরভাবে সাধনা করেই সিদ্ধি পেয়েছি আমি।' ভৈরবী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল গদাধরের দিকে: 'কিন্তু তুমি দিব্যভাবের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে।' দিব্যভাব? হাসল গদাধর।

তুমি জল না ছুঁয়ে মাছ ধরেছ। তোমার দেহবোধ নেই। তোমার সুষুম্নাদ্বার সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে। তুমি বালকস্বভাব হয়েছ। সর্বস্তুতে তোমার অদ্বৈত-বুদ্ধি এসেছে। গঙ্গার জল আর নর্দমার জল তোমার কাছে সমান। তুলসী আর সজনেতে কোনো ভেদ নেই। আমাকে এবার তোমার শিষ্যা করো। আমাকে বীর থেকে দিব্যে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো রূপ থেকে অরূপে, ক্রিয়া থেকে সত্ত্বায়, দীপ্তি থেকে তৃপ্তিতে—

তুমি যোগেশ্বরী। তুমি যোগমায়ার অংশ। তোমার আবার অপূর্ণ কি?

জানি না। কিন্তু তোমার মাঝে এখন যে শান্তি যে বিশুদ্ধি যে স্বচ্ছতা দেখছি, তা আমার অনধিগম্য। তাই মনে হয় আমি অপূর্ণ, অশক্ত। তুমি অগ্নি থেকে চলে এসেছ জ্যোতিতে, ঝড় থেকে নীলিমায়, কেন্দ্র থেকে প্রসারে। আমি তোমার শিষ্যা হব। আমি চাই ঐ শান্তি, ঐ ব্যাপ্তি, ঐ নীরবতা। ঐ দিব্যচেতনা।

গদাধর হাসল। বললে, 'যে গুরু সেই আবার শিষ্য। যে মা সেই আবার সন্তান। যিনি ভগবান তিনিই আবার ভক্ত।'
ভৈরবী বসল এসে গদাধরের ছায়াতলে।
তার এখনো শেষ তপস্যা বাকি।

২৪

তন্ত্রে তোমার সিদ্ধি হল, এবার কিছু একটা ভোজবাজি দেখাও। হয় পাহাড় টলাও নয় তো মরা নদীতে জোয়ার আনো।
কিছুই করবে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকবে, কি করে তবে বুঝব তুমি মস্ত বড় একটা সাধু হয়েছ!
'মা'র কাছে গিয়ে একটু ক্ষমতা-টমতা চাও না।' হৃদয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল।
ক্ষমতা দিয়ে কী হবে? মাকে দেখতে পাচ্ছি, টেনে আনতে পারছি কাছে, এই কি যথেষ্ট ক্ষমতা নয়?
এ পাঁচ জনে দেখতে পাচ্ছে কই? যা দেখে পাঁচ জনের তাক লেগে যায় তেমন একটা কিছু করো।
তন্ত্রবলে অষ্টসিদ্ধির বিকাশ হয়েছে গদাধরে। তাই কি সে এবার প্রয়োগ করবে নাকি? থ বানিয়ে দেবে নাকি সবাইকে?
মা'র কাছে গেল তাই জিগগেস করতে। চক্ষের নিমিষে মা দেখিয়ে দিলেন ও-সব সিদ্ধাই ঘৃণ্য আবর্জনা। বিষ-কলুষ। ভগবানকে পাবার পথের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। যদি একবার ঐ প্রলোভনে পা দাও তবে মাটি হয়ে যাবে সব তপস্যাফল। দেখতে-দেখতে দেউলে হয়ে যাবে।
কৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে যদি একটিও তোমার থাকে তা হলে তোমার শক্তি বাড়বে বটে, কিন্তু আমায় তুমি পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না, আবার মায়া থেকেই অহঙ্কার। অহঙ্কার যদি থাকে তবে ভগবানের পথে এগুবে কি করে? ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হবে না—
আর কী হীনবুদ্ধির কথা! সিদ্ধাই চাই, না, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, রোগ সারিয়ে দেব। আহা, এরি জন্যে সাধন?

যে বড়লোকের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। তাকে আর এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। আর যদি চড়তে দেয়ও, কাছে বসতে দেয় না। কথা কয় না মন খুলে।

যদি সিদ্ধাই-ই নিয়ে নিলাম তবে ভগবান বলবেন, আর কেন? খুব হয়েছে। ঐ নিয়েই ধুয়ে খা। ঐ নিয়েই মজে থাক। সেই সাবির কথা জানিস না? সবাই বলছে, সাবির এখন খুব সময়। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, দু'খানা বাসন হয়েছে, তক্তপোশ বিছানা মাদুর তাকিয়া হয়েছে, কত লোক আসছে-যাচ্ছে। তার সুখ আর ধরে না। তার মানে আগে সে গৃহস্থ বাড়ির দাসী ছিল এখন বাজারে হয়েছে। তার মানে, সামান্য জিনিসের জন্যে নিজের সর্বনাশ করেছে। যে শরীর-মন-আত্মা দিয়ে ভগবানকে লাভ করব সেই শরীর-মন-আত্মা তুচ্ছ টাকা-কড়ি তুচ্ছ লোকমান্য তুচ্ছ দেহ-সুখের জন্যে বিক্রি করে দেব?

'তবে কী চাইবে মা'র কাছে?' হৃদয় ঝটকা মারল।

'শুদ্ধ কৃপা চাইব। বলব, আমাকে ভক্তি দাও, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি।'

হ্যাঁ, প্রহ্লাদের যেমন ছিল। রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, শুধু হরিকে চায়। কিছু চাও না অথচ ভালোবাসো এরই নাম ভক্তি। তুমি বড় লোকের বাড়ি রোজ যাও, কিন্তু কিছুই চাও না, জিগগেস করলে বলো, আজ্ঞে, কিছু না, এমনি একটু শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি, এরই নাম নিষ্কাম ভক্তি। যেমন নারদের ছিল। ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করে।

গদাধর মন্দিরে গিয়ে মা'র পাদপদ্মে ফুল দিলে। বললে, 'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও, তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও—'

একটা নিলে আরেকটা নিতে হবে। যদি মা জ্ঞান নেন তবে অজ্ঞানও নেবেন, পুণ্য নিলে পাপও। অনেক ছাড়া এক নেই। অন্ধকার ছাড়া আলো নেই। অহল্যার শাপ-মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, বর চাও। অহল্যা বললেন, যদি বর দেবে তো বর দাও, যদি পশু হয়েও জন্মাই যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে।

আমি সিদ্ধি চাই, সিদ্ধাই চাই না। আমার এ সিদ্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয় না। এ সিদ্ধি খেতে হয়।

ভৈরবীর সেই দুই শিষ্য—চন্দ্র আর গিরিজা—এক দিন এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে। দু'জনেই সিদ্ধাই নিয়ে ব্যস্ত। নানা রকম ক্ষমতার ভেল্‌কিবাজি নিয়ে।

এ হচ্ছে অহঙ্কার। এক রকম মায়া। এক টুকরো মেঘের মতন। সামান্য মেঘের জন্যে সূর্যকে দেখা যায় না। তেমনি এই অহং বুদ্ধির জন্যেই হয় না ঈশ্বরদর্শন।

অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। ভার নেন না ঈশ্বর।

কাজকর্মের বাড়িতে যদি এক জন ভাঁড়ারি থাকে তবে কর্তা আর আসে না ভাঁড়ারে।

যখন ভাঁড়ারি নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায় তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় আর নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

তাই, ক্ষমতা নিজের হাতে না নিয়ে ছেড়ে দাও সেই সর্বশক্তিমানের হাতে।

একবার বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ও কি, কোথায় যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' কিন্তু খানিক দূর গিয়েই ফিরে এলেন নারায়ণ। 'এ কি, এত শিগগির ফিরে এলে যে?' শুধোলেন লক্ষ্মী। নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি ভাবে বিহ্বল হয়ে পথ চলছিল। মাঠে কাপড় শুকোতে দিয়েছিল ধোপারা, ভক্তটি তাই মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে তাকে মারতে ধোপারা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।' 'কিন্তু ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ বললেন, 'দেখলাম ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ইঁট তুলেছে। তাই আর আমি গেলাম না।'

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে সমর্পণ করে দাও। নিজের জন্যে কিছু রেখো না। নিজেকে দেখিয়েও 'আমি' বলবে না, বলবে 'তুমি'।

চন্দ্রের 'গুটিকা-সিদ্ধি' হয়েছিল। একটি মন্ত্রপূত গুটিকা ছিল তার। সেটি ধারণ করলেই সে অদৃশ্য বা অশরীরী হয়ে যেতে পারত। আর অদৃশ্য হয়েই যেতে পারত যেখানে খুশি, সে জায়গা যতই দুর্গম বা দুষ্প্রবেশ্য হোক। ঐ শক্তি পেয়ে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছিল চন্দ্র। ভাবলে, যখন যেখানে-খুশি যেমন-খুশি যাতায়াত করতে পারি, তখন ঐ দোতালায় সুন্দরী ঐ মেয়েটির ঘরে ঢুকলে কেমন হয়? সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মেয়ে, আছে পর্দার ঘেরাটোপে। তা থাক, আমি তো অশরীরী হয়ে তার ঘরে ঢুকব। দরজা বন্ধ থাক, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকব, নয় তো বা কোনো দেয়ালের ছিদ্রপথে। সিদ্ধায়ের তেজ দেখাতে গিয়ে চন্দ্র ক্রমে-ক্রমে সেই ধনীকন্যাতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ফতুর হয়ে গেল নিঃশেষে। যার জন্যে এত চোটপাট সেই সিদ্ধাইও আর রইল না।

আর গিরিজা? এক দিন শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিজা। কথা বলতে-বলতে কখন এক প্রহর রাত হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। পথে এসে দেখেন বিষম অন্ধকার। ঈশ্বরের কথা বলতে-বলতে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন একটা লণ্ঠন চেয়ে আনতে পর্যন্ত মনে ছিল না। এখন যান কি করে? এক পা হাঁটেন তো হোঁচট খান, দু'পা হাঁটেন তো দিক ভুল হয়ে যায়। কি হল বলো তো—এখন করি কি?

'দাঁড়াও, আমিই আলো দেখাই।'

সিদ্ধাই হয়েছে গিরিজার। সে পিঠের থেকে আলো বের করতে পারে।

কালীবাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়াল গিরিজা। আলোর ছটা বেরুল একটা। সেই ছটায় কালীবাড়ির ফটক পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আলোয়-আলোয় চলে এলেন ঠাকুর।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গিরিজার আর কিছু হল না। লণ্ঠনই হল, সূর্য হল না।

ভবতারিণী ঠাকুরের শরীরে ওদের সিদ্ধাই সব টেনে নিলেন। ওরা মোহমুক্ত হল। মন থেকে অভিমান মুছে ফেলে দীনভাবে বসল আবার যোগাসনে।

ও সকলে আছে কি? ও সব তো বন্ধন। মনকে টেনে রাখে, এগোতে দেয় না। জানিস না সেই এক পয়সার সিদ্ধায়ের গল্প?

দু' ভাই। বড় ভাই সন্নেসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। ছোট ভাই লেখা-পড়া শিখে সংসার-ধর্ম করছে। বারো বছর পর বাড়ি এসেছে সন্নেসী, ছোট ভায়ের জমি-জমা চাষ-বাস কেমন কী হয়েছে তাই দেখতে। ছোট ভাই জিগ্‌গেস করলে, এত দিন যে সন্নেসী হয়ে ফিরলে তোমার কি হল? দেখবি? তবে আয় আমার সঙ্গে। ছোট ভাইকে সন্নেসী নদীর পাড়ে নিয়ে এল। এই দ্যাখ। বলে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল পরপারে। খেয়ার মাঝিকে এক পয়সা দিয়ে নৌকোয় করে ছোট ভাইও নদী পেরোল। বড় ভাই বললে, 'দেখলি? কেমন হেঁটে পেরিয়ে এলুম নদী।' 'আর তুমিও তো দেখলে,' বললে ছোট ভাই, 'আমিও কেমন এক পয়সা দিয়ে দিব্যি নদী পেরোলুম। বারো বছর কষ্ট করে তুমি যা পেয়েছ আমি তা পাই অনায়াসে, মোটে এক পয়সা খরচ করে। তা হলে তোমার ঐ সিদ্ধায়ের দাম এক পয়সা!'

আরেক যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেছে। কাউকে যদি বলে, মর্, অমনি মরে যায়। আর যদি বলে, বাঁচ্, অমনি বেঁচে ওঠে। এক দিন দেখে এক সাধু এক মনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ওহে, অনেকই তো হরি-হরি করলে, কিন্তু পেলে কিছু? কি আর পাব? শুধু তাঁকেই চাই, কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। তাই করুণা ভিক্ষা করেই দিন যাচ্ছে। ও সব পণ্ডশ্রম ছাড়ো। যাতে কিছু একটা পাও তার চেষ্টা দেখ। আচ্ছা মশাই, আপনি কী পেয়েছেন শুনি? শুনবে আর কি। দেখ। কাছেই একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে বললে, মর্। হাতি মরে গেল তক্ষুনি। ফের মরা হাতিকে লক্ষ্য করে বললে, বাঁচ্। অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে হাতি উঠে দাঁড়াল। দেখলে? কি আর দেখলুম বলুন—হাতিটা একবার মলো, আবার বাঁচলো। তাতে আপনার কী এসে গেল? আপনি কি ঐ শক্তিতে নিজের জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ পেলেন?

'শোন্, এই দিকে আয়।' ঠাকুর এক দিন চুপি-চুপি ডাকলেন নরেনকে।

নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীর নির্জনে। বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

নরেন নিস্পন্দ, নির্বাক।

'শোন্, তোকে বলি। আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি আবির্ভূত আছে। কিন্তু ও আমি কোনো দিন প্রয়োগ করিনি, করবও না। তোকে ও-সব দিয়ে দিতে চাই—'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তুই ছাড়া আর কে আছে? তোকে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক ধর্মপ্রচার। তোরই ও-সব দরকার। তুই ছাড়া কারু সাধ্যও নেই এত শক্তি ধারণ করে। বল্, নিবি?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন। বললে, 'ঐ সব শক্তি আমাকে ঈশ্বরলাভে সাহায্য করবে?'

কি ভাবলেন ঠাকুর। বললেন, 'না, তা করবে না।'

'তবে ও-সবে আমার দরকার নেই।' নরেনের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল অনাসক্তির দৃঢ়তা: 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরলাভ হবে না শুধু লোকমান্য হবে তা দিয়ে আমি কী করব?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন প্রসন্ন হয়ে।

এক দিন নরেন নিজেই গিয়ে উপস্থিত হল ঠাকুরের কাছে। তার ধ্যানের ফল কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাই বুঝিয়ে বলতে। খেতে-শুতে-বসতে সব সময়েই ধ্যান করছে নরেন। কাজকর্মের সময়ে মনের কতকটা ভিতরে বসে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

'এ আমার কী হল বলুন তো?'

'কী হল?' ঠাকুর প্রফুল্ল বয়ানে হাসলেন।

'ধ্যান করতে বসে আমি দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি, শুনছি অনেক দূরের শব্দ। দেখছি কোন বাড়িতে বসে কে কি করছে, কে কি বলছে। উঠে-উঠে যাচ্ছি সে-সে বাড়িতে। গিয়ে দেখছি যা দেখেছি আর শুনেছি সব সত্যি। এ আবার কী নতুন খেলা!'

ঠাকুর বললেন, 'এ সব সিদ্ধাই। তোকে ভোলাতে এসেছে। ঈশ্বরলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করতে এসেছে। তুই সিদ্ধাই নিবি কেন? তুই ভগবানকে নিবি। তুই ধ্যান-সিদ্ধ হবি। দিন কতক ধ্যান তুই বন্ধ করে রাখ। তার পরে দেখবি ও-সব আর আসবে না। তুই পথ পাবি—নিত্য কালের এগিয়ে যাবার পথ!'

২৫

তুমি যেমন আমার মা তেমনি আবার তুমি আমার মেয়ে। তুমি যেমন 'পিতেব পুত্রস্য' তেমনি আবার তুমি সন্তান। তোমার রসের কি আর শেষ আছে? তুমি যেমন ভক্তিতে আছ প্রেমে আছ তেমনি আছ আবার বাৎসল্যে। শীতল স্নেহরসে। তুমি গুরুর চেয়েও গরীয়ান। তুমি বিশ্বচরাচরের পিতা। তুমি গুহাহিতং, গহ্বরেষ্ঠং। আবার তুমি বুকে-জড়ানো ছোট্ট অপোগণ্ড শিশু। অবোলা দুধের ছেলে।

'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো বা ভাজায়।'

আমার নিত্য-নতুন আস্বাদন। তিনি যে রসের অপার পারাবার। রসো বৈ সঃ। তাই রামকে সেবা করবার জন্যে হনুমান সাজি। আবার তাকে স্নেহ করবার জন্যে সাজি কৌশল্যা।

ভক্তের যেমন ভগবান চাই ভগবানেরও তেমনি ভক্ত ছাড়া চলে না। ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। তেমনি ভগবান হন পদ্ম, ভক্ত হন অলি। ভক্ত পদ্মের মধু খান। ভগবান নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যেই দু'টি হয়েছেন। প্রভু আর দাস। মা আর ছেলে। প্রিয় আর প্রিয়া।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অনেক সব সাধু-সন্নেসীর আনাগোনা বেড়েছে। পেট-বোরেগীর দল নয়, বেশ উঁচু-থাকের লোকজন। হয়তো গঙ্গাসাগরে চলেছে নয়তো পুরী—মাঝখানে ক'টা দিন দক্ষিণেশ্বরে ডেরা করে যাচ্ছে। স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছে গদাধরকে। সর্বতীর্থসারকে।

গদাধর কোথাও নড়ে না। সে স্থির হয়ে বসে আপন-মনে গান গায়:

'আপনাতে আপনি থেকো
যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চা'বি তাই বসে পাবি
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥'

এক দিন এক অদ্ভুত সাধু এসে হাজির। সঙ্গে জল খাবার একটা ঘটি আর একখানা পুঁথি। সেই পুঁথিই তার একমাত্র বিত্ত। রোজ ফুল দিয়ে তাকে পুজো করে, আর সময় নেই অসময় নেই থেকে-থেকে তাই পড়ে একমনে।

'কি আছে তোমার বইয়ে? দেখতে পারি?' গদাধর এক দিন তাকে চেপে ধরল। দেখল সে বই। বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড়-বড় অক্ষরে দু'টি মাত্র শব্দ লেখা: ওঁ রাম! আর কিছু নয়, আর কোনো কথা নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু ঐ একই পুনরাবৃত্তি।

'কী হবে এক গাদা বই পড়ে? আর, কথাই বা আর আছে কী?' বললে সেই বাবাজী: 'ঈশ্বরই সমস্ত বেদ-পুরাণের মূল, আর, তাঁতে আর তাঁর নামেতে কোনোই তফাত নেই। তাঁর একটি নামেই সমস্ত শাস্ত্র ঘুমিয়ে আছে। কি হবে আর শাস্ত্র ঘেঁটে? ঐ একটি রাম-নামেই প্রাণারাম।'

এ সাধু বৈষ্ণবদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক। তেমনি আমাদের জটাধারী। গদাধরের তন্ত্রসিদ্ধ হবার পর ১২৭৯ সালে চলে এসেছে ঘুরতে-ঘুরতে। সঙ্গে অষ্টধাতুর তৈরি বালক রামচন্দ্রের বিগ্রহ। আদরের নাম রামলালা।

আর কিছুই ধ্যানজ্ঞান নেই জটাধারীর। অষ্টপ্রহর তাকে নিয়েই মেতে আছে। যেখানে যাচ্ছে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া নেই। যা পায় ভিক্ষে করে তাই রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায় রামলালাকে। শুধু নিয়ম রক্ষার নিবেদন নয়। জটাধারী দস্তুরমত দেখে, রামলালা খাচ্ছে, শুধু খাচ্ছে না চেয়ে নিচ্ছে, বায়না করছে।

মনে-মনে স্বপ্ন দেখছে না জটাধারী, প্রসারিত চোখের উপরে দেখছে প্রত্যক্ষ। তার রামলালা মূর্তি নয়, মানুষ। বালগোপাল।

আর সারাক্ষণ বসে-বসে তাই দেখছে গদাধর।

কয়েক দিনেই, কি আশ্চর্য, তারই উপর রামলালার টান পড়ল। জটাধারীর কাছে যতক্ষণ বসে আছে ততক্ষণ রামলালা ঠিকই আছে, আপন মনে খেলাধুলো করছে। কিন্তু যেই গদাধর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় অমনি রামলালা তার পিছু নেয়।

'কি রে, তুই আমার সঙ্গে চলেছিস কোথা?' ধমকে ওঠে গদাধর : 'তোর নিজের লোকের কাছে, জটাধারীর কাছে, ফিরে যা।' কথা কানেই তোলে না। নাচ শুরু করে রামলালা। কখনো আগে-আগে কখনো পিছে-পিছে নাচতে-নাচতে সঙ্গে চলে।

মাথার খেয়ালে ধাঁধা দেখছে না কি গদাধর? নইলে জটাধারীর পূজা-করা চিরকেলে ঠাকুর, সে জটাধারীকে ফেলে গদাধরের সঙ্গ নেবে কেন? প্রাণে-মনে কী নিবিড় নিষ্ঠায় জটাধারী তাকে সেবা করছে। সেই জটাধারীর চেয়ে গদাধর তার বেশি আপন হল? কিন্তু রামলালা যদি ধাঁধা হয় তবে চোখের সামনে এই গাছ-পালা বাড়ি-ঘর লোক-জন সবই ধাঁধা।

এই দেখ! দু' হাত তুলে কোলে ওঠবার জন্যে আবদার করছে রামলালা।

উপায় নেই। সত্যি-সত্যি কোলে নিতে হয় গদাধরকে।

তার পর এক দিন হয়তো চুপচাপ কোলে বসে আছে, হঠাৎ খেয়াল ধরল, এক্ষুনি কোল থেকে নেমে যাবে। ছুটোছুটি করবে রোদ্দুরে, নয়তো ফুল তুলবে গিয়ে কাঁটা বনে, নয় তো গঙ্গায় নেমে হুটোপুটি করবে।

ছেলের সে কি দুরন্তপনা! কিছুতেই বারণ শুনবে না। ওরে যাসনি, রোদ্দুরে পায়ে ফোস্কা পড়বে, হাতে-পায়ে কাঁটা ফুটবে, সর্দি হবে ঠান্ডা লেগে। কে কার কথা শোনে! দূরে দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসে রামলালা, কখনো বা ঠোঁট ফুলিয়ে দিব্যি মুখ ভেঙচায়।

'তবে রে পাজি রোস, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' দৌড়ে তার পিছু নেয় গদাধর। জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামলাল। গদাধরও নাছোড়বান্দা। জল থেকে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে। এটা-সেটা দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। বলে, ঘরের মধ্যে খেলা কর্, বাইরে কেন? তবুও যদি কথা সে না শোনে, দুষ্টুমি না থামায়, সটান চড়-চাপড় বসিয়ে দেয় গদাধর।

সুন্দর ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে জল-ভরা টলটলে চোখে চেয়ে থাকে রামলালা।

তখন আবার গদাধরের কষ্ট। তখন আবার বুকের মধ্যে মোচড় খাওয়া। তখন আবার তাকে কোলে নাও, আদর করো, মিষ্টি-মিষ্টি বুলি শোনাও।

ভাবের ঘোরে ছায়াবাজি দেখছে না গদাধর, দেখছে অবিকল রক্তে-মাংসে। তার নিজের ব্যবহারেও সেই অবিকল বাস্তবতা।

একদিন নাইতে যাচ্ছে গদাধর, রামলালা বায়না ধরল সেও যাবে। বেশ তো চল্, দোষ কি। কিন্তু সবাইর নাওয়া শেষ হয়, ওর হয় না। কিছুতেই উঠবে না জল থেকে। যত বলো, কানও পাতে না। শেষকালে চটে গিয়ে গদাধর তাকে জলের মধ্যে

চুবিয়ে ধরল। বললে, নে, তোর যত খুশি জল ঘাঁট্। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! গদাধর লক্ষ্য করল জলের মধ্যে রামলালা শিউরে উঠছে। তখন তাড়াতাড়ি হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে রামলালাকে বুকে তুলে নিয়ে পাড়ে উঠে এল গদাধর।

আরেক দিন কি আখখুটেপনা করছে রামলালা। তাকে ভোলাবার জন্যে গদাধর তাকে ক'টি খই খেতে দিল। দেখেনি, খইয়ের মধ্যে ধান ছিল আটকে। এখন দেখে, খই খেতে ধানের তুষ লেগে রামলালার নরম জিভ চিরে গেছে। কষ্টে বুক ফেটে গেল গদাধরের। রামলালাকে কোলে নিয়ে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। যে মুখে লাগবে বলে ননী-সর-ক্ষীরও মা কৌশল্যা অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, সে-মুখে সে তুলে দিলে কি না ধানশুদ্ধ খই! তার এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

গদাধর আকুল হয়ে কাঁদে। তার কোলে রামলালাকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই দেখে তার এই কান্নার আন্তরিকতা। শোনে তার এই কান্নার কাতরিমা। যে দেখে যে শোনে তারই চোখে জল আসে।

রান্না হয়ে গেছে, জটাধারী খুঁজছে রামলালাকে। ওরে খাবি আয়, কোথায় রামলালা! খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখে গদাধরের ঘরে গদাধরের সঙ্গে খেলা করছে।

অভিমান হল জটাধারীর। বললে, 'বেশ ছেলে তুমি! আমি সব রেঁধে-বেড়ে রেখে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে খেলা করছ!'

সে-অভিমান বেদনায় গলে পড়ল : 'জানি না? তোমার ধরনই ঐ রকম। দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই। বাবা-মাকে ছেড়ে দিব্যি বনে গেলে, বাবা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল তবু একবার তাকে দেখা দিলে না! এমনি তুমি পাষাণ!' বলে জোর করে ধরে নিয়ে গেল রামলালাকে।

কিন্তু গা-জুরি করে কত দিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? ঘুরে-ঘুরেই আবার ফিরে আসে গদাধরের কাছে। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে জটাধারীর আর যাওয়া হয় না—কি করে যায়? রামলালা যে ছাড়তে চায় না গদাধরকে। আর রামলালাকেই বা জটাধারী কি করে ছাড়ে?

প্রেমাস্পদের চেয়েও প্রেম বড়—শেষ পর্যন্ত বুঝল তাই জটাধারী। সজল চোখে এক দিন তাই দাঁড়াল এসে গদাধরের দোরগোড়ায়। বললে, 'আমি আজ চলে যাব।'

'যাবে?' চমকে উঠল গদাধর : 'তোমার রামলালা?'

'সে এখান থেকে কিছুতেই যাবে না। তাকে তাই তোমার কাছে রেখে যাব।'

'রেখে যাবে?' খুশিতে উছলে উঠল গদাধর।

'হ্যাঁ, তাইতেই ওর আনন্দ। ও আজকে আমাকে আমার মনোমত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, বলেছে এখান থেকে ও নড়বে না এক পা। তাই একা-একা আমিই চলে যাচ্ছি। ও তোমার কাছে আছে, তোমার সঙ্গে খেলাধুলো করছে এই ভেবেই আমার সুখ। ও সুখে আছে এই ধ্যানই আমার শান্তি। ওর যাতে আনন্দ তাইতে আমারও আনন্দ। তাই তোমার কাছেই রইল আমার রামলালা।'

রামলালাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে রিক্ত হাতে চলে গেল জটাধারী।

সে এমন প্রেমের সন্ধান পেয়েছে, যে প্রেমে স্বার্থবোধ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই,

বেদনাও নেই। যে প্রেমে পরম পূর্ণতা। যে প্রেম সকল ভাবের বড়—মহাভাব।
পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়। মহাভাবই প্রেম। আর প্রেমও যা ঈশ্বরও তাই।
একটি ধাতব মূর্তি এই রামলালা। তাই সবাই দেখত চর্মচোখে। সবারই কাছে সে শুষ্ক প্রতীক; গদাধরের কাছে পূর্ণ প্রাণবান। এর আগে রঘুবীরকে সে প্রভুরূপেই আরাধনা করে এসেছে, জটাধারীই তাকে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিল তার বালকমূর্তি। যিনি প্রভু যিনি আরাধনীয়, তিনিই আবার শিশু, আদরণীয়। সম্পর্ক শুধু একটা সেতু। সেই সেতু ধরে চলে আসতে হবে এ পার থেকে ও-পারে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে, মূর্তি থেকে ব্যাপ্তিতে, বিশ্বময়তায়। যে বাইরের দুর্লভ নিধি তাকে নিয়ে আসতে হবে অন্তরে, অন্তরের অন্দরমহলে—আর যে অন্তরের ধন তাকে দেখতে হবে বাইরে এনে, সর্ব জীবে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিতে। সম্পর্ক থেকে চলে আসতে হবে বিরাট বন্ধনহীনতায়।
'মধুর ভাবসাধনের এই তো আসল তাৎপর্য।' বললে ভৈরবী।
'যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা। ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সবসে নেয়ারা॥'
রাম শুধু দশরথের ছেলে নয়, সে সমস্ত জীবদেহে প্রকাশিত। আবার অমনি প্রকাশিত হয়েও জগতের সব কিছুর থেকে সে পৃথক, মায়াহীন, নির্গুণ।
ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বানুভূ। তিনি যেমন ঘটে তেমনি আকাশে। স্থানে কোথাও তাঁর বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তাঁর বিরাম নেই, পাত্রে কোথাও তাঁর বিভেদ নেই। তবু আবার তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অতীত।
তাঁর অসীম ক্ষমতা, অনন্ত ঐশ্বর্য, অসামান্য প্রতাপ। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সত্য পরিচয় কোথায়? তিনি সুন্দর, তিনি সরস, তিনি মধুর। তিনি আনন্দ-আকর।

২৬

বাৎসল্য রসের সাধনায় বসে গদাধরের অনুভব হল সে স্ত্রীলোক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত স্ত্রীলোকে সে যে মা দেখছে সেই এখন সে-মা। মা কৌশল্যা। অন্তরে বিগলিত স্নেহ, অঙ্গে করুণার্দ্র কোমলতা।
স্নিগ্ধ থেকে চলে এল সে মধুরে। ধরল সে নারীর আরেক রূপ। সম্পর্কের আরেক

সেতু। সাধনের আরেক সোপান। সে এখন প্রিয়া, প্রেমিকা, প্রেমোৎসুকা। সে এখন কৃষ্ণকামিনী গোপাঙ্গনা।

কে বলবে সে মেয়ে নয়! বেশ-বাস সব কিনে দিয়েছেন মথুরবাবু। শাড়ি-ঘাগরা ওড়না-কাঁচুলি থেকে শুরু করে মাথার পরচুলা পর্যন্ত। গায়ে এক সুট সোনার গয়না, পায়ে রুপোর নূপুর। শুধু তাই? চলনে-বলনে চেষ্টায়-কটাক্ষে ভঙ্গে-রঙ্গে সে একেবারে হুবহু মেয়ে। সে সখী, সে দাসী, সে সেবিকা।

দুর্গা পূজার সময় জানবাজারে এসেছে গদাধর মথুরবাবুদের বাড়িতে। গদাধরের আনন্দের অন্ত নেই। সে মা'র দাসী সেজেছে। শুধু মনে-মনে নয়, বেশে-বাসে ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে। অন্তরের এক জন হয়ে মিশে গিয়েছে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে।

কিন্তু সন্ধ্যায় যখন মা'র আরতি হবে তখন গদাধর কোথায়? মথুরবাবুর স্ত্রী, জগদম্বা, খুঁজতে এসে দেখেন গদাধর সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। সখীরূপে সমাধিস্থ। তাকে ঐ অবস্থায় ফেলে কি করে যান তিনি আরতি দেখতে? ভাবে বিহ্বল হয়ে কোথাও পড়ে-টড়ে যান কি না ঠিক নেই। কিছু কাল আগেই এ বাড়িতে অমনি টলে পড়ে গিয়েছিলেন। আর কোথাও নয়, একেবারে গুলের আগুনের মধ্যে। কী করবেন তা হলে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল জগদম্বার। জগদম্বা তাঁর দামী-দামী গয়না-গাঁটি নিয়ে এলেন। একের পর এক পরিয়ে দিতে লাগলেন গদাধরকে। কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলেন, 'মা'র এখন আরতি হবে। চলো, মাকে চামর করবে না?' মা'র নামে ধ্যান ভাঙল গদাধরের। দ্রুত পায়ে চলল সে ঠাকুর-দালানের দিকে। সেও পৌঁচেছে অমনি আরতি আরম্ভ হল। আর-আর মেয়েদের সঙ্গে সেও চামর দোলাতে লাগল।

দু' লাইনে ভাগ হয়ে সবিস্ময়ে আরতি দেখছে সব মেয়ে-পুরুষ। কিন্তু মথুরবাবুর বিস্ময়েরই আর শেষ নেই। তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে চামর করছে আরেক জন যে স্ত্রীলোক, সে কে? কার স্ত্রী? এত আশ্চর্য সাজ, আশ্চর্য রূপ—সে কোন ঘরের ঘরণী? তাঁর স্ত্রীর বন্ধুদের মধ্যে এত সুন্দরী কেউ আছে না কি?

আরতির শেষে স্ত্রীকে জিগগেস করলেন মথুরবাবু, 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তখন কে চামর করছিল? বাড়ি কোথায়? কার স্ত্রী?'

'ওমা, তুমি চিনতে পারোনি? উনি বাবা, আমাদের ঠাকুর গদাধর।'

মূক হয়ে গেলেন মথুরবাবু। আশ্চর্য, এত যে কাছের মানুষ, দিন-রাত একসঙ্গে থেকেও তাকে চেনা যায় না!

হৃদয়কে এক দিন অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। মেয়েদের মধ্যে মেয়ে সেজে বসে আছে গদাধর। মথুরবাবু জিগগেস করলেন, 'বলো দেখি ওই মেয়েদের মধ্যে তোমার মামা কোনটি?' অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারল না হৃদয়।

ভৈরবী বললে, 'আমি চিনিয়ে দিতে পারি। যে রাধারানির মত দেখতে সেই আমাদের গদাধর। গদাধর যখন সকালে ফুল তুলত দক্ষিণেশ্বরে, কত দিন ওকে আমার রাধারানি বলে ভুল হয়েছে।'

গোপিনীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী। গোপিনীরা তারই পুজো করে আর

কৃষ্ণ-বর ভিক্ষে চায়। গদাধরও তাই ভবতারিণীর কাছে গিয়েই সর্বাগ্রে প্রার্থনা করল। মা গো, তোর শক্তিবলে সেই মধুরকে এনে দে। তুই শ্যামা, তুই-ই আবার শ্যাম হ। কিন্তু সেই মধুরের যে সর্বস্বত্বাধিকারিণী, সেই মহাভাবভাবিনী রাধারানিকে তুষ্ট না করলে চলবে কেন? রাধারানির কৃপা না হলে হবে না কৃষ্ণদর্শন।

রাধারানির জন্যে ধ্যানে বসল গদাধর। নিত্য স্মরণ-মনন করতে লাগল সেই অকাম-প্রেমমূর্তির। আকুল আবেগে অবিরাম বলতে লাগল তাকে : আমাকে দেখা দাও। আমি তোমারই সখী, তোমারই সঙ্গিনী। আমাকে বঞ্চনা কোরো না। অদর্শনের বিরহ যে কি তা তো তুমি জানো—

রাধারানি দেখা দিল। নাগকেশরের মত গায়ের রঙ। সে এক গৌরগৌরবোজ্জ্বল মূর্তি। সে মূর্তি ধীরে-ধীরে এসে মিলিয়ে গেল গদাধরের শরীরে। গদাধর রাধারানি হয়ে গেল।

যা রাধা তাই ধারা। যা ধারা তাই রাধা।

কেঁদে অকুল হচ্ছে শ্রীমতী। ওলো, আমার কৃষ্ণকে এনে দে। না এনে দিবি তো আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দিন গুণতে-গুণতে নখের ছন্দ ক্ষয় হয়ে গেল—আমার সেই কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হল কই? সেই কৃষ্ণ মেঘকে কবে দেখতে পাব? আর দেখবই বা কি দিয়ে? মোটে দু'টি মাত্র তো চোখ—তায় তাতে আবার নিমিখ, তাতে আবার বারিধারা। ওলো নিমিখে নিমিখ নাহি সয়। আমি দেখব কি করে?

সুচির-বিরহের নায়িকা। নিরুপাধি প্রেম, অথচ অনির্বেয় বিরহ। এত যেখানে যন্ত্রণা, সেখানে তাকে ভুলে থাকলেই তো হয়! হায়-হায়, তাকে ভুলব কি করে? যখন জল-আহরণে যাই, তখন যমুনা দেখি। যদি গৃহে থাকি, দূরে দেখি সেই গিরি-গোবর্ধন। যদি বনে যাই দেখি সেই কুঞ্জকুটির। শুনি সেই বেণুধ্বনি। তাকে ভুলব কি করে? তাকে বাইরে পাই না বলে অন্তরে অনুসন্ধান করি। সেইখানেই তাকে দেখি, শুনি, ছুঁই, আঘ্রাণ করি। সেই তো আমার মানস-সাক্ষাৎকার। আমার মানস-মহোৎসব। বল্ সই, যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁর সঙ্গে কি সর্বাংশে বিরহ হতে পারে?

তবু, কেন, কেন এই বিরহ? যাকে অন্তরে পাই তাকে বাইরে পাব না কেন? যে নিরাধার সে কেন হবে না আধারভূত? কেন দাঁড়াবে না এসে চোখের সামনে?

ওলো, শুনেছিস, তাকে গভীর-নিবিড় করে পাব বলেই নাকি এই বিরহ। বিরহই হচ্ছে প্রেমরূপা ভাবনা। প্রেমরূপা জীবিকা। মিলনে মন প্রিয়তমে অভিনিবিষ্ট হতে চায় না; সে কেবল এক লীলা ছেড়ে আরেক লীলার সন্ধান করে, এক বিলাস ছেড়ে আরেক বিলাস। কিন্তু বিরহে সমস্ত সৃষ্টিই যে তদ্গত-সমাহিত। মিলনে সে সংক্ষিপ্ত, বিরহে পরিব্যাপ্ত। মিলনে আমি একা, বিরহে ত্রিভুবন আমার সহচর। তাই তো কৃষ্ণ বললেন গোপিনীদের, আমাকে কাছে পেয়ে যত স্বাদ তার চেয়ে বেশি স্বাদ আমাকে ধ্যান করে। মধুধারার মতই এই ধ্যানধারা।

প্রেমের মত আছে কি! এই বিশ্বসংসার ভগবানের অধীন, কিন্তু ভগবান প্রেমের অধীন। সর্বস্বাধীন ভগবান প্রেমের কামনায় ভক্তের দুয়ারে এসে হাত পাতেন।

তিনি তো আপ্তকাম, তাঁর কি কিছু অভাব আছে? তবে তিনি ভক্তের কাছে প্রেম ভিক্ষা চান কেন? চান, এ তাঁর অভাব বলে নয়, এ তাঁর স্বভাব বলে।

প্রেমই পুরুষার্থ। বাইরে বিষজ্বালা, ভিতরে অমৃতময়। শীতও আছে আবার আচ্ছাদনও আছে। আচ্ছাদন আছে বলে শীত সুখকর, আবার শীত আছে বলে আচ্ছাদন আরামপ্রদ। তেমনি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বিরহ আনন্দময়, আবার বিরহের উৎকণ্ঠায় মিলনও আনন্দময়। তবু মিলনের চেয়ে বিরহ অধিকতর। মিলনে শুধু সঙ্গ, বিরহে যেমন স্মৃতি তেমনি আবার আশা। প্রথমে যদি বা দুঃখ, পরিপাকে আনন্দ। আর সেই আনন্দই পরাকাষ্ঠা। গদাধর এখন সেই আনন্দময়ী বিরহিণী।

প্রেমের যে এই আনন্দ, এ কি ভক্তের নিজের আস্বাদের জন্যে? না গো না, এ ভগবানের আস্বাদের জন্যে। এ রস তত মিঠা যত এর জ্বাল বেশি। এতে যত আর্তি তত আপ্তি।

চার রকম প্রেম। এক দিক থেকে ভালোবাসা, তার নাম একাঙ্গী। তার মানে এক পক্ষ চায়, অন্য পক্ষ গ্রাহ্যও করে না। যেমন হাঁস আর জল। হাঁস জলকে ভালোবাসে, জল হাঁসকে চায় না। আরেক রকম প্রেম আছে, তার নাম সাধারণী, যেখানে শুধু নিজের সুখ চায়। তুমি সুখী হও বা না হও, বয়ে গেল। এখানে নায়িকা শুধু আত্মসুখের জন্যে নায়ককে প্রিয়জ্ঞান করে। যেমন চন্দ্রাবলী। তৃতীয় হচ্ছে সমঞ্জসা। সমান-সমান। আমারও সুখ হোক তোমারও সুখ হোক। নায়কের সুখ চাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের সুখের দিকে সমান লক্ষ্য। সর্বশেষ, বা, সর্ব-উচ্চ প্রেমের নাম সমর্থা। আত্মসুখ চাই না, শুধু তোমার সুখ হোক। আমার যাই হোক না-হোক, তুমি সুখে থাকো। এই হচ্ছে শ্রীমতীর ভাব। শ্রীমতীর তাই সমর্থা রতি। শুধু কৃষ্ণ সুখে সুখী। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা। কৃষ্ণময়ী বলেই তো সে শ্রীমতী। মূর্তিময়ী মাধুরী। তোমাকে সব দেব। কুল আর শীল, ধৈর্য আর লজ্জা, দেহ আর আত্মা, ইহকাল আর পরকাল। কিছু চাই না বিনিময়ে। আমার প্রেম ধর্মাধর্মের অতীত। ধর্মের অতীত, কেননা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ নেই। অধর্মেরও অতীত, কেননা আমি তোমারই স্বরূপশক্তি। তাই, 'যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।' আমি ছাড়া তুমি নেই। আবার তুমি ছাড়াও আমি নেই। আর সকল সম্বন্ধে একে-একে দুই, শুধু প্রেমেই দুইয়ে মিলে এক।

কে বলবে গদাধর রাধিকা নয়? রূপ যেন ফেটে পড়ছে। শুধু বেশবাসে বা হাব-ভাবে নয়, মহাভাবে। রাধিকার মতই সে জয়শ্রীমূর্তিধারিণী। তার দেহ যেন অমৃতবর্তিকা। কিন্তু যতই কেননা রূপ দেখছ, সব সেই কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া। 'তোমার গরবে গরবিণী আমি, রূপসী তোমার রূপে।'

মনই শরীরকে তৈরি করে। মনে যেমন ভাব মুখে তেমনি আভা। হনুমানের ভাবে থেকে ল্যাজের সূচনা হয়েছিল গদাধরের। এখন স্ত্রী-ভাবে থেকে তার রোমকূপ থেকে নিয়মিত সময়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল।

পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বললেন, 'এ সব উপলব্ধি বেদ-পুরাণকে ছাড়িয়ে গেছে।'

সে কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল না, প্রথম কৈশোরে মনে-মনে আক্ষেপ করেছে গদাধর। মেয়ে হলে গোপিনীদের মত দিব্যি ভজনা করতে পারত কৃষ্ণকে। এক দিন তাকে পেয়েও যেত শেষ পর্যন্ত। এই পুরুষদেহটাই তার সে সাধনার বাধা। যদি আরেক বার জন্ম নিতে হয়, সে ঠিক মেয়ে হয়ে জন্মাবে। ব্রাহ্মণের ঘরের সুন্দরী বাল-বিধবা হয়ে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে পতি বলে জানবে না। ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে সে থাকবে আর থাকবে তার দূর সম্পর্কের বুড়ো পিসি বা মাসি। ঘরের পাশে সামান্য একটু জমি, তাতে শাক-সব্জি ফলাবে। দিন গুজরাবে চরকা কেটে। গোয়ালে থাকবে একটি গরু, দুধ দুইবে নিজের হাতে। সেই দুধে ক্ষীর-সর করে গলা ছেড়ে কাঁদতে বসবে। ওরে আমার কৃষ্ণ, খাবি আয়। তোকে নিজের হাতে খাওয়াব বলে এ সব করেছি আমি, বসে আছি কখন থেকে। এত সেবা এত কান্না—সে কি নিষ্ফল হতে পারে? কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে এসে দেখা দেবে, তার হাতের থেকে খেয়ে যাবে চুপি-চুপি। এমনি এক-আধ দিন নয়, প্রত্যহ।

কিশোর কালের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু এখন, সাধনার আরো উচ্চ ভূমিতে এসে গদাধরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হল। আর, ভগবানের ভাবই হচ্ছে এই মধুর ভাব। এই ঘনানন্দময় মধুর ভাবেই তাঁর মতি, রতি, অবস্থিতি। এই মধুর ভাবের সাধনায় শেষ শিখরে এসে গদাধর দেখলে, ঘাস থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত কৃষ্ণ। এমন কি, সে নিজেও বাসুদেব। যে রাধা সেই মাধব। কৃষ্ণই দুই অংশে সমান ভাবে বিভক্ত হয়েছেন—প্রিয় আর প্রিয়া, ভগবত্তা আর ভক্তি।

মাটির থেকে একটা ঘাসফুল ছিঁড়লেন ঠাকুর। বললেন ভক্তদের, 'তখন যে কৃষ্ণমূর্তি দেখতাম, এই রকম তার গায়ের রঙ।' সামান্য ঘাসফুলেও তাঁর লাবণ্যলিখন।

ভাগবত পাঠ শুনছে গদাধর। হঠাৎ জ্যোতির্ময়মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখল সামনে। দেখল তাঁর পা থেকে জ্যোতির একটা ছটা বেরিয়ে এসে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করলে, পরে এসে লাগল তার নিজের বুকে। এর তাৎপর্য কি? বুঝতে দেরি হল না। ভাগবত, ভক্ত আর ভগবান এক। একেই তিন, তিনেই এক।

২৭

ও কে স্নান করছে রে গঙ্গায়? কালী-মন্দিরে পূর্বমুখ হয়ে ধ্যান করছে গদাধর, তার মনশ্চক্ষে এক সন্ন্যাসীর মূর্তি ভেসে উঠল। নাগা সন্ন্যাসী। কটিতে একটা

কৌপীন পর্যন্ত নেই। মাথায় দীর্ঘ জটা, তেজঃপুঞ্জ কলেবর। গঙ্গায় নেমে স্নান করছে।

ধ্যানে এ সে কী দেখল? গদাধর চলল ঘাটের দিকে।

ঠিকই দেখেছে। দীর্ঘকায় জটাজুটধারী উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী তার সামনে এসে দাঁড়াল। দহনোত্তীর্ণ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল।

'আরে, এই তো পাওয়া গেছে যোগ্য লোক।' গদাধরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সন্ন্যাসী। বললে, 'সাধন-ভজন কিছু করবে?'

গদাধর তো অবাক। কিসের সাধন-ভজন?

'ভাবাতীত অরূপের সাধন। বেদান্তসাধন। যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। করবে?'

'তার আমি কী জানি!'

'তুমি কী জানো মানে? তবে কে জানে?'

'আমার মা জানে।'

'কে তোমার মা?'

মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করল গদাধর। বললে, 'ঐ পাষাণময়ীই আমার মা।'

বিদ্রূপের সূক্ষ্ম একটু হাসি খেলে গেল সন্ন্যাসীর মুখে। ও তো একটা মূর্তি, একটা পুত্তলিকা। ও আবার মা হয় কি করে? ঈশ্বর এক, সত্য। দেবদেবী সব ভ্রম। মুখের উপর কিছু বলল না স্পষ্ট করে। বললে, 'বেশ, যাও, তোমার মাকে জিগগেস করে এস। শোনো, বেশি যেন দেরি করে ফেলো না। বড় জোর তিন দিন এখানে থাকব। তিন দিনের বেশি থাকি না কোথাও এক দণ্ড। এরি মধ্যে দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

গদাধর কতক্ষণ তাকিয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। বললে, 'আচ্ছা, আপনি কি তোতাপুরী?'

'কি আশ্চর্য! তুমি আমার নাম জানলে কি করে?'

হ্যাঁ, আমি তোতাপুরী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় আমার মঠ ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সাধনা করেছি। নর্মদাতীরে দুশ্চর তপস্যায় নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে আমার। হয়েছে ব্রহ্মসাক্ষাৎ। ব্রহ্মজ্ঞ হবার পর তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি। গঙ্গাসাগর আর শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে আমি এসেছি দক্ষিণেশ্বরে। মাত্র তিন দিনের জন্যে। আমি শক্তি-ভক্তি মানি না। আমি আছি বিশুষ্ক জ্ঞানের কাণ্ডে। আমি বেদান্তবাদী। আমার নিরাকার ব্রহ্মসাধনা।

গদাধর চলে এল ভবতারিণীর দুয়ারে। বললে, 'মা, তোতাপুরী বলছে নিরাকার সাধনা করতে। করব?'

'করবে বৈ কি।' আদেশ হল মা'র। 'তোমাকে শেখাবার জন্যেই সে এসেছে।'

কিন্তু বামনির বড় আপত্তি। সে বলে, ওই ন্যাংটার কাছে তুমি ঘেঁষো না। ও তোমার সমস্ত ভাব-টাব নষ্ট করে দিয়ে শুকনো দড়ি বানিয়ে ছাড়বে।

বানাক না। ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে এসেছি। এবার ভাবাতীত অদ্বৈতভূমিটা বেড়িয়ে আসি একবার।

মেয়েরা তত দিনই পুতুল খেলে, যত দিন তাদের বিয়ে না হয়। বিয়ে হয়ে যখন স্বামী পায় তখন পুতুলগুলি প্যাঁটরায় পুঁটলি বেঁধে তুলে রাখে। তেমনি ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমার দরকার হয় না।
সাকার-নিরাকার দুই-ই লাগে। কেউ সাকার থেকে নিরাকারে আসে। কেউ নিরাকার থেকে সাকারে। রসুনচৌকিতে দুই-ই লাগে। পোঁও লাগে, সানাইও লাগে। পোঁ-এর শুধু এক সুর—সে যেন নিরাকার। আর সানাইয়ে বাজছে কত রাগ-রাগিণী। ঈশ্বরকে নানা ভাবে সম্ভোগ।
তা ছাড়া, মা'র আদেশ হয়েছে। গদাধর সটান চলে এল তোতার কাছে। বললে, 'হ্যাঁ, মা মত দিয়েছে। দীক্ষা নেব। আমাকে চেলা করুন আপনার।'
'গুরু মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক।' উল্লসিত হয়ে উঠল তোতা। বললে, 'প্রথমে শিখা-সূত্র ত্যাগ করে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস নিতে হবে তোমাকে।'
'নেব। কিন্তু গোপনে।'
'গোপনে কেন?'
'বছর খানেক হল আমার মা এখানে এসে রয়েছেন। এ মা আমার গর্ভধারিণী মা। সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে যদি পাকাপাকি ভাবে সন্ন্যাস নিই, আর মা যদি জানতে পারেন তবে বড় আঘাত পাবেন।'
এ হচ্ছে বারশো একাত্তর সালের কথা। বছর খানেক আগে থেকেই এখানে আছেন চন্দ্রমণি। যে সংসারে গদাধর নেই সে সংসার তাঁর কাছে অসার। তাই তিনি বাকি জীবন গদাধরের কাছেই কাটিয়ে দিতে চান গঙ্গাতীরে। আছেন নহবৎখানায়। গদাধরকে দেখতে পাচ্ছেন চোখের উপর—এর বেশি আর কিছু তাঁর চাইবার নেই।
মথুরবাবু এমনিতে খুব হাত-টান, অথচ গদাধরের বেলায়, কেন কে জানে, তাঁর উদারতার অন্ত নেই। সে উদারতা চন্দ্রমণির দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এল। একদিন মথুরবাবু বললেন, 'আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে?'
'আমার অভাব কোথায়?' হাসলেন চন্দ্রমণি।
'তবু কিছু নাও না চেয়ে। যা তোমার খুশি।'
'কি চাইব? চাইবার আমার কি আছে! খাবার-পরবার এতটুকু কষ্টও তো তুমি রাখোনি।'
তবু মথুরবাবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমার বুঝি কিছু দিতে ইচ্ছে করে না তোমাকে? যা মন চায় একটা কিছু নাও না।
যার গদাধর আছে তার আবার চাইবার আছে কি? তবু মথুরবাবুর পীড়াপীড়িতে কিছু একটা না চেয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি নেহাত দেবেই তবে আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও।'
এমন নির্লোভ মা না হলে এমন নিষ্কাম ছেলে হয়! সেই মা যদি টের পান ছেলে সমস্ত সংসার-সম্পর্ক ঘুচিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে তবে সইবেন কি করে?
তোতাপুরী বললে, 'বেশ, গোপনেই দীক্ষা দেব। কেউ জানতে পাবে না।'
সর্বাগ্রে নিজের প্রেত-পিণ্ড দাও। শ্রাদ্ধাদি করে সংযত হয়ে অবস্থান করো।

পঞ্চবটীর সাধন-কুটিরে জড়ো করো সব উপচার। শুভ-মুহূর্তের উদয় হলে খবর দেব।
এল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত। সপ্ত শিখা মেলে জ্বলে উঠল হোমাগ্নি।
সম্যক প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এ সর্বস্বত্যাগ ঈশ্বরার্থে। কিন্তু কী তোমার আছে যে ত্যাগ করবে? দেহ-মন-ইন্দ্রিয় কিছুই তোমার আপনার নয়। যার নিজের বলতে কিছু নেই, সে ত্যাগ করবে কী?
তাই ত্যাগ করবার জন্যে অর্জন দরকার। আগে অর্জন কর—অর্জন কর আত্মবিভূতি। সকল জগৎকে আত্মবোধে প্রাণময় করে তোলো। এই বিশ্বরূপকে নিজের রূপ বলে অনুভব করো। সেই অনন্ত অনুভূতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দাও। এই-ই ত্যাগ, এই-ই সন্ন্যাস। যার সেই ঐশ্বর্য নেই বিভূতি নেই, সে ত্যাগ করবে কী? সে তো দীনহীন ভিক্ষুক।
কী যে প্রার্থনীয় তাই মানুষ জানে না, তাই ধন-জন কাম-যশ চেয়ে বসে। চাওয়া আর পাওয়া দুই-ই ভ্রান্তিবিলাস—কেন না পেলেও অভাব মেটে না। কী পেলে যে তার শান্তি হয় তা সে জানে না বলেই ওসবের পিছু নেয়। শুধু খবর পায় না বলেই অলিতে-গলিতে ঘোরে। যদি একবার আনন্দময় ঈশ্বরসত্তার খবর পেত, প্রহ্লাদের মত যদি স্ফটিক-স্তম্ভেও হরি দেখত, তা হলে আর মণি ফেলে কাচ কুড়োত না। মধুর জ্ঞান নেই বলেই গুড় খোঁজে।
সর্বদেশে সর্বদিকে সর্বাবস্থায় নিয়ত মধু ক্ষরণ হচ্ছে এই উপলব্ধিই ঈশ্বরোপলব্ধি।
তোতাপুরী মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।
দৃঢ়াসীন হয়ে বোসো। তদ্গত মনে শোনো। সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি দাও। প্রার্থনা করো।
হে যজ্ঞপতি, হে পরমাত্মন, আমার সমস্ত প্রাণবৃত্তি তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তুমি তো নিত্যকালের প্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পেয়ে ওঠো। অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মবস্তু আমাতে দীপ্যমান করো। বুঝতে দাও তুমিও যা আমিও তা। কোনো দ্বৈত নেই; সর্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিদ্যমান। জীব আর ঈশ্বর একই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বের দুইটি ঘনিষ্ঠ পৃষ্ঠা। দাও আমাকে সেই একত্ববোধের চেতনা।
তার পর শুরু হল বিরজা হোম।
আমার দেহ যে পঞ্চভূতে তৈরি সে ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হোক। শুদ্ধ হোক আমার কোষ-পঞ্চ, অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ। শুদ্ধ হোক পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান আর ব্যান। পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে যে পঞ্চবিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ, তাও শুদ্ধ হোক। শুদ্ধ হোক আমার দেহ আর মন, বাক্য আর কর্ম, শুদ্ধ হোক আমার নিরোধ-সমাধি। হে জ্বালামালী, হে সর্ব-দেবমুখ বৈশ্বানর, আমার মধ্যে জাগ্রত হও। হে সর্বার্থসাধক, আমার অভীষ্টলাভের পথে যত বাধা আছে সব বিনাশ করো। দাও আমাকে সেই সম্যক প্রজ্ঞা, যাতে

গুরুদত্ত জ্ঞান নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে। আমি স্ত্রী-পুত্র ধন-মান-রূপ-যৌবন কিছুই চাই না। আমার সমস্ত পার্থিব বাসনা তোমাতে আহুতি দিয়ে নিঃশেষে ত্যাগ করছি। আমি নিজেই এখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। যে ভাবে ঈশ্বর সমাহিত আমিও এখন সেই সর্বতো-নিরাবরণ সর্ব-প্রশান্ত পরমানন্দময়, মহদাত্মভাবে নিমগ্ন। হে আর্চিষ্মান, আমি এখন শিখাহীন বিশুদ্ধ জ্যোতি। নিরবয়ব আভা।

নবজন্মে দীক্ষা হল গদাধরের।

রূপ থেকে চলে এল অরূপে। অল্প থেকে ভূমায়। পরিমিত থেকে নিরতিশয়ে। আকার থেকে অকায়ে।

শিষ্যকে নতুন কৌপীন আর কাষায় দিল তোতাপুরী। বললে, এবার তোমাকে নতুন নাম দেব।

'আমার নামও বদলে যাবে?'

'শুধু নাম নয়, পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন। নতুন দেশে তুমি নতুন জন্মালে।'

গদাধর তাকিয়ে রইল আবিষ্টের মত।

'হ্যাঁ, এখন থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসে যখন দীক্ষা নিলে অর্থাৎ কি না, যখন শ্রী-তে অধিষ্ঠিত হলে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পরমহংস কাকে বলে জানো তো?'

'জানি।' আবিষ্টের মতই বললে গদাধর : 'দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও যিনি হাঁসের মত জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। বালিতে-চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও যিনি পিঁপড়ের মত চিনিটুকু নিতে পারেন।'

ঠিক বলেছ। তিনিই পরমহংস। খোসাটি ছেড়ে সারটি নাও। খণ্ড ছেড়ে অখণ্ডকে। উপাধি ছেড়ে নিত্যবস্তুকে।

'জানিস, পরমহংস দুই রকম।' ঠাকুর এক দিন বললেন গিরিশ ঘোষকে : 'জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী পরমহংস, তিনি আপ্তসার—ভাব-খানা, একলা আমার হলেই হল। কিন্তু যিনি প্রেমী পরমহংস, তাঁর একলার হলেই সুখ নেই—ঈশ্বরকে পেয়ে তার সংবাদ দিয়ে যেতে চান জনে-জনে। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ বা আর পাঁচজনকেও দেয়। পাতকো খোঁড়বার সময় যে সব ঝুড়ি-কোদাল আনা হয়, খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ সেগুলো ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়, কেউ বা তুলে রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। নারদ-শুকদেব ওঁরা পরের জন্যে ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনিও তেমনি। আপনি তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমি কে? আমি কেউ নয়। তুমি মাকে বলো, মাকে ডাকো, হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে? কিন্তু আমি যে পাপী, ঘোরতর পাপী।'

ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'ও কথা মুখেও এনো না। যে নিজেকে সব সময়ে কেবল পাপী-পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। বলো, আমি মা'র সন্তান, আমি মাকে ধরেছি—আমার আবার পাপ কী!'

'বলছি। কিন্তু আপনি আমার হয়ে একটু বলুন—'

'আমি বলব কি! আমি কে! আমি কেউ নয়। আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি। তোমার যদি আন্তরিক হয়—'

'সেই তো কথা। ঐ আন্তরিকটুকুই তো নেই। ঐটুকু যদি দেন—'

'আমি কে! নারদ-শুকদেব ওঁরা হতেন, তাহলে না-হয়—'

'নারদ-শুকদেবকে পাব কোথায়! আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'যো-সো করে একটা কিছু ধরলেই হয়! আসল হচ্ছে বিশ্বাস, আসল হচ্ছে শরণাগতি।'

২৮

এবার ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হও। বললেন তোতাপুরী।

বললেন, নাম আর রূপের সীমার মধ্যে মায়া খণ্ডিত হয়ে আছে, সে সীমা লঙ্ঘন করে চলে এস নিজ লোকে, ব্রহ্মসাধর্ম্যে। তোমার নিজের মধ্যে অবস্থিত যে আত্মতত্ত্ব তাকে আবিষ্কার করো। তোমার সীমিত আমিকে ব্রহ্মানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত করো। স্বসত্তাবোধের লোপ নয়, স্বসত্তাবোধের প্রতিষ্ঠা।

এই অদ্বৈতবাদ। এই আত্মবোধ জাগানোতেই অদ্বৈতবাদের সার্থকতা। আমি ক্ষুদ্র নই আমি নীচ নই, আমি মহান আমি ভূমা এই উদার উচ্চবোধই আত্মবোধ। আত্মবোধই আনন্দ। আর, আনন্দই সৎ।

আবার বললেন, বোঝো ভালো করে। জীব মাত্রই ঈশ্বরের আভাস। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। আসলে জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের পরিণাম। আবার জীবের পরিণাম ব্রহ্ম। এই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপের স্ফূর্তি। এই জ্ঞানই মোক্ষ।

এখন তুমি চার দিকে ঈশ্বরকে দেখছ, কিন্তু এ সাধনায় তুমি আর চার দিকে তাকাবে না, দিকবিদিকের ভাব ভুলে কেবল এক দিকে, একমাত্র ঈশ্বরের দিকেই তাকাবে। চার দিকে ফিরে-ফিরে চার দিকে ঈশ্বরকে দেখাও তো চঞ্চলতা। কিন্তু এ সাধনায় চিত্ত নিশ্চল হয়ে একাগ্র হয়ে কেবল সেই এক-কেই দেখবে। তখন আর তোমার পৃথকত্ব থাকবে না। ঈশ্বরের ভিতরেই তোমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হবে। ঈশ্বরে যে শাশ্বতী শান্তি তাই অবস্থিতি করবে তোমাতে।

কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তাই বলো না। প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তোমাকে বসতে হবে এখন নির্বিকল্প সমাধিতে। সেই গুণাতীত নির্বিশেষের তপস্যায়।
যার চেয়ে দূরবর্তী কিছু নেই, যার চেয়ে নেই কিছুই নিকটবর্তী; যার চেয়ে সূক্ষ্মতর কিছু নেই, যার চেয়ে নেই কিছুই মহত্তর, আকাশে বৃক্ষের মত যিনি স্তব্ধ ভাবে বিরাজমান, যিনি এক—দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য—অদ্বিতীয়, সেই অসঙ্গ পুরুষের ধ্যান করো। বলো, আমার এই ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন তোমার মহান প্রাণের সঙ্গে যোজনা করে দাও, এই ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার বিরাট প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হোক। তোমার অন্তরের স্বভাবের সঙ্গে আমার অন্তরের পরিচয় করিয়ে দাও। তোমার নামে আমার কাজ নেই, তোমার রূপে আমার কাজ নেই, তোমার স্বভাবটি আমার স্বভাব হোক।
সমাধিতে বসল রামকৃষ্ণ।
শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের চরম স্থিরতার নামই সমাধি। যখন ধ্যাতা নিজেকে ভুলে গিয়ে কেবল ধ্যেয় বিদ্যমানতা উপলব্ধি করে তখনই সে সমাহিত।
কিন্তু রামকৃষ্ণ চিত্ত একবার স্থির করছে কি, ধ্যানচক্ষে জগদম্বা এসে উদয় হয়েছেন। কিছুতেই নামের বা রূপের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যেই মনকে একাগ্র ভূমিতে নিয়ে আসছে অমনি মন রূপময় হয়ে উঠছে। আমি ভোক্তাও নই ভোজ্যও নই, আমি শুদ্ধ ভোজন, এই নির্বিতর্ক চেতনায় মন নিশ্চল হচ্ছে না।
'ও আমার হবে না।' চোখ মেলল রামকৃষ্ণ।
'কেঁও হোগা নেহি?' ধমকে উঠল তোতাপুরী। হতেই হবে। রূপের পদ্মসরোবর পেরিয়ে চলে আসতে হবে অরূপের মহাসমুদ্রে।
এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল তোতা। কুটিরের বাইরে এক টুকরো ভাঙা কাচ চোখে পড়ল। তাই কুড়িয়ে এনে রামকৃষ্ণের কপালের উপর, ঠিক ভুরু দু'টির মাঝখানে, টিপে ধরল সজোরে। বললে, 'মনকে ঠিক এই বিন্দুতে গুটিয়ে আনো।'
আবার সংকল্পহীন হবার সংকল্প নিয়ে ধ্যানে বসল রামকৃষ্ণ। আবার জগদম্বা আবির্ভূত হলেন। কিন্তু এবার আর রামকৃষ্ণ অভিভূত হবে না। স্বস্থানে নিয়তাবস্থ থাকবে। যেই জ্ঞান নিরংশ, নিরবচ্ছিন্ন, সেই জ্ঞানে সমাসীন থাকবে। মূর্তি থেকে চলে আসবে সে ভাবে, আকার থেকে একাকারে। মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল আস্তে-আস্তে—আর কোথাও কোনো বিকল্প বা বিশেষের লেশ রইল না। নিষ্কল-নির্মল, শান্ত ও সর্বাতীত এক রাজ্যে এসে রামকৃষ্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এই অদ্বৈত-সাধনার সমাধি।
তোতা চুপচাপ বসে রইল পাশে। এক মনে দেখতে লাগল শিষ্যকে। বিন্দুমাত্র কম্পন নেই, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। এক জ্যোতির্ময় মৌনে আবৃত হয়ে আছে। আরূঢ় হয়ে আছে এক জ্যোতির্ময় উপলব্ধিতে।
দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল তোতাপুরী। পঞ্চবটীতে নিজ আসনে নিশ্চল হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়া পেলেই খুলে দেবে দরজা।

কিন্তু সাড়াও নেই শব্দও নেই। থাক, যতক্ষণ পারে, থাক ঐ ব্রহ্মস্বাদে তন্ময় হয়ে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে? দিন শেষ হল, রাতও প্রায় যায়-যায়। তোতাপুরী ভাবলে, এখন কী করি! 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'—তাই হল না কি রামকৃষ্ণের? না, ভয় কিসের? ঐ দিব্য দীপাধার যার দেহ তার সম্বন্ধে ভুল হবে কী! তোতাপুরী আরো এক দিন—আরো এক রাত অপেক্ষা করল। তবু রামকৃষ্ণের ডাক এসে পেঁছুলো না। দেহ কোনো প্রয়োজনেরই জানান দিল না। ব্যাপার কি, বেঁচে আছে তো? দরজা খুলে একবার দেখবে না কি অবস্থাটা? কিন্তু, কে জানে, কী অবস্থায় না-জানি দেখতে হবে। যাক আরো এক দিন—হয়তো এরি মধ্যে ডাক এসে পড়বে। সেই দিনও এখন যেতে চলেছে। তবুও কুটির তেমনি নিঃসাড়, নিশ্বাসশূন্য। তোতাপুরী আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারল না। নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। স্তব্ধীভূত রামকৃষ্ণ শিলীভূত হয়ে গেল না কি? এখনো বেঁচে আছে তো? না, কি—জোর করে খুলে ফেলল দরজা। কোথায় রামকৃষ্ণ?

যেমন বসিয়ে গিয়েছিল তেমনি বসে আছে স্থির হয়ে। দেহে প্রাণের প্রকাশ পর্যন্ত নেই। নেই নিশ্বাসের আভাস-লেশ। অথচ শরীরে তপ্ত দীপ্তি, মুখে জ্যোতির্ময় প্রসন্নতা। নিরুদ্ধাবস্থায় প্রশান্ত হয়ে বসে আছে। বসে আছে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত। বসে আছে আত্মজ্ঞানে আত্মদর্শনে বিভোর হয়ে। ব্রহ্মে লগ্ন, লিপ্ত, লীন হয়ে।

সংমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তোতাপুরী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চাইল না। চল্লিশ বছর সাধনা করে সে যে সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, রামকৃষ্ণের পক্ষে তা তিন দিনেই সম্ভব হল? নাকের নিচে হাত রাখল, রামকৃষ্ণের নিশ্বাস পড়ছে না। বুকের উপর হাত রাখল, হৃৎস্পন্দন হচ্ছে না। বারংবার স্পর্শেও বিকার জাগছে না চেতনার। যেন ঊর্ধ্ব-অধঃ-মধ্য সমস্ত আত্মবোধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর এরই নাম তো নির্বিকল্প সমাধি।

'ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং,
সর্বপূর্ণ স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।'

'ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!' বিস্ময়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তোতাপুরী। দেবতার এ কী আশ্চর্য মায়া, শুধু একবারের চেষ্টায়, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই, রামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল!

এখন সমাধিভূমি থেকে নামিয়ে আনতে হয়। তোতাপুরী রামকৃষ্ণের কানে 'হরি ওম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল পঞ্চবটী। রামকৃষ্ণ চোখ মেলল।

তিন দিন থাকবার কথা, একটানা এগারো মাস থেকে গেল তোতাপুরী। এমন আধার পেয়েছে, তাকে সহজে ছেড়ে যেতে মন উঠল না। ঠিক করল তাকে নির্বিকল্প ভূমিতে দৃঢ়াসনে বসিয়ে দিয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ তাকে ডাকত 'ল্যাংটা' বলে। তোতাপুরীর যেমন বালকত্ব উলঙ্গতায়, রামকৃষ্ণেরও তেমনি বালকত্ব ঐ সম্বোধনে।

সর্বক্ষণ ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে তোতাপুরী। বর্ষা হোক বাদল হোক ধুনির নির্বাণ নেই। খাওয়া বলো, শোওয়া বলো, সব এই ধুনির ধারটিতে। ধুনিকেই আরতি করে সকাল-সন্ধ্যা, ভিক্ষার অন্ন ধুনিকেই প্রথমে অর্ঘ্য দেয়। ধুনির পাশেই সমাধিতে বসে, ধুনির পাশেই ঘুমোয়। উলঙ্গ আকাশের নিচে এই উলঙ্গ অগ্নিই তার দেবতা।

সম্পত্তির মধ্যে একটি লোটা আর চিমটা আর একটি চর্মাসন। আর, সত্যি যখন ধ্যান করছে তখন লোকে ভুল করে ভাবুক যে সে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে, তার জন্যে গা মুড়ি দেবার চাদর।

লোটা আর চিমটা রোজ মাজা চাই তোতাপুরীর। তাই ব্রহ্মলাভ হবার পরও তার নিত্যি ধ্যানাভ্যাস চাই। চাই যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম।

রামকৃষ্ণ এক দিন বললে, 'ব্রহ্মলাভের পর আবার নিত্যি এই ধ্যানাভ্যাস কেন?'

ঝকঝকে করে মাজা লোটার দিকে ইঙ্গিত করল তোতাপুরী। বললে, 'নিত্যি মাজি বলেই ওর অমন উজ্জ্বল চেহারা। যদি না মেজে ফেলে রাখি তবে ময়লা ধরে যাবে। মনও সেই রকম। অভ্যাসযোগে নিত্যি তার মার্জনা চাই। মেজে-ঘষে না রাখলেই তা মলিন হয়ে যাবে।'

কথাটা মনের মত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও পরে আরও কথা আছে। রামকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল গুরুর দিকে। বললে, 'কিন্তু লোটা যদি সোনার হয়?'

ঠিকই তো, তা হলে আর মাজতে লাগবে কেন? নিকৃষ্ট ধাতুর পিতলের ঘটিই মাজতে হয় প্রত্যহ।

তোতাপুরী হাসল। বললে, 'কিন্তু সংসারে সোনার লোটা ঐ একটিই।'

দুজনে ধুনির ধারে বসে আছে। অদ্বৈত ধ্যানে প্রায় অচেতন হয়ে। কে একটা লোক কলকেতে তামাক ধরাবার জন্যে আগুন খুঁজছিল। সে হঠাৎ ধুনির কাঠ টেনে আগুন নিতে বসল। তোমরা চোখ বুজে ধ্যান করছ তা করো, আমার একটু চোখ বুজে তামাক খেতে দোষ কি।

আরামে তামাক খাবার উপায় নেই। তোতাপুরীর সব চেয়ে যে পবিত্র জিনিস সেই ধুনিতে সে হাত দিয়েছে। এত বড় অনাচার সইতে পারবে না তোতা। মুহূর্তে টুটে গেল তার ধ্যান। পাবকের মতই সে ক্রোধে জ্বলে উঠল, গালিগালাজ করতে লাগল। তাতেও ক্ষান্তি নেই, মারতে গেল চিমটে তুলে।

'দূর শালা! দূর শালা!' অর্ধবাহ্যদশায় হেসে উঠল রামকৃষ্ণ।

লোকটাকে বলছে না—যেন তাকে বলছে, এমনি মনে হল তোতাপুরীর। আর, সেই লোকটা এখন কোথায়? তাড়া খেয়ে সটকান দিয়েছে।

কিন্তু এতে এত হাসবার আছে কি? অন্যায় দেখলে হাসি?

হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছে রামকৃষ্ণ।

'এত হাসছ কেন? লোকটার অন্যায়টা একবার দেখলে না?'

'দেখলুম। সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখলুম। এই বলছিলে, ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় সত্তাই নেই—জীব মাত্রই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। তবে আবার সেই ব্রহ্মরূপী জীবকেই মারতে উঠেছ? তাই হাসছি, মায়ার কী প্রভাব!'

তোতাপুরী গম্ভীর হয়ে গেল। ভেবে দেখল, কাম ত্যাগ করলেও ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। তাই বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ। ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। আজ থেকে ত্যাগ করলুম ক্রোধ।'

গুরু মিলে তো লাখ, চেলা মিলে এক—ঠিকই বলেছে তোতাপুরী। সকল গুরুর গুরু এই রামকৃষ্ণ।

একটা ফড়িঙের পাখায় কে একটা কাঠি ফুঁড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। রামকৃষ্ণের মন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে হাসির রোল তুললে। বললে, 'তুমিই তোমার দুর্দশা করেছ। তুমিই ফড়িং, তুমিই সেই দুষ্টু ছেলে।'

কালীবাড়ির বাগানে নতুন ঘাস উঠেছে। রামকৃষ্ণ অনুভব করলে ও যেন তার নিজের অঙ্গ। কে-একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল ওখান দিয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ : 'ওরে যাসনি, যাসনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সইতে পারছি না—'

গঙ্গার ঘাটে ঝগড়া করছে মাঝিরা। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি। এক জন আরেক জনের পিঠে সজোরে চড় মেরে বসল। রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিল ঘাটে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ। ভয়ের কান্না নয়, যন্ত্রণার কান্না।

কালীঘর থেকে শুনতে পেল হৃদয়। কি হয়েছে? ছুটে এল ঘাটের চাঁদনীতে। দেখল রামকৃষ্ণের পিঠ ফুলে লাল।

'এ কি, কে তোমাকে মেরেছে? বলো, তাকে একবার আমি দেখে নিই।'

কিছুই বলে না, রামকৃষ্ণ শুধু কাঁদে। অনেক পরে শান্ত হয়ে বললে, 'এক মাঝি আরেক মাঝিকে মেরেছে, আমাকে নয়। কিন্তু সেও তো আমাকেই মারা। নইলে আমার লাগল কেন? কাঁদলাম কেন এতক্ষণ?'

এই অদ্বৈত ভাব। সে ভাবে তুমিও নেই আমিও নেই। একও নেই দুইও নেই। অর্থাৎ সীমাও নেই সংখ্যাও নেই। শুধু একটি বিমল বোধের ঘনতা। এইটিই আত্মবোধ। নিরবধি গগন থেকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত পরিব্যাপী আত্মময়তা। এই ভাবনাতীত ভাবসমুদ্র দূর থেকে দেখেই কেউ ফিরে আসে, কেউ ছোঁয় কি না-ছোঁয়, আর কেউ যদি তার জল খেতে পায় এক চুমুক তার যে কী হয় তা সে নিজেও জানে না।

নারদ দূর থেকে দেখেই ফিরেছিল। শুকদেব শুধু ছুঁয়েছিল। আর শিব তিন গণ্ডূষ জল খেয়েছিল সাহস করে। খেয়ে অবধি কি হয়েছে কে জানে। শব হয়ে পড়ে আছে।

সেই অদ্বৈত ভাবের ভূমিতে যদি এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ পৌঁছুতে পারে তবেই তার নির্বিকল্প সমাধি।

এক-আধ দিন নয়, একটানা ছ'মাস রামকৃষ্ণ ছিল এই নির্বিকল্প অবস্থায়। খুব-

বেশি একুশ দিন থাকলেই শরীর নস্যাৎ হয়ে যায়—সেখানে ছয় মাস! কি দেখছে কি শুনছে কেউ জানে না। নুনের পুতুল যেন সমুদ্র মাপতে নেমেছে। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া!

বিচার যেখানে এসে থেমে যায় তাই ব্রহ্ম। যাকে দেখে আর দেখবার নেই, যাকে জেনে আর জানবার নেই, যা হয়ে আর হবার নেই। কিন্তু কী তুমি দেখলে কী তুমি জানলে কী তুমি হলে বোঝাও তোমার সাধ্য কি। সংসারে আর সব জ্ঞেয় বস্তু এঁটো হয়ে গেছে। বেদই বলো আর পুরাণই বলো, কত পঠন-পাঠন কত বিচার-বিতর্ক হয়ে গেছে মুখে-মুখে। কত উচ্চারণ, কত বিশ্লেষণ। কিন্তু ব্রহ্ম? ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্চারিত। ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট।

কখন কোন দিক দিয়ে দিন আসছে, কোন পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাত, খেয়াল থাকছে না রামকৃষ্ণের। আগে-আগে সমাধিতে 'মা'-'মা' বলে কাঁদত, এখন বাক্য-মনের পরপারে চলে এসেছে। জাগরণও নয়, স্বপ্নও নয়, সুষুপ্তিও নয়—চলে এসেছে স্বরূপবোধের স্তব্ধতায়। নাকে-মুখে মাছি ঢুকছে, তবু সাড় আসছে না শরীরে। ধুলোয়-ধুলোয় চুলে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অসাড়ে শৌচাদি হয়ে যাচ্ছে তবু চেতনা নেই। শূন্যও নয়, অশূন্যও নয়, সর্ব জগতে চিন্মাত্রবিস্তার।

আর সেই চেতনায় শিব শবীভূত।

শরীর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল রামকৃষ্ণের। কিন্তু কোত্থেকে এক সাধু এসে হাজির তখন দক্ষিণেশ্বরে। হাতে একগাছা মোটা লাঠি, তাই দিয়ে থেকে-থেকে মারতে শুরু করল রামকৃষ্ণকে।

'কি, খাবি না কি? একশো বার খেতে হবে।' মারে আর শাসায় সেই সাধু। বলে, 'ওই দেহ অমনি করে নষ্ট করতে দেব না। ওই দেহে মা'র এখনো অনেক কাজ আছে। বাকি আছে অনেক লোক-কল্যাণ। নে, ওঠ্, খা—' বলে আবার মার।

এমনি করে হুঁস আনবার চেষ্টা করছে। মারের চোটে যেই একটু হুঁস আসছে, অমনি খাবার গুঁজে দিচ্ছে মুখের মধ্যে। এমনি করে বাঁচিয়ে রাখছে।

এমনি করে এক-আধ দিন নয়, ছয় মাস।

তার পর এক দিন জগদম্বা দেখা দিলেন। বললেন, 'এবার নেমে আয়। এখন থেকে ভাবমুখে থাক। লোকশিক্ষার জন্যে ভাবৈশ্বর্য ধারণ কর।'

রামকৃষ্ণের রক্ত-আমাশা হল। সেই রোগে ভুগে-ভুগে ক্রমে-ক্রমে দেহে মন নামল। 'ছাদে কতক্ষণ লোক থাকতে পারে? তার পর আবার নেমে আসে। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—নি-তে কতক্ষণ থাকা যায়? আবার সা-তে নেমে আসে। সমাধিস্থ হয়ে যে ব্রহ্মকে দেখে, নেমে এসে সে আবার দেখে জীব-জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। ব্রহ্ম গুণাতীত, ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। এই জীব জগৎ মন বুদ্ধি ভক্তি জ্ঞান ত্যাগ বৈরাগ্য সব তাঁরই ঐশ্বর্য। ব্রহ্ম জ্ঞান-মুখে, ভগবান ভাব-মুখে। আমাদের ভাব-মুখের ভগবানটিই ভালো। তার ঘর-দুয়ার আছে, ধন-দৌলত আছে—তাই তার এত নাম-ডাক। আর ব্রহ্মটি দেউলে, বাউণ্ডুলে। যে বাবুর ঘর-দুয়ার নেই সে বাবু আবার কিসের বাবু!'

বাবুরাম ঘোষ, পরে যিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে প্রসিদ্ধ, এক রাতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে শুয়ে আছে। হঠাৎ কিসের শব্দে বাবুরামের ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া রেখে শুনল কে যেন হাঁটছে ঘরের মধ্যে। আর কে? ঠাকুরই অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন। পরনের কাপড় বগলের নিচে গুটানো। পাইচারি করছেন আর বলছেন উত্তেজিত হয়ে : 'ও সব আমি চাই না। ও সব তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। ছিঃ, ও দিয়ে আমার কী হবে?'

তরুণ শিষ্য বাবুরাম বিস্ময়ে কাঠ হয়ে আছে।

আবার পাইচারি। আবার সেই সঘৃণ প্রত্যাখ্যান।

কতক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল রামকৃষ্ণ। বাবুরাম জিগগেস করলে, 'তখন ও রকম করছিলেন কেন?'

'ও! তুই দেখে ফেলেছিস না কি? মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, ঘরে মা এসেছেন। হাতে একটা থলে। বললেন, থলের মধ্যে যা-কিছু আছে, সব তোর, তোর জন্যে এনেছি। নে, হাত পাত। কি এনেছিস? তাকিয়ে দেখি, থলের মধ্যে নাম-যশ, লোকমান্য। থলের থেকে মুখ বার করে রয়েছে। উঃ, সে কী বীভৎস দেখতে! চেঁচিয়ে উঠলাম, তুই ও-সব ফিরিয়ে নিয়ে যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমি ও-সব চাইনে। আমাকে লোভ দেখাসনে, তোর পায়ে পড়ি—'

'তার পর?'

'তার পর আর কি। মা একটু হাসলেন। চলে গেলেন থলে নিয়ে।'

২৯

'আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো?'

হাততালি দিতে-দিতে হরিনাম করছে রামকৃষ্ণ। সকাল সন্ধ্যেয় যেমন চিরকালের অভ্যাস। হয় হরিবোল, হরিবোল, নয় তো হরি গুরু, গুরু হরি। হয় আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, নয় তো মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে এ সব আবার কী ছেলেমানষি!

বিরক্ত হল তোতাপুরী। ঠাট্টা করে বললে, 'হাত চাপড়ে-চাপড়ে রুটি তৈরি করছ না কি?'

'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি—শুনতে পাচ্ছ না?'

'ঈশ্বরের নাম করছ তো তালি দিচ্ছ কেন?'

কেন দিচ্ছে কে জানে। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ও-সব ভাবের ব্যাপার কিছুই বুঝবে না তোতাপুরী।

সে ব্রহ্ম নিয়েই মশগুল। তার সঙ্গিনী যে মায়া, যে ভাবরূপিণী শক্তি, তার সে খবর রাখে না। বিচারে-বিতর্কে ঈশ্বরকে শুধু সন্ধানই করা যায়, তাকে যে ভালোবাসা যায়, তার জন্যে যে কেউ কাঁদতে পারে, নাচতে পারে—এ তার ধারণার অতীত। সে মনন-চিন্তন বোঝে, কীর্তন-ভজন বোঝে না। শম-দম বোঝে, বোঝে না বাৎসল্য-মাধুর্য। ভক্তি তার কাছে নিছক প্রলাপোচ্ছ্বাস। বুদ্ধির বিক্লিন্ন বিকার।

সে অভীঃ। তার ধুনির আগুনের মত সে মায়াশূন্য, নিষ্কলঙ্ক।

গভীর রাত্রে ধ্যানে বসবার উদ্যোগ করছে তোতাপুরী। মন্দিরচূড়ায় একটা পেঁচা ডাকছে। থমথম করছে চার পাশ।

হঠাৎ দীর্ঘাকার একটা লোক গাছ বেয়ে নিচে নেমে এল। দাঁড়াল এসে সামনে। এ কি, এ যে তারই মত উলঙ্গ।

'কে তুমি?' জিগগেস করল তোতাপুরী।

'আমি ভূত—ভৈরব। গাছের উপর থাকি। এই দেবস্থান রক্ষা করি। কিন্তু তুমি কে?'

বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না তোতা। বললে, 'তুমিও যা, আমিও তা।'

'আমি তো ভূত।'

'হলেই বা। তুমিও ব্রহ্মের প্রকাশ, আমিও ব্রহ্মের প্রকাশ। আমাতে-তোমাতে কোনো তফাত নেই। বোসো এসে পাশে। ধ্যান করো।'

নিমেষে মিলিয়ে গেল ভূত।

পরদিন তোতা বলল সব রামকৃষ্ণকে।

'জানি। অনেক বার দেখেছি তাকে।' রামকৃষ্ণ উদাসীনের মত বললে।

'বলো কি? দেখেছ? ভয় পাওনি?'

'ভয় পাব কেন? আমাকে কত সে ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছে। সে বার কি হয়েছিল জানো না বুঝি—?'

বারুদ-ঘর করবার জন্যে কোম্পানি পঞ্চবটীর জমি নেবে ঠিক করেছিল। একটু নির্জনে বসে মাকে ডাকি, তাও উঠে যাবে? কোম্পানির বিরুদ্ধে মথুর খুব লড়লে একচোট। মামলায় কে হারে কে জেতে তখন সেটা একটা সঙিন অবস্থা। এমন সময় একদিন রাত্রে দেখি ভৈরবটি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন গাছে। 'কি খবর?' ইশারায় বললে, ভয় নেই। মামলায় হেরে যাবে কোম্পানি।

হলও তাই। কোম্পানি ডিসমিস খেয়ে গেল।

তুমি জ্ঞানে নির্ভয়, আমি ভালোবাসায় নির্ভয়। তুমি ব্রহ্ম পেয়ে ব্রহ্ম নিয়েই থাকো। আমি ব্রহ্ম পেয়ে জীব নিয়ে থাকব। তোমার আগেও জ্ঞান পরেও জ্ঞান। আমার ভক্তি থেকে জ্ঞান। আবার জ্ঞান থেকে ভালোবাসা। আমার কখনো পূজা

কখনো জপ কখনো ধ্যান কখনো শুধু নামগুণগান। কখনো বা দু'হাত তুলে নৃত্য। আমি শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। আজ-কালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি। তুমি একরোখা, একঘেয়ে। আমি বিচিত্র। আমি বহুল। আমার সর্বসমন্বয়।

ভক্তি-ভালোবাসা না মানলে কি হয়, তোতাপুরী যখন রামকৃষ্ণের গান শোনে, কেঁদে ফেলে।

ভক্তির বীজ অমর যায় না। যতই জ্ঞান-চাপা দাও, আঁকুর থেকে ফুল-ফল হবেই। হাজার জ্ঞান বিচার করো, আবার ঘুরে-ফিরে 'মা'-'মা', আবার ঘুরে-ফিরে হরি-বোল, হরিবোল!

তুমি অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকো। আমি অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করি। আমার কত কাজ, কত কথা। আমি না বললে শুনবে কে? আমি না করলে করবে কেন? আর এই আমিটি আমি নয়, কেউ নয়। সকলই তিনি, সকলই তুমি।

তিনিটি জ্ঞান। আর তুমিটি ভালোবাসা।

'অদ্বৈতভাব কেমন জানিস? যেমন, ধরো, অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার উপর খুব খুশি। তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন করলে কি—তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। কি কর, কি কর—চাকর তো সঙ্কোচে এতটুকু। আঃ, বোস না—মনিব তাকে জোর করে টেনে বসিয়ে দিল। বললে, তুইও যে, আমিও সে। অদ্বৈতভাব এই রকম।'

পদ্মলোচন প্রকাণ্ড বৈদান্তিক। দেশজোড়া প্রসিদ্ধি। বর্ধমান-রাজার সভাপণ্ডিত হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ ধরল মথুরবাবুকে। বললে, আমাকে একবার বর্ধমান নিয়ে চলো। পণ্ডিতকে একবার দেখে আসি।

যেখানে পাণ্ডিত্য আর ভক্তি একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে তো ভগবানের অধিষ্ঠান। সেই তো তীর্থক্ষেত্র। সেইখানেই তো হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

যেতে হল না রামকৃষ্ণকে। পদ্মলোচনই চলে এল কামারহাটি। দক্ষিণেশ্বরের কাছে। শরীর সারাবার জন্যে রয়েছে গঙ্গাতীরে।

'একবার গিয়ে পণ্ডিতের খোঁজ নিয়ে আয় তো।' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ।

'সে আবার কে?'

জানিস না বুঝি? প্রকাণ্ড সাধক। ঈশ্বরপ্রেমিক। বিদ্যেবুদ্ধিতে প্রচণ্ড, আবার ভক্তিতে মেদুর। যেমন সদাচার ইষ্টনিষ্ঠা তেমনি আবার ঔদাসীন্য আর ঔদার্য। যেমন সরল তেমনি স্পষ্টবাদী। একবার রাজসভায় তর্ক উঠল, শিব বড় না বিষ্ণু বড়? মীমাংসা হচ্ছে না, ডাকো পদ্মলোচনকে। পদ্মলোচন এসে বললে, তার আমি কি জানি! আমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ শিবও দেখেনি বিষ্ণুও দেখেনি। বড়-ছোট বলব কি করে? যার কাছে যে বড় তার কাছে সেই বড়।

'গিয়ে কি করতে হবে?' জিগগেস করল হৃদয়।

'গিয়ে দেখে আয় তার মধ্যে অভিমান আছে কি না।'

হৃদয় গিয়ে দেখে এল পদ্মলোচনকে। বললে, 'সে তোমার জন্যে বসে আছে। আমাকে তোমার ভাগ্নে জেনে কত খাতির।'

তক্ষুনি চলল রামকৃষ্ণ। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, যা কিছু সৎসঙ্গ করবার করে নাও। দিন থাকতে-থাকতে দেখে নাও দিনমণিকে।

পদ্মলোচন দেখল তার দুয়ারে পদ্মপলাশলোচন এসেছে।

পরস্পরকে দেখে গলে গেল দু'জনে। শুরু হল কথার হোলিখেলা। রামকৃষ্ণ গান করলে। পদ্মলোচন কেঁদে আকুল।

'এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত,' বললেন একদিন ঠাকুর, 'তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! জানিস, কথা কয়ে এমন সুখ আর পাইনি কোথাও।'

আর পদ্মলোচন বললে, 'ঝুড়ি-ঝুড়ি বই পড়ে যা জেনেছি ও এক পৃষ্ঠা না উলটিয়েও তার চেয়ে বেশি জেনেছে।'

বেদান্তবাদী হলে কি হয়, পদ্মলোচন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ। ইষ্টদেবীর শক্তিবলে তর্কে সে সর্বজয়ী। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রহস্য ছিল। সব সময়েই তার কাছে থাকত একটি জলে-ভর্তি গাড়ু আর একখানি গামছা। তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে সেই জলে সে মুখ ধুয়ে নিত। ব্যস, একবার মুখ ধুয়ে নিতে পারলেই সে কেল্লা মেরে দিয়েছে। কেউ আর হারাতে পারবে না তাকে। তার প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

একটা অত্যন্ত সাধারণ আচরণ। বাগদেবীকে জিহ্বাগ্রে আনবার আগে এই একটু মুখ-ধোওয়া।

কিন্তু বিষয়টা কি, রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল। জগদম্বা বলে দিলে।

সেদিন তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে পদ্মলোচন যথারীতি মুখ ধুতে উঠেছে। কিন্তু কোথায় গাড়ু-গামছা? বা, তার গাড়ু-গামছা কি হল? মুখ না ধুয়ে সে শাস্ত্রালোচনা শুরু করে কি করে? সে কি কথা? তার গাড়ু-গামছা কে নিল? এইখানেই তো ছিল—

আর কে নেবে! রামকৃষ্ণই লুকিয়েছে।

'কি, আরম্ভ করো মীমাংসা!' রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু।

'কি আশ্চর্য!' পদ্মলোচন তো হতবাক : 'তুমি জানলে কি করে? তবে তুমি কি অন্তর্যামী?'

পদ্মলোচনের দুই চোখ জলে প্লাবিত হয়ে গেল। করজোড়ে স্তব করতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পরে বললে, 'আমি নিজে এক সভা বসাব। ডাকাব সব পণ্ডিতদের। বলব তুমি ঈশ্বরাবতার—দেখি কে কাটতে পারে আমার কথা।'

সে-সভা আর বসাতে পারেনি পদ্মলোচন। তার অসুখ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে।

একদিন বললে রামকৃষ্ণকে, 'ভক্তির সঙ্গ করব এ কামনা ত্যাগ কোরো, নইলে নানা রকমের লোক এসে তোমায় পতিত করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'পতিত-অভাজনদের মধ্যেই তো এখন ঠাঁই নেব। আমাকে আবার পতিত করবে কে?'

দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবু বিরাট ব্রাহ্মণ-বিদায়ের আয়োজন করেছেন। এক হাজার মণ চাল বিলোনো হবে, সঙ্গে বহু বিচিত্র খাদ্যসম্ভার, সোনা-রূপোও যথেষ্ট। গাইয়েও নিমন্ত্রিত হয়েছে অনেক, যার গানে যত বেশি ভাব হবে রামকৃষ্ণের তাকে তত বেশি টাকা দেবেন—শয়ে-শয়ে টাকা, সঙ্গে শাল, ক্ষৌমবস্ত্র। মথুরবাবুর ইচ্ছে পণ্ডিত পদ্মলোচনকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু সে যেমন গোঁড়া, হয়তো নেবে না নিমন্ত্রণ। রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি একবার দেখ না বলে।'

'হ্যাঁ গা, তুমি যাবে না দক্ষিণেশ্বর?' পদ্মলোচনকে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

পরম নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। বললে, 'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা!'

কিন্তু শরীরে শেষ পর্যন্ত কুলোল না। রামকৃষ্ণের থেকে বিদায় নিয়ে কাশী চলে গেল। আর ফিরল না।

সিঁতির বাগানে আরেক পণ্ডিত এসেছে। নাম দয়ানন্দ সরস্বতী। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

রামকৃষ্ণ গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। যেখানে প্রসিদ্ধি সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। আর যেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি সেখানেই রামকৃষ্ণের স্বীকৃতি।

'কেমন দেখলেন সরস্বতীকে?'

'দেখলাম শক্তি হয়েছে—বুক লাল। কথা কইছে খুব, যাকে বলে বৈখরী অবস্থা। ব্যাকরণ লাগিয়ে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করছে। নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব, এই অহঙ্কার ষোলো আনা।'

'আর জয়নারাণ পণ্ডিত?'

'আহা, তার কথা বোলো না। এত বড় বিদ্বান, এক বিন্দু অহঙ্কার নেই। নিজের মৃত্যুর কথা টের পেয়েছিল আগে থেকে। টের পেয়ে বললে, কাশী চললুম।'

আর এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর বিশ্বাসে একেবারে আগুন। কি? একবার তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ? অসম্ভব।

'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু, শাক-পাতা খোসা-ভূষি যা দাও গব-গব করে খায়, সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।'

কৃষ্ণকিশোরের ডাকাতে বিশ্বাস। তেষ্টা পেয়েছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। কুয়োর কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বললে একটু জল তুলে দিতে। সে বললে, আমি মুচি, ছোট জাত। হলেই বা। একবার শিব নাম নাও, অমনি শুচি হয়ে যাবে। একবার নাম নিলেই হবে? হ্যাঁ, বলছি কি, একবার নিলেই হবে। একবারই যথেষ্ট। লোকটা তাই একবার 'শিব' বললে। জল তুলে দিল কৃষ্ণকিশোরকে। কৃষ্ণকিশোর পরম তৃপ্তিতে জল খেল।

কৃষ্ণকিশোর বলে, তোমরা রাম নাম করো, আমি বলি 'মরা'-'মরা'। রামের চেয়েও 'মরা' বেশি শক্তিশালী। মরাতেই রত্নাকরের উদ্ধার, মৃতের পুনর্জীবন। তোমাদের কী মন্ত্র জানি না, আমার এই মরা মন্ত্র।

বিষয়ীসঙ্গ সহ্য হত না, রামকৃষ্ণ প্রায়ই আসত কৃষ্ণকিশোরের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের

ঈশ্বর ছাড়া বাক্য নেই, ঈশ্বর ছাড়া স্তব্ধতাও নেই। কৃষ্ণকিশোর সচল তীর্থ, উদ্ঘাটিত শাস্ত্র।

হলধারীকে দেখতে পারত না দু'চোখে।

একবার রামকৃষ্ণ আর কৃষ্ণকিশোর এক সাধুদর্শনে চলেছে। তুমি যাবে? জিগগেস করল হলধারীকে। হলধারী বললে, 'পঞ্চভূতের একটা খাঁচাকে দেখে লাভ কি?'

খেপে উঠল কৃষ্ণকিশোর। 'যে লোক ঈশ্বরের নাম করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে, সে খাঁচা? সে জানে না যে ভক্তের হৃদয় চিন্ময়?'

কচু! তা হলে অজামিলকে আর দুশ্চর তপস্যা করতে হত না। একবার 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেই তরে যেত।

কিন্তু কিছুতেই মানবে না কৃষ্ণকিশোর। তার ভক্তির তমঃ—মারো-কাটো-বাঁধো—জবরদস্ত ভক্তি। আবার কতবার বলবে? একবার বলেছি, এতেই হয়েছে। এতেই ছিনিয়ে নেব জোর করে। আমি কি ভিখিরি? আমি ডাকাত।

দক্ষিণেশ্বরে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলেই ফিরিয়ে নিত মুখ। অমন ক্ষুদ্র যার বিশ্বাস, যে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়, তার সে মুখ দর্শন করবে না।

একদিন রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখে, কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছে বসে-বসে। কি হয়েছে? আনমনা কেন?

'ট্যাক্সওয়ালা এসেছিল। বললে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।'

'তাই ভাবছ?' রামকৃষ্ণ হেসে উঠল : 'লিক না ঘটি-বাটি। চাই কি, বেঁধে লয়েই যাক না। কিন্তু তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। তুমি তো আকাশবৎ।'

ঠিকই তো। আমাকে কে নেয়! আমাকে কে বাঁধে! কিন্তু তুমি যে এ-কথা বললে, তুমি কে?

তুমি 'অ'। 'অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি'। তুমি সেই অ-কার। তুমি প্রণবের আদ্য অক্ষর। এ হেন কৃষ্ণকিশোরের পুত্রশোক হল। দু-দু উপযুক্ত পুত্র মারা গেল পর-পর। কোনো জ্ঞানেই কিছু কুলোল না। শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল।

তা অর্জুনই অধীর, এ তো কৃষ্ণকিশোর। যার জন্যে এত গীতা, যার জন্যে এত আত্মার বিশ্লেষণ সে-ই কি না অভিমন্যু শোকে মূর্ছিত। সঙ্গে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের এত সব শিক্ষা-দীক্ষা। কিছুতেই কিছু হল না। চোখের জলে সব ভেসে গেল।

বশিষ্ঠ যে এত বড় জ্ঞানী, সেও পুত্রশোকে অস্থির। তখন লক্ষ্মণ বললে, এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত। রাম বললে, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার সুখবোধ আছে তার দুঃখবোধও আছে। তাই তোকে বলি, তুই দুইয়ের পার হ। সুখ-দুঃখের জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যা।'

রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গেল দেখতে। দেখে হাড় শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে। এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র নেই। রামকে বললে, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা!

রাবণের দেহে এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। রাম বললে, ও সব ছিদ্র বাণের জন্যে নয়। শোকে তার হাড় জর-জর করেছে। ও সব ছিদ্র শোকের চিহ্ন।

তেলির ছেলে গোবিন্দ, থাকে বরানগর। ছোকরা বয়স, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসে। আর রামকৃষ্ণের কথামৃত শোনে।

একদিন বললে, 'গোপালকে আনব এখানে?'

'কে গোপাল?'

'আমার এক বন্ধু। আমারই সমবয়সী।'

'বেশ তো। নিয়ে আসিস একদিন।'

গোপাল এল গোবিন্দের সঙ্গে। রামকৃষ্ণের মুখে কথা শুনেই কেমন বেহুঁস হয়ে গেল। রামকৃষ্ণের যেমন সমাধি হয়, প্রায় তেমনি।

একদিন গোপাল এসে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিলে। বললে, 'চলে যাচ্ছি।'

'সে কি? কোথায় যাচ্ছিস?' জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

'জানি না। এ সংসার আর ভালো লাগছে না তাই আর থাকছি না এখানে।'

কত দিন আর ছেলে দুটোর কোনো খবর নেই। এদিকে আর আসে না। কি হল কে জানে।

এক দিন গোবিন্দ এসে হাজির।

'আরে! কি খবর?'

'গোপাল মারা গেছে।'

মারা গেছে? রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল।

ক'দিন পরে খবর এল গোবিন্দও চলে গিয়েছে ওপারে।

ভাগ্যিস ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমার কে। রামকৃষ্ণ বলে আর চোখ মোছে।

৩০

তোতাপুরী জগদম্বাকে মানে না, কিন্তু তোতাপুরীর উপর জগদম্বার অপার করুণা। করুণাবলেই তার সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। দেখাননি তাকে তাঁর রঙিগণী মায়ার খেলা। অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মায়ার ইন্দ্রজাল। দেখাননি তাকে তাঁর সর্বগ্রাসিনী করালী মূর্তি। প্রকটিতরদনা বিভীষিকা। বরং তাকে দিয়েছেন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য, সরল মন আর বিশুদ্ধ সংস্কার। তাই নিজের পুরুষকারের প্রয়োগে

সহজ পথে উঠে গিয়েছে শিখরে। আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরদর্শনে, নির্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে। এখন মহামায়া ভাবলেন, ওকে এবার বোঝাই আসল অবস্থাটা কী!

লোহার মত শরীর, লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে তোতাপুরী—হঠাৎ তার রক্ত আমাশা হয়ে গেল। সব সময়ে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। কি করে মন আর ধ্যানে বসে! ব্রহ্ম ছেড়ে মন এখন শুধু শরীরে লেগে থাকে। মনের সেই শান্তির মৌন চলে গিয়ে দেখা দেয় শারীরিক আর্তনাদ।

ব্রহ্ম এবার পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়েছেন। এবার মহামায়ার কৃপা না হলে আর রক্ষে নেই।

তোতাপুরী ভাবলে এবার পালাই বাঙলা দেশ থেকে। কিন্তু শরীর ভালো থাকছে না এই ওজুহাতে পালিয়ে যাব? হাড়-মাসের খাঁচা এই শরীর, তাকে এত প্রাধান্য দেব? তার জন্যে ছেড়ে যাব এই ঈশ্বর-সঙ্গ? যেখানে যাব সেখানেই তো শরীর যাবে, শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে রোগও যাবে। আর, রোগকে ভয়ই বা কিসের? শরীর যখন আছে তখন তো তা ভুগবেই, শেষও হয়ে যাবে এক দিন। সেই শরীরের প্রতি মমতা কেন? যাক না তা ধূলায় নস্যাৎ হয়ে। ক্ষয়হীন আত্মা রয়েছে অনির্বাণ। রোগ বা জরা বা মৃত্যু তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সে প্রদীপ্ত চৈতন্য শরীর-বহির্ভূত।

নানা তর্ক করে মনকে স্তব্ধ করলে তোতাপুরী।

কিন্তু রোগ না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রমেই তা শিখা বিস্তার করতে লাগল—যন্ত্রণার শিখা। ঠিক করল, আর থাকা চলবে না দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণর থেকে শেষ বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু মুখ ফুটে রামকৃষ্ণকে তা বলে এমন তার সাধ্য নেই। কে যেন তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কথা কইতে বাধা দিচ্ছে। আজ থাক, কাল বলব—বারে-বারে এই ভাব এসে তাকে নিরস্ত করছে। আজ গেল, কালও সে পঞ্চবটীতে বসে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেদান্ত নিয়েই আলোচনা করলে, অসুখের কথা দন্তস্ফুট করতে পারল না।

কিন্তু বুঝতে পারল রামকৃষ্ণ। মথুরবাবুকে বলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করালে। মনকে সমাধিস্থ করে যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খুঁজছে তোতাপুরী। আমি দেহ নই আমি আত্মা, আমি জীব নই আমি ব্রহ্ম এই দিব্যবোধে নিমগ্ন হয়ে থাকছে। শরণ নিচ্ছে যোগজ প্রজ্ঞার।

কিন্তু কত দিন?

এক দিন রাতে শুয়েছে, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হল। উঠে বসল তোতাপুরী। এ যন্ত্রণার কিসে নিবারণ হবে? মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠাতে চাইল সেই অদ্বৈতভূমিতে। কিন্তু মন আর যেতে চায় না। একটু ওঠে আবার পেটের যন্ত্রণায় নেমে পড়ে। শরীরবোধের আর বিচ্যুতি ঘটে না। ভীষণ বিরক্ত হল তোতাপুরী। যে অপদার্থ শরীরটার জন্যে মনকে বশে আনতে পারছি না সে শরীর রেখে আর লাভ কী? তার জন্যে কেন এত নির্যাতন? সেটাকে বিসর্জন দিয়ে মুক্ত, শুদ্ধ, অসঙ্গ হয়ে যাই। তোতাপুরী স্থির করল ভরা গঙ্গায় ডুবে মরবে।

গঙ্গার ঘাটে চলে এল তোতা। সিঁড়ি পেরিয়ে ধীরে-ধীরে জলে নামতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে এগুতে লাগল গভীরের দিকে, মাঝ-নদীতে।
কিন্তু এ কী! গঙ্গা কি আজ শুকিয়ে গেছে? আদ্ধেক প্রায় হেঁটে চলে এল, তবু এখনো কি না ডুব-জল পেল না? এ কি গঙ্গা, না, একটা শিশে খাল? প্রায় ও-পারের কাছাকাছি এসে পড়ল, এখন কি না ফের হাঁটু-জলে এসে ঠেকেছে। এ কি পরমাশ্চর্য! ডুবে মরবার জল পর্যন্ত আজ গঙ্গায় নেই।
'এ ক্যা দৈবী মায়া!' অসহায়ের মত চীৎকার করে উঠল তোতাপুরী।
হঠাৎ তার চোখের ঠুলি যেন খসে পড়ল। যে অব্যয়-অদ্বৈত ব্রহ্মকে সে ধ্যান করে এসেছে তাকে সে এখন দেখলে মায়ারূপিণী শক্তিরূপে। যা ব্রহ্ম তাই ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, কিন্তু শক্তিতেই জীব-জগৎ। ব্রহ্ম নিত্য, শক্তি লীলা। যেমন সাপ আর তির্য্যক গতি। যেমন মণি আর বিভা।
সেই বিভাবতী জ্যোতির্ময়ীকে দেখল এখন তোতাপুরী। দেখল জগজ্জননী সমস্ত চরাচর আবৃত করে রয়েছেন। যা কিছু দৃশ্যে দর্শন ও দ্রষ্টা সব তিনি। শরীর-মন রোগ-স্বাস্থ্য জ্ঞান-অজ্ঞান জীবন-মৃত্যু—সব তাঁর রূপচ্ছটা! 'একৈব সা মহাশক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।'
মা'র এই বিরাট বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দেখে তোতা অভিভূত হয়ে গেল।
লুপ্ত হয়ে গেল ব্যাধিবোধ। নদী ভেঙে ফের সে ফিরে চলল দক্ষিণেশ্বরে।
পঞ্চবটীতে ধুনির ধারে বসল গিয়ে সে চুপচাপ। ধ্যানে চোখ বোজে আর দেখে সে জগদম্বাকে। চিৎসত্তাস্বরূপিণী পরমানন্দময়ীকে।
সকাল বেলা তোতাকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক। শরীরে রোগের আভাসলেশ নেই। সর্বত্র প্রহর্ষ-প্রকাশ।
'এ কি হল তোমার? কেমন আছ?'
'রোগ সেরে গেছে।'
'সেরে গেছে? কি করে?'
'কাল তোমার মাকে দেখেছি।' তোতার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।
'আমার মাকে?'
'হ্যাঁ, আমারো মাকে। জগতের মাকে। সর্বত্র তাঁর আত্মলীলার স্ফূর্তি—চিদৈশ্বর্যের বিস্তার—'
'কেন, বলেছিলাম না?' রামকৃষ্ণ উল্লসিত হয়ে উঠল : 'তখন না বলেছিলে, আমার কথা সব ভ্রান্তি? তোমায় কী বলব, আমার মা যে ভ্রান্তিরূপেও সংস্থিতা—'
'দেখলাম যা ব্রহ্ম তাই শক্তি। যা অগ্নি তাই দাহিকা, যা প্রদীপ তাই প্রভা, যা বিন্দু তাই সিন্ধু। ক্রিয়াহীনে ব্রহ্মবাচ্য, ক্রিয়াযুক্তেই মহামায়া।'
'দেখলে তো, দেখলে তো?' রামকৃষ্ণের খুশি আর ধরে না। 'আমার মাকে না দেখে কি তুমি যেতে পারো? যোগে বসে এত দেখছ আর আমার মহাযোগিনী মাকে দেখবে না?'
যা মন্ত্র তাই মূর্তি। এক বিন্দু বীর্য থেকে এই অপূর্বসুন্দর দেহ, এক ক্ষুদ্র বীজ

থেকে বৃহৎ বনস্পতি, এক তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ থেকে বিস্তীর্ণ দাবানল। তেমনি ব্রহ্ম থেকে এই শক্তির আত্মলীলা।

'এবার তোমার মাকে বলে আমাকে ছুটি পাইয়ে দাও।'

'আমি কেন? তোমার মা, তুমি বলো না।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তোতা চলে এল ভবতারিণীর মন্দিরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে মাকে। প্রসন্ন মনে মা তাকে যাবার অনুমতি দিলেন। রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল কোন দিকে।

কোন দিকে গেল কেউ জানে না।

৩১

তোতাপুরী গেল, এল গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ রায় জাতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আরবি-ফার্সিতে পণ্ডিত। ইসলামের একভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছে।

ঘুরতে-ঘুরতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। আস্তানা গেড়েছে কালীবাড়ির বাগানে। তখন এমনি উদার ব্যবস্থা। রানি রাসমণির পুণ্যের আকর্ষণে হিন্দু সন্নেসির মত মুসলমান ফকিররা এসেও জমায়েত হচ্ছে। যেখানে ভক্তির রাজ্য, ভাবের রাজ্য, সেখানে আবার জাত বিচার কি! তা ছাড়া রানি যেখানে অন্নপূর্ণা।

গোবিন্দ রায় দরবেশ। সুফী-পন্থী। প্রেমভাবে মাতোয়ারা। ভাবের পশরা মাথায় নিয়ে ভবের হাটে কেনা-বেচা করে।

রামকৃষ্ণর চোখ পড়ল গোবিন্দর উপর। ভাবেশ্বরীই তাকে পথ দেখালেন।

'কি হে, এসেছ?' ছুটে গেল রামকৃষ্ণ।

'তুমি ডাকলে যে! না এসে কি পারি?' গোবিন্দ রায় মহানন্দে হাসল।

চুম্বকের ডাকে লোহা চলে এসেছে।

যেখানেই অনুভূতির গভীরতা সেখানেই স্বচ্ছ সারল্য। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানেই প্রেমের সদানন্দ।

গোবিন্দ রায়ের বিতর্কহীন বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। দেখল, এও তো একটা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার। এই পথেই তো মা লোককে টেনে নিয়ে চলেছেন, পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে। এই পথটা একবার

দেখে এলে কেমন হয়? পথ যখন আরেকটা আছে তখন সেটাই বা তার কাছে রুদ্ধ থাকবে কেন? সমস্ত রসের রসিক সে। সমস্ত পথের সে পর্যটক।

যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমুদ্রে। তেমনি ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে যে ভাবেই ওঠো, একটা কিছু ধরে উঠতে হবে। দু' সিঁড়িতে পা দিলে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। যখন যেটা ধরেছ সেটা ধরেই উঠে যাও। দেখ ঠিক উঠছ কি না।

ধর্ম তো আর ঈশ্বর নয়। ধর্ম হচ্ছে শুধু একটা কিছু ধরবার জন্যে। যেটা ধরে উঠতে পারবে উপরে, পর্বতচূড়ায়, যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। যা তুমি ধরবে, তা বাপু, একটু শক্ত করে ধোরো। পা পিছলে পড়ে না যাও।

কালীঘাটে যাবার নানান রাস্তা। নানান বাহন। তোমার গাড়ি-ঘোড়া না জোটে, না জুটুক, তোমার খুব দূরের পাড়ি হয়, হোক যত দূর খুশি। তুমি পায়ে হেঁটেই চলে এস মন্দিরে। সোজা ভক্তি-বিশ্বাসের পথ দিয়ে।

রামকৃষ্ণ ধরল গিয়ে গোবিন্দ রায়কে। বললে, 'আমি মুসলমান হব।'

চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইল গোবিন্দ রায়। দেখল সে কী মহাভাববিদ্যুতি রামকৃষ্ণের চোখে-মুখে খেলে যাচ্ছে। দেখল ভক্তি-ভালোবাসার বিশাল ঝঞ্ঝাবাতে উড়ে গেছে সব বিধি-নিষেধ, সব সংস্কার-সংকীর্ণতা। অভিমানের জঞ্জালস্তূপ।

তবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হল না গোবিন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হবে?'

'মুসলমান হব। ইসলামের পথও তো একটা পথ। এই পথে কত সাধকই তো বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পৌঁছুচ্ছেন। আমি সে পথটাই বা বাদ দেব কেন?'

'সত্যি বলছ মুসলমান হবে?'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। আমার আর দেরি সইছে না—খিদের মুখেই আমার আস্বাদন চাই।'

গোবিন্দ রায় যথাবিধি দীক্ষা দিল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেলল। লুঙিগর মতন করে পরল দু'গজি কাপড়। মুখে আর 'মা' 'মা' নেই, শুধু 'আল্লা', 'আল্লা'। মন্দিরের ধারে-কাছেও যায় না। যে শ্যামা তার চক্ষুর চক্ষু ছিল তাকে দেখবার জন্যে আর এক বিন্দু ব্যাকুলতা নেই। বরং দেব-দেবীর নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। সেই একেশ্বর খোদাতাল্লার ভজনা করে।

থাকে মথুরবাবুর কুঠির এক পাশে। চোখের উপর এত বড় যে একটা মন্দির সেটা চোখে পড়ে না। শোনে না সকাল-সন্ধ্যার ঘণ্টার আওয়াজ। পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে তদ্গত মনে। নামাজের আগে পুকুরে ওজু করে নেয়।

এক দিন বললে মথুরবাবুকে, 'মুসলমানের রান্না খাব।'

'সে কি কথা?'

'হ্যাঁ, খুব ঝাল-পেঁয়াজ-রশুন দেওয়া উগ্র রান্না। রান্নার গন্ধ বাতাসে টের পাওয়া যাবে।'

মথুরবাবু রাজী হন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের দাবি দৃঢ়তর।

বেশ, মুসলমান বাবুর্চি দেখিয়ে দেবে, রাঁধবে হিন্দু বামুন। তাই সই। শিগগির-শিগগির চাপিয়ে দাও রান্না। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

আমাশায় ভোগা রুগী, আঝাল ঝোল-ভাত যার পথ্য, তার জন্যে ঐ উগ্রচণ্ড রান্না। কিন্তু উপায় নেই। রামকৃষ্ণ যখন গোঁ ধরেছে তখন মানতেই হবে। মুসলমান-বাবুর্চি বলে দিচ্ছে, আর তার কথামত রাঁধছে হিন্দু বামুন। কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছে রামকৃষ্ণ। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে।

হঠাৎ ডাকিয়ে আনলেন মথুরবাবুকে। বললেন, 'এ ঠিক হচ্ছে না। বামুনকে বলো কাছা খুলে ফেলতে। ওতে আর বাবুর্চিতে কিছু তফাত নেই আমাকে ভাবতে দাও সেই কথা।'

মথুরবাবুর নির্দেশে বামুন কাছা খুলে ফেলল।

সানকিতে করে ভাত খেল রামকৃষ্ণ। জল খেল বদনাতে করে।

এ কি ভাব হল রামকৃষ্ণের—মথুরবাবু ভাবনায় পড়লেন। কিন্তু হৃদয় এল তেড়ে-ফুঁড়ে, ভীষণ চোটপাটের সঙ্গে।

'এ সব কী হচ্ছে পাগলামি? নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কী ব্যবহার? পৈতে ফেলে দিয়েছ বলে কাছাও ফেলে দেবে? কাছা ফেলে দিয়েছ বলে নামাজ পড়বে ওঠ-বোস করতে-করতে? পাগলামি ছাড়ো। যাও, মন্দিরে যাও। মন্দিরে গিয়ে মা'র কাছে বোসো। তাঁকে ভজনা করো।'

ধরে টেনে ঠেলে রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিল মন্দিরের দিকে। কতক্ষণ পরে হৃদয় মন্দিরে এসে দেখে রামকৃষ্ণের টিকিটিও কোথাও নেই। কোথায় গেল মামা? ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল হৃদয়। মথুরবাবুর কুঠির বারান্দাতেও নেই, নেই বা গঙ্গার ধারে-কাছে। বাগান-পঞ্চবটীও শূন্য। তবে কোথায় অদৃশ্য হল?

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এল রাস্তায়। রাস্তা ছেড়ে সামনের মসজিদে।

দেখল মসজিদে নামাজ পড়ছে রামকৃষ্ণ।

দুষ্টুমি করার সময় ছোট ছেলে যেন ধরা পড়েছে অভিভাবকের কাছে। হৃদয় যেন রুদ্রচক্ষু গুরুজন আর রামকৃষ্ণ অবোধ অপোগণ্ড শিশু। বললে, 'আমি কি করব বল্, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে কে যেন জোর করে এখানে টেনে এনেছে।'

সকাল বেলা। আজান দিয়েছে মসজিদ থেকে। রামকৃষ্ণ দে-ছুট।

'এ কি, তুমি কে?' প্রথম দিন জিগগেস করেছিল মুসলমানেরা।

ওদের থেকেই কে একজন বললে, 'ওকে চেন না? ও মন্দিরে থাকে, পুজো-টুজো করে—'

'করে না করত। আমি এখন ইসলামের দীক্ষা নিয়েছি। আমার ভায়েদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করব।'

সকলে ভাবলে পাগল হবে বা। কিন্তু সাধ্য নেই তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়। নামাজের প্রত্যেকটি কৃত্য-করণ তার মুখস্থ। আর সব চেয়ে মর্মস্পর্শী হচ্ছে তার মুখস্থ ভাবটি। যে ভাবটি আসে শুধু সরলতা থেকে, ব্যাকুলতার সরলতা। তিন দিন ছিল এই ইসলামভাবে।

একদিন হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে আবির্ভূত হল। মসজিদে যখন নামাজ পড়তে এসেছে। বৃদ্ধ ফকিরের বেশ, মাথার চুল সব শাদা, গোঁফদাড়িও তাই। গলায় কাঁচের মালা, হাতে লাঠি। বললে, 'তুমি এসেছ? বেশ—' বলে হাসল, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করল। সেই পুরুষ-প্রবর বিরাট ব্রহ্মেরই প্রতিভাস। পরে আরো এক দিন দেখেছিলেন তাকে ঠাকুর। বললেন, 'মা ভেদবুদ্ধি সব দূর করে দিলেন। বটতলায় বসে ধ্যান করছি, দেখালেন এক জন বুড়ো মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন এক বই দুই নেই—'

মা'র মন্দিরে বসে তোরা চোখ বুজে কেন ধ্যান করিস বল তো? সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নে। দ্যাখ তাঁর আয়ত-শান্ত চোখ দুটি, দ্যাখ তাঁর পাদপদ্ম দু'খানি। যখন আপন মা'র কাছে যাস মাকে দেখতে, তখন কি চোখ বন্ধ করে মা'র কাছে বসিস, না, মালা ফেরাস বসে-বসে?

চেয়ে দ্যাখ দেখি—এ তোর আপনার মা নয়?

'শিখেরা বলেছিল, ঈশ্বর দয়ালু। আমি বললাম, তিনি আমাদের মা-বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি! ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ-মা লালন-পালন করবে না, করবে কি বামুন-পাড়ার লোকেরা?'

কালীমন্দিরের চাতালে বসে স্তব করছে রামকৃষ্ণ:

'ও মা, ও মা ওঁকাররূপিণী মা! এরা কত কি বলে মা, কিছু বুঝতে পারিনি। কিছু জানি না, মা। শুধু শরণাগত! শরণাগত! কেবল এই কোরো মা তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না। শরণাগত! শরণাগত!'

৩২

এই সেই যদু মল্লিক।

তুমি বড্ড হিসেবী লোক। অনেক হিসেব করে কাজ করো, তাই না? সেই বামুনের গরু, খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে—

কি বললেন?

তুমি বড় অন্যমনস্ক। ঈশ্বরচিন্তায় নয়, বিষয়চিন্তায়। কোন ব্যঞ্জনে নুন হয়েছে

কোন ব্যঞ্জনে হয়নি এ তুমি বুঝতে পারো না। কেউ যদি বলে দেয়, এ ব্যঞ্জনে নুন হয়নি, তখন এ্যাঁ-এ্যাঁ করে বলো, হয়নি না কি? তখন তোমার হুঁস হয়। কেউ না বলে দিলে—
আপনি বলে দিন।
তুমি সেই রামজীবনপুরের শিলের মত—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। ঈশ্বরেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে—
ষোলো আনা গরম করে দিন।
অসম্ভব। কথা দিয়ে কথা রাখো না কেন? বাড়িতে যে চণ্ডীর গান দেবে বলেছিলে, তা হল কই? কত দিন কেটে গেল—
অনেক ঝঞ্ঝাট—নানান ঝামেলা।
তুমি পুরুষ-মানুষ তো বটে? তবে কথা রাখবে না কেন? পুরুষ-মানুষের এক কথা। কি, মানো?
তা মানি বৈ কি।
তা যদি মানো, সেই মান সম্বন্ধে যদি হুঁস থাকে, তবে তো মানুষই হয়ে যেতে। মান-হুঁস—মানুষ। আর পুরুষ কাকে বলে? পুরুষের সম্পদ কোথায়?
যদু মল্লিক তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।
কথায়। হাতির দাঁত, আর পুরুষের? পুরুষের বাত। এক কথার মালিক যে সেই পুরুষ।
এই সেই যদু মল্লিক।
এই যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে এক দিন বেড়াতে এসেছে রামকৃষ্ণ। বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে যদুর সঙ্গে। হঠাৎ দেয়ালে-টাঙানো একখানা ছবির দিকে তার নজর পড়ল। বড় মধুর ভাবের ছবিখানি।
মা আর ছেলে। মা'র নধর বাহুর বেষ্টনীতে পবিত্র একটি শিশু, ঊষার আকাশে প্রথম উদয়ভানু। মা'র দুটি বড়-বড় বিভোর চোখে দ্রবীভূত স্নেহ, মুখে তৃপ্তিপূর্ণ হাসি। আর শিশুর মুখে সে যে কি নিষ্পাপ সারল্য তা রামকৃষ্ণ যেমন বুঝছে তেমন কি কেউ বুঝবে?
'ওরা কারা হে?'
এক মেমসাহেব আর তার ছেলে।
তাই হবে বা। অন্য দিকে চোখ ফেরাতে চাইল রামকৃষ্ণ।
কিন্তু চোখ ফেরায় এমন সাধ্য নেই। বলো না সত্যি করে। ওরা কে? ও তো দেখছি জ্যোতির্ময় দেবশিশু। আর ওর মা তো পুণ্যময়ী পবিত্রতা।
'মা মেরী আর তার ছেলে যীশুখৃষ্ট।'
একদৃষ্টে চেয়ে রইল রামকৃষ্ণ। দেখলে যশোদা আর তার কোলে বালগোপাল। সোজা শম্ভু মল্লিকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, 'যীশুখৃষ্টের গল্প শোনাও আমাকে।'
এই সেই শম্ভু মল্লিক।

হাসপাতাল করা, ডিসপেনসারি করা, রাস্তা বানানো, কুয়ো কাটানো—এই সবে বড় ঝোঁক। এ সব কাজ অনাসক্ত হয়ে করতে পারো তো বুঝি। নইলে ও-সবের পিছনে তো শুধু নামের পিপাসা, ঢাকের বাদ্যি। কালীঘাটে এসে যদি শুধু দানই করতে থাকো তো কালীদর্শন হবে কখন? আগে যো-সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করে নাও, তার পর দান যত করো আর না-করো। ঈশ্বর যদি তোমার কাছে এসে বলেন, কী বর চাও, তখন তুমি কী বলবে? বলবে, কতগুলি হাসপাতাল-ডিসপেনসারি করে দাও, না, স্থান দাও, আশ্রয় দাও, তোমার পাদপদ্মে?

গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। ভাবে তাকে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। দেখেছিল সেবায়েৎ বলে। সেজোবাবুর পরে রসদদার এই শম্ভু মল্লিক।

বাগবাজার থেকে হেঁটে চলে আসে বাগানে। আসে সটান পায়ে হেঁটে। কেউ যদি বলে, অত রাস্তা, গাড়ি করে আস না কেন? যদি কোনো বিপদ হয়। শম্ভু মুখ লাল করে বলে, মা'র নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ!

'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ দেখি মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে।' শম্ভু মল্লিককে বলেছিল এক দিন রামকৃষ্ণ।

'আহা, তা আর জানি না?' সহাস্য সারল্যে বললে শম্ভু মল্লিক, 'ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।'

জানোই তো আমার বিদ্যেবুদ্ধি। তবে এবার একটু বাইবেল শোনাও দিকি।

শম্ভু মল্লিক বাইবেল নিয়ে বসল। আবিষ্টের মত শুনতে লাগল রামকৃষ্ণ। ভূমাভিমুখী মন নামল অবগাহনে।

পরে এক দিন উন্মনার মত চলে এল যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে। যদু মল্লিক বাড়ি নেই। বৈঠকখানা খুলে দিলে চাকররা। শিশুযুতা মাতৃচিত্রের কাছে বসল রামকৃষ্ণ।

'মা গো, তুই আমাকে এ কী দেখাচ্ছিস?'

রামকৃষ্ণ দেখল সেই ছবি যেন জীবনায়িত হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলের দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। তার অন্তর-বাহির ধুয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিস্নানে। এত দিনের দৃঢ়মূল সংস্কার উন্মূলিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বসংসারে আর কেউ বিরাজমান নয়—শুধু পীযূষপ্রেমময় যীশু। কৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট। ঈশান নয়, ঈশা।

দেখল এ ঘর যেন গির্জা হয়ে গিয়েছে। নানা ধূপ দীপ মোমবাতি জ্বেলে ব্যাকুলতার মূকমূর্তি হয়ে প্রার্থনা করছে পাদরিরা। সামনে ক্লেশভারক্লিষ্ট অথচ অক্লিষ্টকান্তি দেবতা।

কে তুমি পরম যোগী পরম প্রেমিক? কে তুমি 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ?' সংসারদুঃখগহন থেকে জীবের উদ্ধারের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিলে। যাকে ত্রাণ করতে এলে তারই হাতে প্রাণ দিলে হাসিমুখে। এলে যে যন্ত্রণার নিবারণে সেই যন্ত্রণাই ক্ষমা হয়ে প্রেম হয়ে শান্তি হয়ে উদ্ভাসিত হল।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল এক গির্জার সামনে। বড় রাস্তার পারে বড় গির্জা। সব বিদেশী-বিজাতীয়দের ভিড়। 'রাজার বেটা' না হোক, সব রাজার জাতের লোক।

ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না রামকৃষ্ণ। কে জানে, হয়তো বা কালী-ঘরের খাজাঞ্চি বসে আছে।
'মা গো, খৃষ্টানরা গির্জেতে তোমাকে কি করে ডাকে একবার দেখিও। কিন্তু ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙগামা হয়? আবার কালী-ঘরে ঢুকতে না দেয়! তবে মা, গির্জের দোরগোড়া থেকেই দেখিও।'
গির্জার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। চক্ষু মেলে তাকাল একবার ভিতরে। সর্বতশ্চক্ষু রামকৃষ্ণের চোখে এখন 'পরম পশ্যন্তী দৃষ্টি।' দেখল সত্যি-সত্যিই এ কালী-ঘর। ভিতরে, বেদীতে, মা বসে আছেন। মা জগদম্বা। মা ভবতারিণী। সব্যে খড়্গমুণ্ডকরা, অসব্যে বরাভয়দাত্রী—সেই মা, যিনি করালী হয়েও কৈবল্যদায়িনী। আনন্দধারায় দুই চোখ ভেসে গেল রামকৃষ্ণের।
সর্বত্রই এই মা'র ভজন। সর্বস্থানই মাতৃস্থান। কাজলের ঘরে বাস করলে গায়ে কালি লাগবেই, কিন্তু কোথাও আর কাজলের ঘর নেই—সর্বত্র কালী-ঘর।
যিনি যীশুখৃষ্ট তিনিই মোক্ষকরী শিবকরী মাহেশ্বরী।
তিন দিন থাকল এই খৃষ্টান ভাবে। চার দিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ, দেখল কে এক জন গৌরবর্ণ সুপুরুষ হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে দেরি হল না, বিদেশী, বিজাতি। কিন্তু সৌম্য আননে কী অপার সৌন্দর্য, সর্বাঙেগ দেবদ্যুতি। কে তুমি? তুমিই কি সেই পুরুষোত্তম যীশু? তুমিই কি সেই তমাল-শ্যামল বনমালী?
সেই দেবমানব আলিঙগন করল রামকৃষ্ণকে। এক দেহে লীন হয়ে গেল দু'জনে। লীন হয়ে গেল ব্রহ্মাত্মবোধে।
'আচ্ছা তোরা তো সবাই বাইবেল পড়েছিস—' এক দিন ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর : 'সেইখানে যীশুর চেহারার কোনো বর্ণনা আছে?'
না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই।
'আচ্ছা, যীশু কেমন দেখতে ছিল বল তো?'
কে জানে! তবে ইহুদি ছিলেন যখন তখন রঙ গৌর চোখ টানা আর নাক টিকলো ছিল নিশ্চয়ই।
'কিন্তু আমি যখন দেখেছিলাম, দেখলাম নাক একটু চাপা। কেন দেখলাম কে জানে।'
ভাবে-দেখা মূর্তি কি বাস্তব মূর্তির অনুরূপ হয়? কিন্তু যীশুখৃষ্টের আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে তাঁর নাক চাপা বলেই লেখা আছে।
'মা গো, সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রহ্মজ্ঞানী সকলেই বলে আমার ধর্মই ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই তো ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সঙেগ কেউই তো মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক-ঠিক। সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, কেউই তোমাকে দেখে না।'
মিশ্র এসেছে ঠাকুরের সঙেগ দেখা করতে। ধর্মে খৃষ্টান, বাড়ি পশ্চিমে। ভাই গিয়েছিল বিয়ে করতে, সেখানে বরের সভায় শামিয়ানা চাপা পড়ে মারা যায়। একা

নয়, সঙ্গে আরো একটি ভাই—গিয়েছিল বরযাত্রী। সেই থেকেই মিশ্র সন্ন্যাসী। পরনে প্যাণ্ট কোট বটে, কিন্তু ভিতরে গেরুয়ার কৌপীন।

'ইনিই ঈশ্বর, ইনিই রাম, ইনিই কৃষ্ণ—' বলতে লাগল মিশ্র।

ঠাকুর হাসছেন। বলছেন, 'পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল। আরেক ঘাটে খৃষ্টানরা খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার। মুসলমানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি।' মিশ্রের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কিছু দেখতে-টেকতে পাও?'

'শুধু আপনাকে দেখি। আপনি আর যীশু এক।'

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাবাবেশে মিশ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। সেকহ্যান্ড করতে লাগলেন।

সকলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। তার পরে আবার নিরালায় ফিরে যাও নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে ফের শান্তিতে থাকো। রাখালেরা এক-এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়, কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু মিলে-মিশে একাকার। আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে যায় নিজের-নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে।

গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। বেলুন উঠবে, বেজায় ভিড়। জায়গা নিয়েছে এক পাশে। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাই দেখা, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে গেল। সমাধি হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

উলোর বামনদাস ঠিকই বলে। বলে, 'বাবাঃ, বাঘ যেমন মানুষ ধরে তেমনি ঈশ্বরী একে ধরে রয়েছেন।'

৩৩

মধুসূদন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এসেছে ব্যারিষ্টার হিসাবে। মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ডেকে এনেছে। বারুদ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে যে মামলার যোগাড় হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে।

দপ্তরখানার পাশে বড় ঘর। সেই ঘরে বসেছে মাইকেল। বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।'

খবর গেল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ যেতে চায় না। অত বড় গণ্যমান্য লোক,

দুর্দান্ত সাহেব, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কি! হৃদয়কে বললে, 'তুই যা!' হৃদয় গেলে হবে কেন? দ্বারিক বিশ্বাস আবার তাগিদ পাঠাল।

নারায়ণ শাস্ত্রী ছিল সামনে, রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমিও সঙ্গে চল। ইংরিজি-টিংরিজি জানি না—কি বলতে কি বলব তার ঠিক নেই—'

দুজনে এসে দাঁড়াল মাইকেলের মুখোমুখি। রামকৃষ্ণ ঠেলে দিল নারায়ণ শাস্ত্রীকে। বললে, 'তুমিই কথা কও।'

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে আলাপ চালাল।

মাইকেল বললে, 'বাংলাতেই কথা বলুন—'

নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে?'

মাইকেল পেট দেখাল। বললে, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে?' চটে উঠল নারায়ণ শাস্ত্রী: 'পেটের জন্যে তুমি ধর্ম ছাড়লে? তোমার বাপ-পিতেমোর ধর্ম? যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কী কথা কইব!' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'কিন্তু আপনি কিছু বলুন—' মাইকেল মিনতি করলে রামকৃষ্ণকে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আশ্চর্য, আমি কিছুই বলতে পারছি না। কে যেন আমার মুখ চেপে ধরছে।'

রামকৃষ্ণের চাইতে মাইকেল বয়সে বারো বছর বড়। তা হলে কি হয়, করজোড় করল মাইকেল। বললে, 'আমাকে কেন আপনার কৃপা হবে না? আমি আপনার ভক্ত—'

'সে কথা নয়। আমি তো চাই কথা বলতে, কিন্তু বারে-বারে কে যে আমার মুখ চেপে ধরছে, কথা কইতে দিচ্ছে না।'

মরমে মরে গেল মাইকেল। সে কি এত অভাজন? এত পরিত্যাজ্য?

বাজল বুঝি রামকৃষ্ণের। বললে, 'গান শোনো। গান শুনলে শান্তি পাবে।'

রামপ্রসাদী গান ধরল রামকৃষ্ণ। রক্তাক্ত ক্ষতে যেন প্রলেপ পড়ল। শান্তিতে চোখ বুজল মাইকেল।

কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রীর রাগ যাবার নয়। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনেকার দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে বাংলায় সে লিখলে: পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়া মূঢ়তা।

মথুরকে বামনি বলত, প্রতাপরুদ্র। কত কি করলেন প্রাণ ঢেলে। আলাদা ভাঁড়ার করে দিলেন সাধুসেবার জন্যে। গাড়ি পালকি যাকে যা দিতে বলেছে রামকৃষ্ণ, দিয়ে দিলেন। একবার সাধ হল ভালো জরির সাজ পরবে, আর রুপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাবে। সব কিনে পাঠিয়ে দিলেন মথুরবাবু। জরির সাজ পরে গুড়গুড়ি বাগিয়ে নানারকম করে টানতে লাগল রামকৃষ্ণ—একবার এ পাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে নিচু থেকে। মনকে বোঝাল, মন, এরই নাম সাজ আর এরই নাম রুপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। অমনি খুলে ফেলল সাজ, ছুঁড়ে ফেলল গুড়গুড়ি।

'কামনা থাকতে, ভোগলালসা থাকতে মুক্তি নেই। আমি তারি জন্যে যা-যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম। বড়বাজারের রঙ-করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছে হল। খুব খেলুম।

তার পর অসুখ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা—তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছাড়িনি একটাও—'

মথুরবাবু এসে বললেন, তাঁর স্ত্রী জগদম্বার মরণাপন্ন অসুখ। ডাক্তার-কবরেজরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী তো চলেছেই, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর এই বিষয়-আশয়ও শেষ হয়ে যাবে।

পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ধরে পাশে বসাল রামকৃষ্ণ। কি হয়েছে? এত উতলা হবার আছে কী!

রামকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়লেন। বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হবেই। কিন্তু, বাবা, তোমার সেবা আর করতে পাব না।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মথুরবাবু।

করুণায় মন বুঝি ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'যাও, বাড়ি যাও। তোমার স্ত্রী দিব্যি ভালো হয়ে উঠেছেন।'

ফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন মথুরবাবু। দেখলেন, এ কি ইন্দ্রজাল, স্ত্রীর দেহে আর রোগ নেই।

'ইন্দ্রজাল নয়। ঐ রোগ এই দেহের মধ্যে টেনে এনেছি।' বললে রামকৃষ্ণ।

ছয় মাস ভুগল এক নাগাড়ে।

বর্ষা আসতেই, মথুরবাবু ভাবিত হলেন। গঙ্গার জল এখন লোনা হয়ে উঠবে। আর, খাবার জল বলতে তো ঐ গঙ্গাজলই। নির্ঘাত তবে ফের পেটের অসুখ করবে রামকৃষ্ণের। এখানে থেকে তবে আর কাজ নেই। কয়েক দিন বরং দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে এস।

মন্দ কি। দেখে আসি একবার জন্মভূমি। আট বছর এই দেশ ছাড়া। দেখে আসি একবার সারদাকে।

'মা গো, তুমি যাবে কামারপুকুর?' চন্দ্রমণিকে শুধোল রামকৃষ্ণ।

'না বাবা, গঙ্গাতীর আর ছাড়ব না। এইখানেই কাটিয়ে যাব বাকি জীবন। তুমি বামনিকে নিয়ে যাও।'

না-বলতেই প্রস্তুত বামনি।

আর কে যাবে সঙ্গে?

কেন, হৃদয়? দেশে-গাঁয়ে রটে গেছে, পাগল হয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কাছা খুলে ফেলে আল্লা-আল্লা করছে। স্ত্রীবেশ ধরে গয়না-গাটি পরে ঢপ গাইছে। একবার চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আসি।

মথুরবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে সব গোছগাছ করে দিচ্ছেন। যাতে দেশে গিয়ে রামকৃষ্ণের তৃণমাত্র না অসুবিধে হয়। কামারপুকুরের সংসার তো শিবের সংসার। জানতেন তা দুজনে—তাই 'ঘর-বসত' সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাবার সময় বাপ-মা যেমনটি করে দেয় সাজিয়ে-গুছিয়ে। প্রদীপের সলতেটি থেকে দাঁতের খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

গ্রামে আনন্দ-বাজার বসে গেল। ওরে, শুনেছিস, রামকৃষ্ণ এসেছে। সঙ্গে কে এক ভৈরবী। হাতে মস্ত ত্রিশূল। চল দেখবি চল।

জয়রামবাটিতে সারদাকে খবর পাঠাল রামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস। তুমি নইলে কে ওঁর সেবা করবে? সঙ্গে মা আসেননি, কিন্তু উনিই তোমার শ্বশ্রূমাতা।

সত্যিকারের এই প্রথম স্বামিসন্দর্শন সারদার। চৌদ্দ পেরিয়ে সে এখন পনেরোয় পা দিয়েছে। সে এখন স্বভাবসুন্দরাঙ্গা কিশোরী। শুভাননা। সর্বকল্যাণকারিণী। 'কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধাপুষ্টিঃশ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ'-র সমাহার।

স্বামীকে প্রথম দেখেছে ছ-সাত বছর বয়সে। ভালো করে কিছু মনে পড়ে না। পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছে দিয়েছিল—এই একটু মনে পড়ে ঝাপসা-ঝাপসা। বিয়ের সময় লোকে বলেছিল, পাগলা-জামাই হয়েছে। শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, সবাই বলতে লাগল, 'ও মা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে একটা ভাঙড়ের হাতে পড়লি?' এখন তো শুনি আরো কত কি কথা! কে জানে এখন গিয়ে না-জানি কি রকম দেখব!

বাড়ির মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে সারদা। কিন্তু হৃদয়ের চোখ এড়াবে এমন তার সাধ্য নেই। খুঁজে বার করে ফেলেছে সারদাকে। বলছে, 'এই দেখ তোমার জন্যে কত পদ্মফুল যোগাড় করে এনেছি।' সারদা তো লজ্জায় এতটুকু। 'দাঁড়াও, পদ্ম-ফুল দিয়ে তোমার পাদপদ্মদুখানি পূজা করি।'

কিন্তু যাঁর পাদপদ্মের লোভে সারদা ছুটে এসেছে তিনি কোথায়?

দূর থেকে দেখল রামকৃষ্ণকে। কী রূপ, কী রঙ! সৌন্দর্য যেন স্থির হয়ে বসে নেই, আনন্দে লীলা করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের বার হলেই মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে দেখে রামকৃষ্ণকে। সঙ্গে হৃদয়, ভূতির খালের দিকে বেড়াতে চলেছে এক দিন। মেয়েরা জল ভরছে খাল থেকে। আর জল-ভরা! চার পাশ থেকে দেখছে সবাই একদৃষ্টে। বলাবলি করছে, ওরে, ঐ ঠাকুর—ঐ রামকৃষ্ণ। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে পরস্পরকে।

'ও হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—'

হৃদয় তো অবাক।

'ওরে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে! কী সর্বনাশ! শিগগির আমায় ঘোমটা দিয়ে দে। নইলে আমি এক্ষুনি ন্যাংটা হব।'

'না মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না।' হৃদয় গম্ভীর হয়ে বললে, 'এখানে ন্যাংটা হলে লোকে কী বলবে!'

'নইলে যে পালাবে না মেয়েগুলো।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার মুখ ঢেকে দিচ্ছি। কেউ আর তোমার রূপ দেখবে না।' খালি গায়ে চাদর ছিল রামকৃষ্ণের, তাই দিয়ে হৃদয় তার মুখ ঢেকে দিলে।

রাত থাকতেই ওঠে রামকৃষ্ণ। উঠেই ফরমাস করে সারদাকে আর লক্ষ্মীর মাকে: আজকে এই-এই সব খাব। এই-এই সব রেঁধো। সব যোগাড় করে রাঁধে দুজনে। এক দিন পাঁচফোড়ন ছিল না, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে?' শুনতে পেয়েছে রামকৃষ্ণ। বললে, 'সে কি গো, পাঁচফোড়ন নেই, এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে কেন? তোমাদের এই ফোড়নের

গন্ধের বেন্নন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো আর পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?'

দুই জা তখন লজ্জা রাখবার জায়গা পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেক রকম সুর ধরে রামকৃষ্ণ। 'আঃ, আমার এ কি হল? সকাল থেকে উঠেই কি খাব! কি খাব! রাম রাম!'

এক দিন খেতে বসেছে দুজনে—রামকৃষ্ণ আর হৃদয়। রেঁধেছেও দুজনে—লক্ষ্মীর মা আর সারদা।'

লক্ষ্মীর মা পাকা রাঁধুনি, তার রান্নায় তার বেশি। আর সারদা ছেলেমানুষ বউ, তার রান্না অখাদ্য!

লক্ষ্মীর মা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে তুলে রামকৃষ্ণ বললে, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি।' আর সারদা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে ঠেকিয়ে বললে, 'আর এ যে রেঁধেছে সে ছিনাথ সেন।'

রামদাস ভালো চিকিৎসক আর শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে।

রামকৃষ্ণ বুঝি একটু ঠেস দিলে সারদাকে!

হৃদয় বললে, 'তা হোক। তবে তোমার এ হাতুড়ে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হল। এক পায়ে খাড়া। আর রামদাস বদ্যি? তার অনেক টাকা ভিজিট, সব সময়ে পাবেও না তাকে। লোকে আগে হাতুড়েকেই ডাকে—সে তোমার সব সময়ের বান্ধব!'

'তা বটে, তা বটে।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। 'ও সব সময়ে আছে।'

বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন, ভূতির খালের দিক থেকে একা-একা ফিরছে রামকৃষ্ণ। পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। চেয়ে দেখল মস্ত একটা মাগুর মাছ। পুকুর থেকে রাস্তায় কখন উঠে এসেছে। পায়ে করে ঠেলে-ঠেলে এনে মাছটাকে রামকৃষ্ণ পুকুরে ছেড়ে দিলে। বললে, 'পালা, পালা! হৃদে দেখতে পেলে তোকে আর আস্ত রাখবে না।'

পরে বললে হৃদয়কে, 'ওরে এই এত বড় একটা মাগুর মাছ—হলদে রঙ—রাস্তায় উঠে এসেছিল পুকুর থেকে—'

'কই? কী করলে?' চার দিকে তাকাতে লাগল হৃদয়।

'পুকুরে ছেড়ে দিলুম।'

'ও মামা, তুমি করলে কি গো! এত বড় মাছটা তুমি ছেড়ে দিলে! আঃ, আনলে কি রকম ঝোল হত—'

জয়রামবাটিতে এক দিন ভোর-রাতে একটা বাছুর খুব চেঁচাচ্ছে। গরু দুইছে এ-সময়, মা'র কাছে বাছুরটাকে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। দূরে বেঁধে রেখেছে খুঁটিতে। প্রবোধ মানছে না বাছুর, মা'র স্তন্যের জন্যে আর্তনাদ করছে।

'যাই মা যাই,' ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সারদা, করুণারূপিণী কিশোরী, বলছে, 'আমি এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব—'

দ্রুত পায়ে এসে বাছুরের বন্ধন মুক্ত করে দিলে সারদা।

৩৪

ও মামি, ও কী হচ্ছে?

সারদা হকচকিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীও। বর্ণপরিচয় পড়ছিল দুজনে। পিছন থেকে হুমকে উঠল হৃদয় : 'বই পড়া হচ্ছে?'

সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?'

লক্ষ্মীর বইও কাড়তে গেল, পারলে না। ঝিয়ারি মানুষ, তার সঙ্গে আঁটবে কে! সটান গেল সে পাঠশালায় পড়ে আসতে।

লুকিয়ে সারদাও আরেকখানা কিনে আনাল বর্ণপরিচয়। লক্ষ্মী শিখে এসে পড়াতে লাগল সারদাকে।

'কী হবে লিখে-পড়ে? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়ুক, তাও না।'

পড়ার চেয়ে শোনা ভালো। শোনার চেয়ে দেখা ভালো। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়। আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। শোনার চেয়ে দেখা আরো ভালো। দেখলে আর সন্দেহ থাকে না। শাস্ত্রে অনেক কথাই তো আছে। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন না হলে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে, চিত্তশুদ্ধি না হলে—সবই বৃথা।

তোতাপুরী বলে দিয়েছিল, স্ত্রীকে কাছে-কাছে রাখবি। স্ত্রী কাছে রেখেও যার ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিবেক-বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই আসল ব্রহ্মজ্ঞ।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ। শোনাতে লাগল ঈশ্বরের কথা।

'চাঁদা মামা সকল শিশুর মামা। তেমনি ঈশ্বর সকলের আপনার। তুমি ডাকো তো তোমাকেও তিনি দেখা দেবেন।' কাছে বসিয়ে স্নেহস্বরে বলছে রামকৃষ্ণ : 'বই-শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই-শাস্ত্রের দরকার কি? তখন নিজে কাজ করতে হয়।'

কুটুম্ববাড়ি তত্ত্ব করতে হবে। কি-কি জিনিস কিনবে তারই ফর্দ-সমেত চিঠি এসেছে। কিন্তু চিঠি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক পরে পাওয়া গেল চিঠি। তখন আনন্দ আর ধরে না। দেখ, দেখ, কি লিখেছে চিঠিতে। কি পাঠাতে হবে। পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়। ব্যস, হয়ে গেল। এখন আর চিঠির কি দরকার? উড়েই যাক বা পুড়েই যাক, কিছু আসে-যায় না। আসল খবর জানা হয়ে গিয়েছে।

চিঠির ততক্ষণই দরকার, যতক্ষণ তত্ত্বের খবরটুকু জানা যায়নি। জানার পর শুদ্ধ পাবার চেষ্টা।
কৃপা হলেই পাবে। কিন্তু কৃপা পাবে কি করে? কৃ আর পা, দুয়ে মিলে কৃপা। করলেই পাবে। সুতরাং কাজ করো। কর্তব্য করো। 'শরীরং কেবলং কর্ম।'
'তুমি হবে আমার বিদ্যারূপিণী স্ত্রী।' সারদাকে বললে রামকৃষ্ণ।
বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে রাখে। বিদ্যার সংসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত। ঈশ্বরই তাদের একমাত্র আপনার লোক, অনন্ত কালের আপনার। তারা পাণ্ডবদের মত। সুখ হোক দুঃখ হোক কখনো তাঁকে ভোলে না।
কিন্তু অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান, তবে ঈশ্বর অবিদ্যা করেছেন কেন?
তাঁর লীলা। মন্দটি না থাকলে ভালোটি বুঝবে কি করে? আবার খোসাটি আছে বলেই আম বাড়ে আর পাকে। আমটি তৈরি হলেই তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ক্রমে-ক্রমে ব্রহ্মস্বাদ।
কিন্তু বামনির মোটেই ইচ্ছা নয় সারদার সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সে বলে এতে ব্রহ্মচর্যের হানি হবে।
সরলা সারদা ভয় পায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসে।
একদিন রামকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ সাজাল বামনি। সাজাতেই ভাব হয়ে গেল রামকৃষ্ণের। বামনি সারদাকে ডেকে আনল। বললে, 'কেমন হয়েছে?'
ভাবাবেশ দেখে ভয় পেল সারদা। কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে ছুটে পালাল।
বামনির এমন একটা ভাব, রামকৃষ্ণের যা কিছু দিব্যচেতনা সমস্ত তার জন্যে। অন্ধজনকে সেই যেন দৃষ্টিদান করেছে!
মহামায়ার কি লীলা, বামনির মধ্যে অহঙ্কার ঢুকে গেল। কি থেকে কী যে হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝতে পারল না।
চিনু শাঁখারি তখনো বেঁচে আছে। বুড়ো, অথর্ব। রামকৃষ্ণের কাছে এসেছে প্রসাদ নিতে। তার ভক্তি দেখে বামনি বেজায় খুশি। প্রসাদ পাবার পর এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছে চিনু, বামনি বললে, থাক, এ এঁটো আমি তুলব। চিনু তা মানতে রাজী নয়, কিন্তু বামনির রূঢ় নিষেধের কাছে তার আর হাত উঠল না। কিন্তু হৃদয় এল চোটপাট করে। এ কী অনাচার!
গাঁয়ের বামুনের মেয়ে যারা সেখানে ছিল তারাও বামনির বিরুদ্ধে। এখানে চলবে না এ সব অনাসৃষ্টি।
'চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেব, তাতে কি?' বামনিও ফণা বিস্তার করলে।
'শাঁখারির এঁটো নেবে, থাকবে কোথা?' হৃদয় এল মুখ খিঁচিয়ে : 'বলি, কে তোমাকে জায়গা দেবে? শোবে কোথা?'
বামনি গর্জন করে উঠল : 'শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'
এই থেকে লেগে গেল বিষম ঝগড়া। যেখানে যেমন সেখানে তেমন—এই নীতিবাক্যের ভুল হয়ে গেল বামনির। আর হৃদয়ও কাঠ-গোঁয়ার, দিশপাশের জ্ঞান নেই। মুখের

ঝগড়া না মারামারিতে এসে পেঁাছয়। বামনি বুঝি আসে এই ত্রিশূল উঁচিয়ে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, হৃদয় কি-একটা ছুঁড়ে মারলে বামনিকে। জোরে ছুটে এসে লাগল ঠিক কানের কাছাকাছি। রক্ত পড়তে লাগল। কাঁদতে বসল বামনি।

রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল। 'ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি? ওরে, ও যে ভক্তিমতী যশোদা। এমন হলে যে লোক জড়ো হবে, কেলেঙ্কারি হবে—'

এখন উপায় কি। রামকৃষ্ণই ঠিক করল উপায়। বামনিকে ভাব দিয়ে দিলে। ভয় পাবার ভাব।

থেকে-থেকে উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়। লাহাদের প্রসন্নময়ীকে সম্বোধন করে বলে, 'ওরে প্রসন্ন, আমার এ কী হল? আমি এখন কি করি, কোথা যাই! জগন্নাথ যাই না বৃন্দাবন যাই।'

এক দিন সত্যি-সত্যি কোথায় চলে গেল বামনি কেউ টের পেল না। ছ বৎসরের নিরন্তর-বাসের মায়া কেটে গেল এক মুহূর্তে।

চাতুর্মাস্যের সময় প্রায়ই এখন কামারপুকুরে আসে রামকৃষ্ণ। সেবার এসে অসুখে পড়েছে। পেটের অসুখ। পথ্য সাবু-বার্লি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাট চুকিয়ে শুতে গেছে মেয়েরা। ভাবে টলমল করতে-করতে দরজা খুলে বাইরে হঠাৎ বেরিয়ে এল রামকৃষ্ণ। লক্ষ্মীর মাকে উদ্দেশ করে বললে, 'সে কি গো, তোমরা যে সব শুতে গেলে! আমাকে খেতে দেবে না?'

সকলে তো হতবুদ্ধি। লক্ষ্মীর মা বললে, 'সে কি কথা? এই যে তুমি খেলে দুধ-বার্লি—'

'কই খেলুম! আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। কই খাওয়ালে!'

বুঝতে কারু বাকি রইল না, ভাবাবেশ হয়েছে রামকৃষ্ণের। কিন্তু উপায়?

ঘরে তো কিছুই তেমন খাবার নেই। কি দেব পেট-রোগা মানুষকে?

'ঘরে তো তেমন কিছু নেই। শুধু মুড়ি আছে।' বললে লক্ষ্মীর মা। 'তা, খাবে মুড়ি? তাই দুটি খাও না। পেটের অসুখ করবে না তাতে।'

থালায় করে মুড়ি আনল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'শুধু মুড়ি আমি খাব না।'

কিন্তু ঘরে আর কিছু নেই যে। তোমার এই পেটের অসুখে অন্য-কিছুই বা আর কি দেওয়া যায়? দোকান-পসার এখন বন্ধ। সাধ্য নেই সাবু-বার্লি কিনে এনে তোমাকে এখন জ্বাল দিয়ে দি।

ও আমি খাব না। অভিমানে মুখ ভার করে রইল রামকৃষ্ণ।

ভাইপো রামলালকে তখন বেরুতে হল বাজারে। ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানি, ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙালে। মিষ্টি কিনলে এক সের। বাড়িতে এসে মুড়ির থালার পাশে নামিয়ে রাখল মিষ্টির হাঁড়ি। রামকৃষ্ণের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, আরো দুটি মুড়ি দাও।

থালায় আরো মুড়ি ঢেলে দিলে লক্ষ্মীর মা। আনন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কী সর্বনাশ যে হবে কল্পনা করতেও ভয় পেল সকলে। মাসের অর্ধেক দিন সাবু-

বার্লি খেয়ে যে কোনো-মতে বেঁচে আছে তার এই রাক্ষুসে খাওয়া! এত রাত্রে, পেটের এই অবস্থায়! ডাক্তার-বদ্যিতে আর কুলোবে না।

ভয়ে-ভয়ে রাত কাটাল সারদা। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর মা।

কিন্তু পর দিন দিব্যি সুস্থ আছে রামকৃষ্ণ। দেহে কোনো রোগ-উদ্বেগ নেই। তার দেহে বসে ঐ খাওয়া কে খেয়েছে কে বলবে।

সেবারে এসে শ্বশুরবাড়ি গেছে। কি একটা ক্রিয়াকর্ম ছিল সেদিন, অনেক লোক-খাওয়ানো হয়েছে। রাতের খাওয়া চুকে গিয়েছে অনেকক্ষণ, শুতে গিয়েছে সবাই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'আমি খাইনি না কি! ভীষণ খিদে পেয়েছে যে। কিছু খেতে দাও—'

কি হবে! ঘরে যে এখন কিছুই নেই। মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

খুঁজে-পেতে দেখা গেল হাঁড়িতে কতগুলো পান্তা ভাত শুধু পড়ে আছে। ওমা, তাও কি দেওয়া যায় জামাইকে!

তবু, ভয়ে-ভয়ে, তাই বলতে গেল সারদা। বললে, 'হাঁড়িতে পান্তা ভাত ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তাই নিয়ে এস।' হুঙ্কার ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

তবু কুণ্ঠা যায় না সারদার। বললে, 'সঙ্গে তো আর কোনো তরকারি নেই।'

'আছে।' রামকৃষ্ণ আবার গর্জন করল। 'মাছ-চাটুই যে করেছিলে দেখ এক-আধটু পড়ে আছে কি না—'

সারদা ছুটে গেল রান্নাঘরে। দেখল বাটির এক কোণে ছোট্ট একটি মৌরলা মাছ পড়ে আছে। আর তার আশে-পাশে একটুখানি কাই। তাই রাখলে ভাতের পাশে।

উল্লাস আর ধরে না রামকৃষ্ণের। ছোট্ট ঐ একটি মাছের সহযোগে এক রেক চালের ভাত খেয়ে ফেলল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সারদা। এ কি আহার না আহুতি!

এ নিছক পাগলামি। মনে-মনে আপশোষ করতে লাগল সারদার মা।

শুধু মনে-মনেই বা কেন? স্পষ্টাস্পষ্টিই দুঃখ করলে এক দিন। বললে, 'কী পাগল জামাইয়ের সঙ্গেই আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলে-পিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না—'

শুনতে পেল রামকৃষ্ণ।

বললে, 'শাশুড়ি ঠাকরুণ, সে জন্যে দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলে-মেয়ে হবে যে শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে—'

'তা যা বলে গেছেন তাই ঠিক হয়েছে, মা।' শ্রীমা এক দিন তাই বললেন, স্ত্রী-ভক্তদের। 'আমার নরেন, বাবুরাম, রাখাল, শরৎ। আমার দুর্গাচরণ নাগ—'

ভক্ত মেয়েরা ঘিরে বসল শ্রীমাকে।

'মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপূজা করালে নরেন, আমাকে নিয়ে গেল। আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। মোট চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল নরেন। চারদিকে লোকারণ্য, ছেলেদের খাটা-খাটনির অন্ত নেই। হঠাৎ নরেন এসে আমাকে বললে,

"মা, আমার জ্বর করে দাও"। ওমা, খানিক বাদে সত্যি-সত্যি তার হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেল। সে কি কথা? এখন কি হবে। "সেধে জ্বর নিলুম, মা। ছেলেগুলো প্রাণপণে খাটছে বটে, তবু কখন কি ভুলচুক করে বসবে আর আমি রেগে উঠে কখন থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।" কাজকর্ম চুকে আসতেই বললুম, "ও নরেন, এখন তা হলে ওঠো।" "হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি।" ঝটকা মেরে যেমন তেমনি উঠে বসল নরেন।'

৩৫

এক গলা ঘোমটা টেনে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায় সারদা। যখন পাশে এসে বা বসে তখনো ঘোমটা খোলে না।

কি করে সলতেটি রাখতে হয় প্রদীপে—তা থেকে শুরু করে—কি করে চলতে হয় ট্রেনে-নৌকায় সব তাকে শেখায় রামকৃষ্ণ। গৃহস্থালীর ছোটখাটো ব্যাপার, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির কাঁটাখোঁচা। নেমন্তন্ন বাড়ির ভোজ থেকে শুরু করে শাকপাতার কচু-ঘেঁচু। বাড়ির কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তার ফিরিস্তি। শুধু নিজের বাড়িতেই বা কেন? ধরো আর কারু বাড়িতে বেড়াতে গেলে, তখন সেখানেই বা কেমনধারা চলবে-ফিরবে, জেনে রাখো। আমি না-হয় টাকা ছুঁই না, কিন্তু তোমার হাতে তো টাকা আসবে, করতে হবে কত দেবতা-অতিথির সেবা, কত ভক্ত-বন্ধুর পরিচর্যা—সূক্ষ্ম করে হিসেব রাখবে মনে-মনে। গরমিল-গোঁজামিলের ধার ধারবে না।

শুধু তাই? তার পর ঈশ্বরসংবাদ আছে না? শুধু কি সংসারের রান্নাভাঁড়ারের খবর নিয়ে ক্ষান্ত হবে, নেবে না সেই সমস্তসাক্ষী ভগবানের সম্ভাষণ?

কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়, যেখানে তার ডিম রয়েছে। বড়লোকের বাড়িতে ঝি কাজ করছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে নিজের দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের বলে, আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মনে-মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। তেমনি সংসারে কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরে ফেলে রাখবে।

আর, ঈশ্বরও শুধু এই মনটিই দেখেন। একলব্য মাটির দ্রোণ সামনে রেখে বাণ-চালনা শিখেছিল। তার মনের একাগ্রতায়ই সে-মাটির মূর্তি গুরু হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মন বিষয়ে ফেলে রাখো, ভিজে-দেশলাই হয়ে উঠবে। যতই কেননা ঘষো, জ্বলবে না কিছুতেই।

পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্যে মাঠে ঘুনি পাতে দেখনি? ঘুনির ভেতর চিক-চিক করে জল যায় দেখে ছোট-ছোট মাছগুলোর ভারি ফুর্তি, খেলতে-খেলতে তারাও ঢুকে যায় ভিতরে। যে পথে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে অনায়াসে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর মাছের সঙ্গে খেলা তাদের ভুলিয়ে রাখে। আর বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করে না, সেইখানেই আটকে থাকে। পরে মারা পড়ে। তেমনি সংসারের বাইরের চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ করে ঢোকে আর মায়া-মোহে জড়িয়ে পড়ে পথ খুঁজে পায় না। 'গতায়তের পথ আছে রে তবু মীন পলাতে নারে।'

কিন্তু এমন মাছও আছে যে, ঘুনির কাছে গিয়ে ঐ দেখে লাফিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়।

তাকাও এবার অন্য দিকে। আকাশের দিকে। 'যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ।' যিনি সমস্ত দিক থেকে জগৎকে প্রকাশিত করছেন তিনিই আকাশ।

যিনি সামর্থ্যবান তাঁরই নাম ঈশ্বর। সর্বদা ও সর্বত্র আছেন তাই তিনি ভব। সর্ব-সংহারক বলে শর্ব। রোদন করান বলে রুদ্র। পরমৈশ্বর্যবান বলে ঈশান। কল্যাণকর্তা বলে শিব। পশু ও পাশের ঈশ্বর বলে পশুপতি। সমস্ত বিশ্বে পূর্ণ হয়ে আছেন বলে পুরুষ। সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ামক বলে অন্তর্যামী। ভজনের যোগ্য বলে ভগবান। আর তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকেন বলে তাঁর আরেক নাম বা আদি-নাম 'শেষ।'

তাঁকে প্রণিপাত করো। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দাও।

কিন্তু জানো তো, তিনি আমাদের কাছে কোনো দূরের জিনিস বা দুষ্প্রাপ্য জিনিস নন। তিনি আমাদের বাপ-মা। পালন করেন বলে তিনি আমাদের বাপ, আর সন্তানের সুখ আর উন্নতি কামনা করেন বলে মা।

স্ত্রী-সঙ্গে বসে এমনি সেই অসঙ্গের আলাপ।

ঘৃতকুম্ভসমা নারী আর জ্বলদ্‌বহ্নিসমান পুরুষ—রাখবে না পাশাপাশি। কিন্তু নারী এখানে ঘৃত নয়, সম্মুখে জ্বলছে যে অর্চিষ্মান অগ্নি সে তারই দাহিকা। যে ভাস্বর সূর্য সে তারই দীধিতি। 'দেবতা সা ন মানুষী।'

সেই কোপনি-ধারী সাধুর গল্প জানো না?

গুরু বলছে সাধুকে, নির্জনে গিয়ে সাধনা করো। বনের কোণে কুঁড়ে বেঁধে সাধন ভজনে মন দিয়েছে সাধু। কিন্তু কোত্থেকে জুটল এসে ইঁদুরের উৎপাত। ইঁদুর আর-কিছুই করে না, স্নান করে ভিজে কৌপীন যখন শুকোতে দেয় সাধু, তখন এসে কেটে দেয়। ভিক্ষেয় বেরিয়ে সাধু জনে-জনে নালিশ করে। আপনাকে রোজ-রোজ কে কৌপীন দেবে? একটা বেড়াল পুষুন। উপদেশ দিলে কেউ-কেউ। ভালো কথা—সাধু তখুনি এক বেড়ালের বাচ্চা যোগাড় করলে। বেড়ালের ভয়ে পালাল ইঁদুর। কিন্তু বেড়ালের জন্যে রোজ-রোজ দুধ ভিক্ষে করে আনা কঠিন হয়ে উঠল।

বারো মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? একটা গরু পুষুন। বেড়ালও খাবে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন। তাই সই। দুধালো গরু আনলে সাধু। এখন থেকে ঘরে-ঘরে খড়-বিচালি ভিক্ষে করতে লাগল। নিত্যি-নিত্যি কে আপনাকে খড় জোগাবে? আপনার কুটিরের কাছে পতিত জমি পড়ে আছে, তাই চষে খড় লাগান। মন্দ কি, হাল-বলদ নিয়ে এসে পতিত জমিতে লাঙল চালাল সাধু। এখন তবে গোলাবাড়ি করতে হয়, নইলে ফসল রাখবে কোথায়? সাধু তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় গুরু এসে উপস্থিত। চার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গুরু প্রশ্ন করলেন, এ সব কী? সাধু অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এক কোপনির জন্যে এত কষ্ট! আর সংসারী লোকের স্ত্রী-পুত্র, চাকরি-বাকরি, ঘর-বাড়ি, জিনিস-পত্র, টাকা-পয়সা, লোক-লৌকিকতা—যন্ত্রণার কি অন্ত আছে? তাই তো চৈতন্যদেব বলেছেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

তবে তাদের উপায়? হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, উপায় তুমি।

হ্যাঁ, তুমি। তুমিই সমস্ত জীবের জননী। তুমি সংসারসারভূতা সুরেশ্বরী।

কিন্তু এ সব কথায় সারদার ষোলো আনা সুখ কই? তাকে যে পাড়ার সকলে 'পাগলার বউ' বলে খেপায়। স্বামীনিন্দা সহ্য করতে পারে না কিশোরী। পাছে বাড়িতে থাকলে পাড়া-বেড়ানো মেয়েদের মুখে স্বামীনিন্দা শুনতে হয়, সারদা চুপি-চুপি ভানু পিসির বাড়িতে চলে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে নিরিবিলি।

জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে এই ভানু পিসি। কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। সেই থেকেই আছে একটানা। সারদার উপরে বড় টান। তার পর রামকৃষ্ণ যখন আসে শ্বশুরবাড়ি, তখন আর-আর মেয়েরা তাকে 'খ্যাপা জামাই' বলে খেপালেও সে কিছুই বলতে পারে না, মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

খ্যাপা যখন তখন মুখের আর আগল কি। এমন সব কথা বলে রামকৃষ্ণ, হাসতে-হাসতে মেয়েদের পেট ছিঁড়ে যায়, লজ্জায় পালাবার পথ পায় না।

'বেশ হল, আগড়াগুলো সব উড়ে গেল।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এবার বোসো তবে তোমরা গোল হয়ে। কথা হবে।'

খ্যাপা বাতাস না এলে কি আর আতপের দিন স্নিগ্ধ হয়?

এক দিন ভানু পিসিকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার নাম কি?'

'মানগরবিণী।'

সারদাকে নির্দেশ করল রামকৃষ্ণ। 'এ তোমার কি হয়? কি বলে ডাকে?'

'পিসি বলে।'

'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভানু পিসি।' বলেই গান ধরল রামকৃষ্ণ : 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

মুখুজ্জেদের পাগলা-জামাইয়ের কাছে ভানু পিসি যায়, এতে তার গৌর-দাদার বড়

আপত্তি। কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ—'ঐ গৌরদাদা এল!' অমনি ভয়ে পুঁটলি পাকিয়ে যায় ভানু পিসি; দেখে রামকৃষ্ণ হাসে আর বলে, 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।'

'আপনার কাছে আসি বলে আমার অনেক সইতে হয়।' ম্লান মুখে বললে ভানু পিসি।

'বেশ তো, যখন গৌরদাদা শাসাতে আসবে তখন দু'হাত তুলে নাচবি আর বলবি—ভজ মন গৌর নিতাই। গৌরদাদা ভাববে তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস, আর তোকে কিছু বলবে না।'

জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুরে ফিরছে রামকৃষ্ণ। হঠাৎ ভানুর সঙ্গে দেখা। বললে, 'আমাকে খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস?'

অমনি পান সাজতে ছুটল ভানু পিসি। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখে, রামকৃষ্ণ অনেক দূর চলে গিয়েছে। ভানু পিসি পিছু-পিছু ছুটতে লাগল। কিন্তু মেয়েমানুষ কত দূর ছুটবে? তা ছাড়া রামকৃষ্ণ চলেছে জোর কদমে, যেমন তার অভ্যেস। পিছন থেকে নাম ধরে ডাকে এমনও সাহস নেই। তবু থামছে না ভানু পিসি, গোঁ-ভরে ছুটে চলেছে। দু-একখানা গ্রাম বুঝি পার হয়ে গেল, তবু নিবৃত্তি নেই। হঠাৎ, কেন কে জানে, রামকৃষ্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভানু পিসিকে দেখে চক্ষুস্থির।

'এ কি, তুই এত দূর এসেছিস?'

'আপনি যে তখন পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেছি।' আনন্দে পরিপূর্ণ ভানু পিসি।

ততোধিক আনন্দ রামকৃষ্ণের। বললে, 'তোর হবে—তোর হবে।' বলে হাতে পান নিয়ে হাসিমুখে বললে, 'কী হবে বল দিকি?'

ভানু পিসি চোখ নামাল। তার সে কী জানে।

'তোর আজ ঠেঙানি হবে। মেয়েমানুষ হয়ে এত দূর এলি, এখন বাড়ি ফিরে গেলে গোবেড়েন খাবি। এক কাজ কর। কুমোরবাড়ি থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ি যা। তা হলে সবাই ভাববে কুমোরবাড়ি গিয়েছিলি।'

সেই থেকে ভক্তদের পান খাইয়ে এসেছে ভানু পিসি। বলেছে, ঠাকুরের প্রসাদী পান। ঠাকুর বলে গেছেন, তুমি আমাকে পান খাওয়াবে নিত্যি। ভক্তসেবাই আমার ঠাকুরসেবা।

শ্যামাসুন্দরী, সারদার মা—সেও আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। নির্জনে বসল গিয়ে ঠাকুরের আরাধনায়।

ভানু পিসি বিদ্রূপে ঝলসে উঠল: 'কি গো, তখন না বলতে, খ্যাপা জামাই! কি আকাটের হাতে মেয়ে দিলুম—সারদার কত কষ্ট! এখন কেন? এখন কেন সেই খ্যাপা জামাইয়ের পট পুজো করছ?'

শ্যামাসুন্দরীর বাক্য স্তব্ধ। চক্ষু নিষ্পলক! মেনকাও এক দিন বসেছিল শিবের আরাধনায়।

কামারপুকুর থেকে একবার শিওড়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, হৃদের বাড়িতে। দিদি

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে এক মহা ফ্যাসাদ! দিদি কতগুলো ফুল যোগাড় করেছে, বলছে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করব।

কোনো বারণ শোনে না। ভোলে না ছদ্মবেশে। বলে, গরিবের ঘরে কাঙালের ঠাকুর এসেছ, তোমাকে ছাড়ব না কিছুতেই। জলে পা ধুয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দেব। একটা শুধু বর দাও যেন কাশীতে গিয়ে প্রাণ যায়।

তথাস্তু। সজ্ঞানে কাশীতেই প্রাণত্যাগ করল হেমাঙ্গিনী।

'কিন্তু আমার কেন ঘুম আসে না বলতে পারো?' মধ্যরাত্রের অন্ধকারে বায়ুরোগগ্রস্ত ভানু পিসি কেঁদে ওঠে।

'ঘুম আসে না, ঘুমের ওষুধ তো আছে।' কে যেন বলে ওঠে অন্ধকারে।

'কি ওষুধ?'

'সেই যে ভজ-মন-গৌরনিতাই।'

মনে পড়ে যায় ভানু পিসির। অন্ধকারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। দু'হাত তুলে নাচ শুরু করে আর বলে, ভজ মন গৌরনিতাই। বলে, 'ঠাকুর তুমি দেখ আর আমি নাচি।'

৩৬

তুমি দেখ আর আমি নাচি।

তুমি করাও আমি করি। কর্ম না করলে দর্শন হবে কি করে? পানা না ঠেললে জল দেখব কি করে?

তুমি আছ, শুধু এ জেনে কি বসে থাকলে চলবে? কাঠে আগুন আছে, শুধু এ তত্ত্বে কি ভাত রান্না হবে? পুকুরপাড়ে বসে থাকলেই কি মাছ পাব?

কর্ম করো। কর্মই ফল। খেলাই আসল, হার-জিত কিছু নয়। কর্মেই কৃপা। কর্মেই ভক্তি। কর্ম করতে-করতেই কর্মত্যাগ। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে আরেক হাতে কাজ করছ, শেষকালে এক দিন দু'হাতেই ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরবে।

যদি একবার ভক্তি লাভ হয় তবে বিষয়কর্ম বিস্বাদ হয়ে যাবে। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

তাই তুমি দেখ আর আমি নাচি।

কামারপুকুরে থেকে স্বাস্থ্য ফিরেছে রামকৃষ্ণের। এবার ফিরতে হয় দক্ষিণেশ্বরে।

চল রে হৃদু, মা'র কাছে যাই।
বর্ধমানের কাছাকাছি এসে এক মাঠের মধ্যে বসে পড়ল রামকৃষ্ণ।
ওখানে কি?
দেখছিস না, মাঠময় কেমন কাঁটাফুল ফুটে আছে। জানিস না ঐ কাঁটাফুল মহাদেবের পছন্দ। কাঁটাফুলে পুজো করলে শূলপাণি প্রসন্ন হন।
কিন্তু মাঠময় তো শুধু বিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। হৃদয় ধমকে উঠল।
বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদ নেই রামকৃষ্ণের। সেই মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল শিবপূজায়।
এ ভালো হচ্ছে না মামা। কলকাতায় যাবার এই একখানা মাত্র আজ ট্রেন। সারা রাত আজ আর ট্রেন নেই। যদি ঐ দুপুরের গাড়ি এখন ধরতে না পারি, তবে সারা দিন-রাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে। কে শোনে কার কথা। রামকৃষ্ণ শিবধ্যানে সমাহিত হয়ে রইল।
শুচি-অশুচি জ্ঞান নেই—এ কেমনতরো উন্মাদ! ভীষণ বিরক্ত হল হৃদয়। এখন গাড়ি যদি ফসকে যায় উপায় কি হবে?
হঠাৎ হৃদয়ের সেই সাধুর কথা মনে পড়ে গেল, সেই জ্ঞানোন্মাদ সাধু। উলঙ্গ, গায়ে-মাথায় ধুলো, বড়-বড় নখচুলদাড়ি, কাঁধে মড়ার কাঁথার মত একটা ছেঁড়া কাঁথা। কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় এমন স্তব পড়লে যে মন্দিরটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রসাদ পেতে কাঙালীরা যেখানে বসেছে পাত পেড়ে সেখানে গিয়ে বসল। তাড়িয়ে দিলে কাঙালীরা, চেহারায়-পোশাকে সে কাঙালীদের চেয়েও অধম। তাড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু উপবাসী রইল না। যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে সেখান থেকে কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করে এঁটো ভাত খেতে লাগল—
মামা বললে, ওরে হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়, এ জ্ঞানোন্মাদ।
তাই শুনে হৃদয় দেখতে ছুটল। বাগান পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাধু, হৃদয় তার পিছু নিলে। বললে, মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব কিছু বলে দিয়ে যান—
পাগলের দৃক্‌পাতও নেই। হৃদয়ও নাছোড়বান্দা। সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে, আর মুখে সেই এক বুলি। ভগবানকে কেমন করে পাব, কবে পাব, কোথায় পাব?
হঠাৎ রুখে দাঁড়াল পাগল। পথের ধারে নর্দমা ছিল তারই জল দেখিয়ে বললে, 'এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে তখন পাবি।'
তখন? এ কি একটা মনের মতন কথা হল? নিশ্চয়ই আরো অনেক তর্ক-তত্ত্ব আছে। হৃদয় ফের পিছু নিল। বললে, 'মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে সঙ্গে নিন।'
তবে রে? মাটি থেকে একটা ইট তুলে নিল পাগল। হৃদয়কে মারতে তাড়া করলে। হৃদয় ছুটে পালাল, দেখতেও পেল না কোন দিকে চলে গেল সেই জ্ঞানোন্মাদ।
মামারও এখন দেখি সেই অবস্থা। নইলে মাঠময় বিষ্ঠার মধ্যে বসে শিবপূজা। শুচি-অশুচি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে না পারলে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যাবে না। ঐ দ্বন্দ্ববোধের ঊর্ধ্বেই তো সেই ভূমা-ভূমি। 'শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি।'

পুজো শেষ করে ইস্টিশানে পেঁাছে দেখে—যা ভেবেছিল হৃদয়—কলকাতার ট্রেন চলে গিয়েছে। দিনে-রাতে আর ট্রেন নেই।

'তখন বলেছিলাম না?' হৃদয় খিঁচিয়ে উঠল : 'এখন কি করবে কোথায় থাকবে, দেখ। চেনাশোনা আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই এখানে যেখানে থাকা যায়, খাওয়া যায় দুটি পেট ভরে।'

রামকৃষ্ণ নিরুত্তর। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট। স্থিতি-গতি উদ্যতি-বিরতি সব সমান। ইস্টিশানের অফিসে খোঁজ নিতে গেল হৃদয়। বাঁধাধরা ট্রেন আর নেই বটে তবে একটা সুবিধে হতে পারে। বললে স্টেশন-মাস্টার। কাশী থেকে একটা স্পেশাল গাড়ি আসছে খানিক পরেই ঊর্ধ্বতন এক কর্মচারীর স্পেশাল—দেখি তার মধ্যে কোনো এক ফাঁকে জায়গা করে দিতে পারি কিনা। গাড়ি কলকাতায়ই যাচ্ছে, ভয় নেই।

সাধারণ যাত্রীর অধিকার নেই সেই গাড়িতে কিন্তু স্টেশন-মাস্টারের মধ্যে কি ভাব চলে এল কে জানে, মামা-ভাগ্নেকে একটা নিরালা কামরায় চড়িয়ে দিলে নির্ভাবনায়।

হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার রামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শুনল মথুরবাবু আর তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন বলে ধুয়ো তুলেছেন। তাঁদের সাধ রামকৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে যাক। যাবে?

মন্দ কি। যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে জমায়েত হচ্ছে সেখানে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রকাশিত। এত সাধু ভক্ত যোগী সন্ন্যাসী যেখানে গিয়ে ঈশ্বরভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছে তার মাহাত্ম্য কে অস্বীকার করবে? মাটি খুঁড়লে সব জায়গায়ই জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেখানে পাতকো-ডোবা পুকুর-পুষ্করিণী আছে সেখানে জল সহজে মেলে, সেখানে আর খুঁড়তে হয় না মেহনৎ করে। যেখানে-সেখানেই রান্না করা যায় বটে কিন্তু রান্নাঘরে বেশি সুবিধে।

আমি গেলে আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু হৃদয়রাম।

নিশ্চয়ই যাবে। স-শো লোক চলেছে একসঙ্গে—দস্তুরমত একটা বাহিনী বলতে পারো। থার্ড ক্লাশ তিনখানি আর সেকেণ্ড ক্লাশ একখানি গাড়ি রিজার্ভ হয়েছে। যে কোনো স্টেশনে ইচ্ছেমত কাটিয়ে নেওয়া যাবে। গাড়ির শেষ গন্তব্য কাশীধাম।

কা শীতলা গঙ্গা? কাশীতলা গঙ্গা। সেই কাশী।

মাঘ মাস, ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তীর্থভ্রমণে বেরুল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে ভবতারিণীকে প্রণাম করলে। বললে, 'মা গো, তোকে আরেক বেশে আরেক দেশে দেখে আসি। বেদে যার কথা তন্ত্রেও তার কথা পুরাণেও তারই কথা। সবই তুই। তোর শুধু ভোল ফিরিয়ে মন ভোলানো!'

হলধারী কবেই পূজকের পদ থেকে অবসর নিয়েছে, এখন অক্ষয় বসেছে মন্দিরে। যে খুশি তোর পুজো করুক, আমি এখন পরিত্যক্তকর্মা পরমাত্মা।

বৈদ্যনাথধামে নামল প্রথম তীর্থযাত্রীরা।

কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল অনাথ-দরিদ্রের দিকে। কোন এক গ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছে, দেখল গ্রামবাসীদের পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই এক ফোঁটা। চলতে-

চলতে থেমে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, কোন বৈদ্যনাথকে দেখতে চলেছি? কত দূরে? বৈদ্যনাথকে তোরা চিনবি না। দেখে নে একবার এই অনাথের নাথকে।

'তুমি তো মা'র দেওয়ান।' রামকৃষ্ণ ধরল মথুরকে, 'এদের এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর পেট ভরে খাইয়ে দাও এক দিন।'

মথুরবাবু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলি লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারবো না।'

করুণায় কোমল রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বললে, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। তুই যা তোর দলবল নিয়ে। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের ছেড়ে যাব না কিছুতেই।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথুরবাবু। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন, পাঁটাও। মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন একদিন।

গ্রামবাসীর আনন্দেই রামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্র্যমোচন না করো, তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ?

সাতদিন দেরি হয়ে গেল কাশী যেতে। তা হোক। তবু মা, তুই আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। আমাকে করুণা-কোমলতা দে। আমাকে রসে-বশে রাখ। আমি চিনি খাব, চিনি হব কেন? একটুখানি অহং আমার রেখে দে। সোনার একটু কণা, আগুনের একটি ফিনকি। ওটুকু অহং না থাকলে বিলাস করব কি করে? তুমি-আমি আস্বাদন করব কি করে? কি করে ভক্তের রাজা হব?

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কাশী। 'কাশী সর্বপ্রকাশিকা।' 'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

নৌকো করে ঢুকতে হল কাশীতে। ভাবনেত্রে রামকৃষ্ণ দেখল কাশী স্বর্ণময়ী। ইট-কাঠমাটিপাথর কিছুই নেই। আগাগোড়া সুবর্ণমণ্ডিত। তার মানে অক্ষয় নিত্যধাম এই কাশীধাম—জ্যোতির্ময় সব ভাব আর ভক্তি একে কনকান্বিত করে রেখেছে।

কিন্তু ক'দিন পরেই বললে হৃদয়কে, 'ওরে এখানেও যা সেখানেও তাই। সেখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন এখানকার সেগুলিও তেমনি। এখানে তবে আর কি দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই।'

পরে ভক্তদের তাই বলতেন ঠাকুর, 'ওরে যার হেথায় আছে—তার সেথায় আছে। যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই।'

'যদেতেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।' যা এখানে তাই সেখানে, যা সেখানে তাই এখানে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

কেদারঘাটের পাশে দুখানি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন মথুরবাবু। কাশীতে এসেও তাঁর রাজসিকতার অন্ত নেই। মাথায় রূপোর ছাতা, সঙ্গে আসাবরদার—চলেছেন যেন কোন রাজারাজড়া। বাইরে ঐশ্বর্যের জেল্লা কিন্তু অন্তরে দীনবন্ধুর দাক্ষিণ্য।

রোজ পানসিতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যায় রামকৃষ্ণ। সেদিনও তেমনি যাচ্ছে।

মণিকর্ণিকার পাশে শ্মশান। সেখান দিয়ে যাবার সময় দেখল চিতায় মড়া পোড়ানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় দিক-পাশ আচ্ছন্ন। দেখেই উৎফুল্ল হয়ে নৌকোর বাইরে চলে এল রামকৃষ্ণ, দিব্যভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেল। টলে পড়ে যাচ্ছিল বুঝি, ধরতে এল মাঝি-মাল্লারা। কাউকে ধরতে হল না। রামকৃষ্ণ নিজেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। মুখে দিব্য দীপ্তির প্রসাদ।

কি দেখলাম জানিস? ধ্যান ভাঙবার পর বললে রামকৃষ্ণ। দেখলাম প্রকাণ্ড এক সিতগাত্র পুরুষ শ্মশানে প্রত্যেক শবের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেককে তুলে নিচ্ছে হাতে করে আর তার কানে তারকব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করছে। শবের অন্য পাশে বসে আছে শক্তিময়ী মহাকালী—একে-একে জীবের সকল সংস্কার-বন্ধন খুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্বাণের দ্বার খুলে দিয়ে অখণ্ডের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে। যা বহু জন্মের যোগসাধনায় পাওয়া যায় তা শুধু কাশীতে মরে বিশ্বনাথের থেকে আদায় করে নিচ্ছে।

কাশীতে মৃত্যু মানেই নির্বাণপদবী।

কাশীতে এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী! মা'কে শ্মশানে পোড়াতে এসে যে আর ঘরে ফিরল না, সেই শ্মশানেই থেকে গেল।

কাশীতে একবার পদ্মাসনে গঙ্গার উপর বসে ছিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী। নৌকো করে এক ম্যাজিস্ট্রেট যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। দৃশ্য দেখে তার চোখ তো চড়ক গাছ। নৌকোয় তুলে নিল সাধুকে। কত আলাপ-বিলাপ শুরু করল, কিন্তু সাধু মৌনী।

কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছিল ম্যাজিস্ট্রেটের। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তা দেখতে চাইলে। কেন চাইলে কে জানে। হঠাৎ সাধুর হাত ফসকে জলের মধ্যে পড়ে গেল তরোয়াল। এখন উপায়? ভীষণ চটে উঠল ম্যাজিস্ট্রেট। খুব বকতে লাগল সাধুকে। ঠিক করল পারে গিয়েই পুলিশে দেবে।

পারে এসে নৌকো লাগতেই জলের মধ্যে হাত ডোবাল সাধু। একখানি নয় তিন-তিনখানি তরোয়াল উঠে এল জলের থেকে। তোমার কোনটা? ম্যাজিস্ট্রেট তো অবাক। এইটে তোমার। যেখানা তার ঠিক তা বেছে দিয়ে দিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে। বাকি দু'খানা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

আরেক বার উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাতীরে বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে থাকা অপরাধ। বারে-বারে আইন লঙ্ঘন করছে সাধু, একেবারে হাজতে ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু কতক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেট দেখে গঙ্গাতীরে তেমনি উলঙ্গ হয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে। এ কি, ঘুষ খেয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিলে নাকি হাজত থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট ছুটল অমনি হাজত দেখতে। এ কি! হাজতের মধ্যেই তো বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। অমনি আবার ছুটল গঙ্গাতীরে। গঙ্গাতীরেই তো ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে উলঙ্গ হয়ে। তাকে খালাস দিয়ে দিল। কারাগারের দেয়াল যাকে আবদ্ধ করতে পারে না, বসন তাকে কি করে আবৃত করবে?

সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। সাক্ষাৎ শ্বেতশিখা। সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল করে আছে।
শরীরে কোনো হুঁস নেই। তপ্ত বালিতে পা রাখা যায় না, তারই উপর সুখে শুয়ে আছে। যদি বৃষ্টি পড়ে তেমনি শুয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত হয়ে।
এক দিন নিজ হাতে পায়েস রেঁধে খাইয়ে এল রামকৃষ্ণ। মৌনাবলম্বন করে রয়েছে, তাই কথা হল না। মুখের কথা না হোক, ইশারা-ইঙ্গিতে আলাপ করতে লাগল দুজনে। যেন এক দেশের মানুষ। একই ভাষাভাষি। যেন কত আগের চেনা। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করল ইশারায় : 'ঈশ্বর এক না অনেক?'
ইশারায়ই উত্তর দিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী : 'যদি সমাধিতে দেখ তবে এক, আর যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ তবে বহু। আমি তুমি জীব জগৎ সমস্ত।'
স্বর এক। শুধু রাগরাগিণীর নানা নাম। সদ্বস্তু এক, তার বর্ণনা বিচিত্র। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'
'বুঝলি?' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ, 'একেই বলে ঠিক-ঠিক পরমহংস অবস্থা।'

৩৭

কাশীর থেকে প্রয়াগ। পুণ্য সঙ্গমে স্নান আর তিন রাত্রি বাস চাই প্রয়াগে। মথুরবাবুরা সেখানে মাথা মুড়লেন। রামকৃষ্ণ বললে, আমার দরকার নেই। আমার শরীর কাশীক্ষেত্র। ত্রিভুবনজননী গঙ্গা আমার জ্ঞানগঙ্গা। ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার গয়া। গুরুচরণধ্যানযোগ আমার প্রয়াগ। আর যিনি সকলজনমনসাক্ষী তিনি আমার অন্তরাত্মা। 'দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি।' আমার দেহেই যখন সকলে বাস করছে তখন আমার আবার তীর্থান্তর কী!
প্রয়াগ থেকে ফের সকলে ফিরল বারাণসী। 'বিরিঞ্চি-বিরচিতা বারাণসী'।
এক দিন চৌষট্টি-যোগিনী পাড়া দিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়, কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। 'ওরে হৃদু, ও আমাদের সেই বামনি না?'
সত্যিই তো, সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী। কী আশ্চর্য, এখানে কোথায় আছ?
আছি এ পাড়ায়, মোক্ষদার বাড়িতে। মোক্ষদা আমার মূর্তিমতী প্রণতি।
'তুমি আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন চলো।'
'চলো।'

গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। বললে, মা, তোকে ছেড়ে এখন যমুনায় চলেছি। সেই মুরারিকায়কালিমাময়ী সদাসিতা যমুনা। মা গো, তুই দুর্গা, গঙ্গা, গগন-বাসিনী। তুই পাষাণভেদিনী খড়্গহস্তা। জন্মপ্রবাহহরণী পারায়ণপরায়ণা। আর যমুনা মধুবনচারিণী রাসেশ্বরী। অশেষনায়িকা কৃষ্ণকান্তা। দুজনেই মা, মহানন্দা মোক্ষদাত্রী। দুজনেই প্রাণদা প্রাণনীয়া।

নিধুবনের কাছে বাড়ি ভাড়া করলেন মথুর। কিন্তু চার দিকে চোখ চেয়ে এ সব কী দেখছে রামকৃষ্ণ। দেখছে না কাঁদছে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বলছে, 'কৃষ্ণ রে, সবই তো রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বাঁকাবিহারীর মূর্তি দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। ছুটল আলিঙ্গন করতে। গোবর্ধন দেখে আবার ভাবাবেশ। ভাবাবেশে উঠল গিয়ে একেবারে গিরিচূড়ায়। আর নামে না। তখন ব্রজবাসীদের পাঠিয়ে নামিয়ে আনলেন মথুরবাবু।

সন্ধের দিকে যমুনাতীরে বেড়ায় আর কলিন্দনন্দিনীর গুণগান করে। যমুনার চড়ার উপর দিয়ে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছে রাখালেরা। দেখেই কৃষ্ণের উদ্দীপনা উপস্থিত। 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' বলতে-বলতে ছুটল তাদের পিছু-পিছু। ওরে তোরাই আমার সেই লীলামানুষবিগ্রহ নারায়ণ।

কালীয়দমনের ঘাটে এসে আবার ভাবাবেশ। স্নান করবে কিন্তু শরীরে বশ নেই। ছোট ছেলেটিকে যেমন করে নাওয়ায় তেমনি করে নাইয়ে দিলে হৃদয়।

এইখানেই গঙ্গামায়ীর সঙ্গে দেখা।

ষাট বছর বয়স, নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গামায়ী। ললিতা সখী হয়ে রাধিকার সেবাচর্যা করে। প্রেমরূপা যে ভক্তি করে তার সাধন-মোদন। দুজন দুজনকে চিনে ফেলল।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি ললিতা-সখী।

গঙ্গামায়ী বললে, তুমি রাসেশ্বরী রাধিকা। তুমি আমার দুলালী, রাজদুলালী।

রামকৃষ্ণকে গঙ্গামায়ী দুলালী বলে ডাকে। কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বিষ্ণুমায়া!

গঙ্গামায়ীকে পেয়ে সব ভুল হয়ে যায় রামকৃষ্ণের। কখন বা খাওয়া-দাওয়া, কখন বা বাড়ি ফিরে যাওয়া। কোথায় বাড়ি, কি বা আহার! ভোক্তাও নেই ভোজ্যও নেই চলেছে তবু ভোজনের আস্বাদ।

এক-এক দিন বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসে খাইয়ে যায় হৃদয়। কোনো-কোনো দিন গঙ্গামায়ীই খাইয়ে দেয় রান্না করে।

থেকে-থেকে ভাব হয় গঙ্গামায়ীর। সে ভাব দেখবার জন্যে ভিড় জমে চার দিকে। এক দিন হল কি, ভাবাবেশে গঙ্গামায়ী হৃদয়ের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

'এ তো বড় বিপদ হল দেখছি।' হৃদয় ঝটকা মারল, কড়া গলায় বললে রামকৃষ্ণকে, 'তুমি চলো এখান থেকে। একেবারে সটান দক্ষিণেশ্বর। বিন্দেবনে আর কাজ নেই।' কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠিক করল আর ফিরবে না। গঙ্গামায়ীর আশ্রয়ে থেকে যাবে ব্রজধামে। শ্রীমতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে।

মথুরবাবু ভাবনায় পড়লেন।

ডাকতে বসলেন মহামায়াকে। মা গো, আমার দক্ষিণেশ্বর কি দক্ষিণাহীন হয়ে যাবে? হৃদয় ধমকে উঠল, 'তোমার এত পেটের অসুখ, তোমাকে এখানে দেখবে কে?'

'কেন, আমি দেখব। আমি সেবা করব।' বললে গঙ্গামায়ী।

কিন্তু খাবে কি? শোবে কোথায়?

'সেদ্ধ চালের ভাত খাব। শোব এই গঙ্গামায়ীর ঘরেই। গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের ওদিকে হবে, আমারটা এদিকে হবে। ভাবনা কি।'

'ওসব চলবে না চালাকি।' হৃদয় রামকৃষ্ণের হাত ধরে টানতে লাগল : 'ওঠো। চলো।'

আরেক হাত ধরে টানতে লাগল গঙ্গামায়ী। বললে, 'না, দেব না। কিছুতেই যেতে দেব না।'

দুজনের টানাটানিতে রামকৃষ্ণ নাজেহাল। এক দিকে রাধিকা অন্য দিকে কালী। এক দিকে মহাভাব অন্য দিকে মহামায়া।

সেই টানাটানিতে মা'র কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। মা'র কথা মানে চন্দ্রমণির কথা। মা সেই কালীবাড়ির নবতে বসে আছেন একলাটি। বসে আছেন রামকৃষ্ণের পথ চেয়ে।

মন স্থির করতে আর দেরি হল না রামকৃষ্ণের। বললে, 'না, আমার আর এখানে থাকা হবে না। আমাকে মা ডাকছেন।'

মা সকল তীর্থের ঊর্ধ্বে। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

ওরে সংসারে বাপ-মা পরম গুরু, যথাসাধ্য ওঁদের সেবা করতে হয়। যে চরম দরিদ্র, যার শ্রাদ্ধ করবারও ক্ষমতা নেই সে অন্তত বনে গিয়ে তাঁদের কথা মনে করে কাঁদবে। কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মা'র আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্লাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। মা বারণ করলেও ধ্রুব বনে গিয়েছিল তপস্যা করতে। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রাচার্যকে অমান্য করেছে। আর কৃষ্ণকামিনী গোপিনীরা মানেনি তাদের পতির আধিপত্য।

মা কি কম জিনিস গা? শচী বললেন, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বললেন, 'মা, তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না। তবে জানো তো, সংসারে আমি যদি থাকি, তবে আমার দেহ আর থাকবে না। তবে এটুকু বলে দিচ্ছি মা, যখনই মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার কাছে-কাছেই থাকব।' তবে শচীমাতা অনুমতি দিলেন।

আর, নারদের কথা জানো না? মা তার যত দিন বেঁচে ছিল সে তপস্যায় যেতে পারেনি। সে নইলে মা'র সেবা করবে কে? মা'র দেহত্যাগ হল, তবে বেরুল হরিসাধনে।

'টানাটানিতে মা'র কথা মনে পড়ে গেল। অমনি বদলে গেল সমস্ত। ভাবলুম, মা বুড়ো হয়েছেন, মা'র চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই ঈশ্বরচিন্তা করি নিশ্চিন্ত হয়ে।'

হাজরার মা রামলালকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে, রামলালের খুড়ো-মশায়

যেন হাজরাকে একবার পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে। ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'বুড়ো মা, যাও, একবার দেখা দিয়ে এস।'

কিছুতেই গেল না হাজরা। তার মা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল।

নরেন বললে, 'এবারে হাজরা দেশে যাবে।'

'এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা—শালা। দূর—দূর—'

আচ্ছা, নিজের মা'র রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? এক দিন জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'হ্যাঁ, মা গুরু। ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। মাকেই ধ্যান করবি।'

মা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া নির্দোষা সর্বদুঃখহা। পরমা মায়া পরমা ক্ষমা পরমা শান্তি। মা'র মত এমন ধ্যানের মূর্তি আর কী আছে?

গিরিশ ঘোষ বসল এসে ঠাকুরের পদচ্ছায়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন।

আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে কামারপুকুরের সেই মাগুর মাছটাকে আপনি পায়ে ঠেলে-ঠেলে জলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছটা নিরাশ্রয় হয়ে চলে এসেছিল মাটিতে। আপনি তাকে স্বধামে পাঠিয়ে দিলেন। তেমনি যদি পাপার্ত জীব আপনার পায়ে এসে পড়ে, আপনি তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাবেন না মোক্ষধামে?

আমি পাপ মানি না। পাপী বলে বিশ্বাস করি না কাউকে। আমার যেমন সাধুরূপী নারায়ণ তেমনি আবার ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ—

মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল গিরিশ ঘোষ।

'গাড়ি করে যাচ্ছি, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। শোন, বলি তোকে, কাঁদতে হবে। মল্লিকের মা জিগগেস করলে, ওদের কি কোনো মতেই উদ্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা! বললুম হ্যাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদা চাই। তাই তোকে বলি, তুই কেঁদে-কেঁদে মাকে একবার ডাক মনের থেকে। যতই তোর পাপ হোক, যতই তুই ক্লেদে-আবর্জনায় ডুবে থাক, মাকে ডাকলে মা এসে তোকে মুক্ত করে দেবেনই—'

তেমন গিরিশ গেল আবার শ্রীমা'র পদাশ্রয়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন।

আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে জয়রামবাটিতে একটা বাছুরের কান্না শুনে আপনি তার বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন তাকে তার অমৃতলাভের অধিকার। তেমনি, মা, কত বাসনা-কামনার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। স্বহস্তে খুলে দিন শৃঙখল। বুঝতে দিন পরমার্থের আস্বাদ।

'ঠাকুর বলতেন বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না। তুমি তো সম্পূর্ণ বেল। তুমি তো ভৈরব। তোমার তবে আর ভয় কি।'

গিরিশ ঘোষ স্তব করতে বসল।

'জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।'

৩৮

মথুরায় গেল রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল ধ্রুব ঘাটে। স্পষ্ট দেখল সেই জন্মাষ্টমীর দৃশ্য। শিশু-কৃষ্ণকে বুকে করে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে বসুদেব।

দিন পনরো ছিল মোট বৃন্দাবনে। ছিল বৈষ্ণববেশে। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ডোর-কোপনি। কপালে-গলায় বুকে-বাহুতে তিলক আঁকা। কাঁধে কাঁথার ঝুলি। কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা।

বামনিকে বললে, 'কোথায় মরবে? কাশী না বৃন্দাবন?'

'কাশী।'

তবে ফিরে চলো কাশীতে। স্বস্থানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হও।

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শুনব।'

মদনপুরায় মহেশ সরকার ওস্তাদ বীণকার। দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড নাম-ডাক। হৃদয় খবর নিয়ে এল। চল্ তবে যাই ওস্তাদের বাড়িতে। বীণ শুনে আসি।

মথুরবাবু বললেন, 'ওখানে যাবে কেন? তাঁকে এখানে ডেকে আনি, ফরমাস মতো শোনো তোমার যতো ইচ্ছে—'

রাখো তোমার মিথ্যে মর্যাদার চটকদারি। এত বড় যে বাজিয়ে সে তো প্রকাণ্ড সাধক, তার খেয়াল রাখো? স্বয়ং বিশ্বযন্ত্রী ঈশ্বর তার স্পর্শে এসে ঝংকৃত হচ্ছেন। সে তো বিভূতি-ভূষিত। চল রে হৃদু শুনে আসি। যা-ই শোনা তাই দেখা।

'যাহা শুনি কর্ণপুটে সকলি মা'র মন্ত্র বটে।'

দুজনে এসে হাজির হল মদনপুরায়। সটান মহেশ সরকারের বাড়িতে। মহেশ সরকার বাইরের ঘরেই বসেছিল। রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শোনাও।'

এ যেন স্বয়ং বীণাবাদিনীর আদেশ। মহেশ সরকার বীন তুলে নিল। ঝংকার তুললে।

সুর-সাগরে অমৃতের ঢেউ খেলে গেল। মুহূর্তে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, 'মা গো, আমায় বেহুঁস করে রাখিস নে, আমায় হুঁস দে! আমি ভালো করে বীণা শুনি।'

রামকৃষ্ণ সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল। নেমে এল অনুভূতির ভূমিতে। বাহ্যজ্ঞানের শেষ প্রান্তে। ঠায় তিন ঘণ্টা বীণ শুনলে একটানা।

শুধু কি বীণা শুনলাম? শুনলাম এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিটাই একটা অপূর্ব সুর-ঝংকার। গ্রহে-নক্ষত্রে বৃক্ষে-তৃণে, নীহারিকা থেকে ধূলিকণায়, প্রত্যেকটি পলায়মান

মুহূর্তকণায়, বাজছে এই গীতছন্দ। ছুটেছে ভুবনপ্লাবনী সুরশৈবলিনী। যা শোনা তাই আবার দেখা।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই সুরশব্দ যেন একটা উজ্জ্বল চৈতন্যের মত প্রতিভাত। যেন সূর্য উঠেছে রাত্রির আকাশে। ইন্দ্রিয়ের জগতে চৈতন্যের আবির্ভাব। হৃদাকাশে চিদাদিত্য।

বীণার সঙ্গে-সঙ্গে রামকৃষ্ণ গলা মিলিয়ে গান ধরল।

মথুরবাবু বললেন, 'এবার গয়া যাব। তুমি যাবে?'

সর্বনাশ! গয়ায় গেলে এ দেহ কি আর থাকবে? জানো না আমার বাবার সেই স্বপ্নের কথা?

তাই গয়ায় আর নামলেন না মথুরবাবু। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আবার সেই অনন্ত আনন্দ-তীর্থ।

রামপ্রসাদ গেয়েছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি। রামকৃষ্ণ গাইলে, 'এ সংসার মজার কুটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।'

বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ড থেকে ধুলো নিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণ। কিছুটা পঞ্চবটীর চার দিকে ছড়িয়ে দিল আর কতক পুঁতলে তার সাধন-কুটিরের মধ্যে। এই সেই কুটির যেখানে বসে হয়েছিল তার নির্বিকল্পসমাধি। হয়েছিল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

'ব্রহ্ম কেমন বল না?'

ঘি খেয়েছিস তো? বল তো কেমন ঘি? কেমন ঘি, না, যেমন ঘি! তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। তাকে বোঝাব কি দিয়ে?

সেই পণ্ডিতের গল্প জানো না? এক রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাত। আর পড়ার শেষে রোজই রাজাকে জিগগেস করত, রাজা, বুঝেছ? আর রাজাও রোজ বলত, আগে তুমি বোঝো। পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে ভাবত, রাজা অমন ধারা রোজ বলে কেন? ভাবতে-ভাবতে জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে, আসল হচ্ছে হরি-পাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে। রোজ কত বক্তৃতা ঝাড়ত, আজ যাবার আগে বলে গেল দুটি কথা : 'এবার বুঝেছি।'

তাই বলি, কলকলানি ছাড়ো। যতক্ষণ ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণ কলকল করে। পাকা ঘিয়ে আর শব্দ নেই। খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলেই ভকভকানি ওঠে। কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁর আনন্দের খবর পাওয়া যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে মৌমাছি আর ভনভন করে না।

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

শশধর পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। বললে, 'সে কি? আপনারো তবে ছিল বিচারবুদ্ধি?'

'তা, একটু-আধটু ছিল বৈ কি।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠল শশধর। বললে, 'তবে বলে দিন আমাদেরো যাবে। আপনার কেমন করে গেল?'

ঠাকুর বললেন, 'অমনি এক রকম করে গেল।'

আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।

সেই এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন নানা রঙের সুতো কাটছে, বাইরের বেয়ানকে দেখে ভারি খুশি। কত দিন পরে এলে, যাই তোমার জন্যে কিছু জলখাবার আনি গে। যেই জলখাবার আনতে গেছে সেই ফাঁকে বাইরের বেয়ান এক তাড়া রঙিন সুতো বগলের তলায় লুকিয়ে ফেললে। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান বুঝতে পারলে বাইরের বেয়ানের কান্ডখানা। তখন সে এক ফন্দি ঠাওরালে। বললে, কত দিন পরে এলে, এস আজ দুজনে একটু আনন্দ করি। কি আনন্দ? এস দুই বেয়ানে নৃত্য করি। ভালো কথা। দুই বেয়ানে নাচতে লাগল। ঘরের বেয়ান দেখল বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই নৃত্য করছে। হাত না তুলে নাচ কি একটা নাচ? ঘরের বেয়ান তখন বললে, এমন আনন্দের দিনে এস আজ হাত তুলে নাচি। ভালো কথা। কিন্তু বাইরের বেয়ান এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগল। ও আবার কেমন নৃত্য? এস, দু হাত তুলে নাচি। এই দেখ—ঘরের বেয়ান দু হাত তুললে। বাইরের বেয়ান যে-কে-সে। তেমনি বগল টিপে এক হাত তুলেই সে নাচতে লাগল। বললে, যে যেমন জানে বেয়ান—

আমি কিছুই জানি না। আমি তাই দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার সরল শরণাগতি। তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের শুধু সেই তীর্থভ্রমণের কথা। তা ছাড়া আবার কি। মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।

কী পেলেন তীর্থ করে?

কী পেলাম? জ্ঞান পেলাম। যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা-হেথা, তখনই জ্ঞান। যা মন চায় তারই পিছে ধায়। কিন্তু ছুটতে হবে কেন? যা মন চায় তাই মনের মাঝখানে। যা হাত চায় ধরতে তাই হাতের কাছাকাছি।

তামাক খাবে, তাই গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে। ঢের রাত হয়েছে, প্রতিবেশী ঘুমে অচেতন। অনেক ধাক্কাধুক্কি, অনেক হাঁক-ডাক। ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীর। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল—এ কি, এত রাতে কি মনে করে। আর কি মনে করে! তামাক খাব কিন্তু টিকে ধরাবার দেশলাই নেই। তারি জন্যে এত কষ্ট, এত হৈ হল্লা! তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে—সে আছে কি করতে?

হৃদাকাশে চিদাদিত্য। চলেছি আমরা তবে আর কোন দেশে কোন সূর্যের সন্ধানে?

কথাটা এই, বুড়ি ছুঁয়ে যা ইচ্ছে কর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তার লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু শহরে এসে হেথা-হোথা ঘোরাঘুরি করে নানা রকম আমোদ করে বেড়াচ্ছে। পথে আরেক মুসাফির সাধুর সঙ্গে দেখা। মুসাফির বললে, এত যে চার দিকে রঙ দেখে বেড়াচ্ছ, তা তোমার পোঁটলাপুঁটলি কোথায় রাখলে? কেন—আগে বাসা ঠিক করলাম, তালা-চাবি কিনলাম, পরে পোঁটলাপুঁটলি ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। বন্ধ করে রেখে তবে আমোদ করতে বেরিয়েছি।

জানো, শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন হল। বহু লোকের আসর

বসল। মাকে বললুম, মা এ সব কি সত্য? সত্য যদি হয় তবে দেশের জমিদার কেন আসবে না? এসে গেল জমিদার। সেধে গায়ে পড়ে আদর করে কথা কইলে।

ওরে হৃদু, একটি সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়।

হৃদয় তো অবাক।

ওরে নিয়ে আয়। আমি পুজো করব।

বুঝি মামীর কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। সেই তার পদ্মদল দিয়ে পাদপদ্ম পুজো করার কথা। কিন্তু কোথায় মামী!

চৌদ্দ বছরের একটি সুন্দরী সধবা কন্যা যোগাড় করল হৃদয়। কোন বাড়ির বউ বা মেয়ে। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ ভগবতী। পূজা করলে। প্রণাম করলে। ওরে তোরা কেউ প্রণামীর টাকা এনে দে মাকে।

তাতেও তৃপ্তি নেই রামকৃষ্ণের। যখন যে কুমারী মেয়ে কাছে পায় তাকে ধরে এনে পুজো করে। হোক সে যত অকুলীন যত অপরিচ্ছন্ন।

শুদ্ধাত্মা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ।

রামলীলা দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। যারা রাম-লক্ষ্মণ সেজেছিল, হনুমান-বিভীষণ সেজেছিল সবাইকে পুজো করতে বসল। মনে হল, আসলে-নকলে ভেদ নেই। নারায়ণই এ সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন।

বৈষ্ণবচরণও তাই বলত। বলত, নরলীলায় বিশ্বাস হলেই তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে।

বকুলতলায় ঘাটের কাছে এক দিন দেখল নীলাম্বরী পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মেয়ে না পথের মেয়ে নজর করে দেখতেও চাইল না। মুহূর্তে সীতার উদ্দীপন এসে গেল। দেখল সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে রামের কাছে যাচ্ছে।

'এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি।' বলে হৃদয়রাম।

বললে কি হয়, কেবল জমি-জমি করে। এত যার সেবা-পূজা করছে তার সংগ-স্পর্শেও যেন কিছু সুফল হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তার হাতের জিনিস, রামকৃষ্ণের পায়ে কাউকে হাত ঠেকাতে দিতে পর্যন্ত সে নারাজ, তবু হাতে পেয়েও আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। হৃদয় টাকা খুঁজছে, জমি খুঁজছে, গরু খুঁজছে।

এক দিন ধরল গিয়ে শম্ভু মল্লিককে। বললে, 'আমায় কিছু টাকা দাও।'

শম্ভু মল্লিকের ইংরিজি মত। বললে, 'তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তোমার তো দিব্যি শরীর আছে, তুমি তো খেটে খেতে পারো।'

'দিব্যি শরীর?'

'যা হোক কিছু রোজগার তো করছ। তোমায় দেব কেন? যারা খুব গরিব, কিংবা কানা-খোঁড়া তাদের দিলে কাজ হয়।'

'থাক মশাই, ঢের হয়েছে।' হৃদয় ঝলসে উঠল : 'আমার টাকায় কাজ নেই। ঈশ্বর করুন আমার যেন কানা-খোঁড়া হতদরিদ্দির না হতে হয়। আপনারো দিয়ে কাজ নেই, আমারো নিয়ে কাজ নেই। খুরে দণ্ডবৎ মশাই।'

রামকৃষ্ণকে গিয়ে ধরল। কি এমন ভাবের ঢেউ দিয়েছ! তোমার মা'র কাছে গিয়ে কিছু সিদ্ধাই চাইতে পার না? যাতে করে কিছু খাঁটি দ্রব্য লাভ হয়

তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারো না? তোমার এ ভাব দিয়ে কি অভাব মিটবে?

আবার? ধমকে উঠল রামকৃষ্ণ। তোর পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই চাইতে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তা আমি ভুলিনি। জানিস তো, 'মাগনেসে ছোটা হো যাতা'। এমন যিনি ভগবান তিনি যখন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁকে বামন রূপ ধরতে হয়েছিল। কেন মিছিমিছি চাইতে গিয়ে ছোট হবি?

রাখো ওসব তত্ত্ব কথা। তত্ত্ব কথায় পেট ভরে না। হৃদয় একটা এঁড়ে বাছুর কিনলে। ঘাস খাওয়াবার জন্যে নিত্যি সেটাকে বাগানে বেঁধে রাখে। কত যত্ন-আত্তি করে। সোহাগ করে গলায়-পিঠে হাত বুলোয়।

'রোজ ওটাকে ওখানে বেঁধে রাখিস কেন রে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'ওটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।'

'কেন, সেখানে কী?'

'বড় হলে সেখানে ও লাঙল টানবে।'

কোথায় কামারপুকুর, শিওড়, আর কোথায় কলকাতা। বাছুরটা সেখানে যাবে ঐ পথ ভেঙে! সেখানে গিয়ে বড় হবে! বড় হয়ে লাঙল টানবে!

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ।

এরই নাম মায়া, এরই নাম সংসার।

চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। যাতে ইঁদুর ঐ চালের সন্ধান না পায়, আড়তদার একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি খেতে মিষ্টি, ইঁদুরগুলো তাই সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর পায় না।

ওরে, মায়াকে চিনতে চেষ্টা কর। মায়াকে যদি চিনতে পারিস, মায়া আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ছেলেটা বললে, আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে। হরিদাস হাসতে-হাসতে চলে গেল।

হরিদাসকে চিনবে না হৃদয়। তার বাঘের ছালেই সে মাতোয়ারা।

৩৯

আমার তো মামাই আছে। আমার আবার ভাবনা কী! আমার আবার কিসের সাধন-ভজন! হৃদয় ডঙ্কা মেরে বেড়ায় আর বিষয়-আশয়ের ফিকির খোঁজে। কোথায়

একখানা জমি, কোথায় একটা গরু, কোথায় কটা টাকা! পরিবারের জন্যে একখানা গয়না, নিজের জন্যে একখানা শাল।

সাধক-ভক্তদের কাছে থেকে শোনে যখন রামকৃষ্ণের অলৌকিকত্বের কথা, তখন বলে, ভালোই তো, আমার মেহনত কমল। ঐ যে কথায় বলে না, মামার হলেই ভাগনের হল। আমারো হয়েছে তাই। ওর হওয়াতেই আমার ষোলো আনা হয়ে আছে। মহাদেব যখন পার হবেন তখন নন্দী-ভৃঙ্গীকেও নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

তার পরে পরিচর্যা কম করছি? আমি না হলে ওর সাধুগিরি বেরিয়ে যেত! আমি আছি বলেই ওর এত জেল্লা-জমক। আমাকে কি আর ও ফেলতে পারে?

আমি তাই খাই-দাই আর তুড়ি মারি। আর যদি পারি তো এই ফাঁকে কিছু গুছিয়ে নিই চাল-কলা।

এমনি সময় তার স্ত্রী মরল। মুহূর্তে মন কেমন উলটো-মুখো হয়ে গেল। সংসার যেন উড়ে গেল তাশের ঘরের মত। টাকার তোড়া মনে হল ধুলোর ঝোড়ার মত।

সেও খুলে ফেলল পরনের কাপড়, ছুঁড়ে ফেলল গলার পৈতে। উগ্র ভঙ্গি করে বসল ধ্যানাসনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে এক দিন ধরল গিয়ে রামকৃষ্ণকে। বললে, 'তোমার যেমন ভাব-টাব হত, তেমনি আমার করে দাও। আমাকে ডুবিয়ে দেও অতলে। দেখাও তোমার মহামায়াকে—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'তোর ও সবে দরকার নেই।'

'আলবৎ আছে।' গর্জে উঠল হৃদয়। বললে, 'তুমিই ফল পাবে আর কেউ পাবে না? মা কি তোমার একলার?'

'ওরে, শুধু আমাকে সেবা করলেই তোর ফল হবে।'

'ঢের সেবা করেছি এত দিন। কিছু হয়নি। আমার এখন ভাব চাই। আমাকে ভাব দাও।'

'কী বলিস পাগলের মত!' রামকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'আমরা যদি দুজনেই ভাবে বিভোর হয়ে থাকি, তখন কে কাকে দেখবে?'

'তা আমি জানি না।' হৃদয় ছাড়বার পাত্র নয়। তাকে তখন বৈরাগ্যে পেয়ে বসেছে। বললে, 'আমাকে তুমি বলে দিয়ে যাও, কি করে কি হবে—'

'আমার ইচ্ছায় কিছুই হবার নয়। সব মা'র ইচ্ছে। মাকে গিয়ে ধর, মা'র যদি ইচ্ছে হয়, তোরও হবে। যদি ইচ্ছে করেন নিঃস্বকেও তিনি বিশ্বজয়ী করতে পারেন।'

বেশ, তবে মাকেই ধরব। এই ধরলাম। এই বসলাম দৃঢ়াসনে।

আস্তে-আস্তে দর্শন হতে লাগল হৃদয়ের। পূজায় বা ধ্যানে বসে শুরু হল অর্ধ-বাহ্যদশা। কখনো বা নিবিড় ভাবাবেশ।

মথুরবাবু প্রমাদ গণলেন। জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণকে, 'হৃদয়ের আবার এ সব কী হচ্ছে? ঢঙ না কি?'

'না। খুব ব্যাকুল হয়ে মাকে ধরেছিল, মা-ই এই ভাব এনে দিয়েছেন।'

'সর্বনাশ। তা হলে কী হবে হৃদয়ের?'

'কিছু ভয় নেই। মা-ই সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দু দিনে তাকে ঠান্ডা করে দেবেন।'

মথুরবাবু বুঝলেন এ সবই রামকৃষ্ণের খেলা। বললেন, 'বাবা, তুমিই ওকে ভাব দিয়েছ, তুমিই আবার ওকে ঠাণ্ডা করে দাও। আমরা তোমার দুই ভৃত্য, নন্দী আর ভৃঙ্গী, আমরা তোমার কাছে-কাছে থাকব, তোমার সেবা-চর্যা করব। আমাদের আবার এ ছাড়া ভাব কি, এ ছাড়া কাজ কি। আমাদের আবার কিসের অদ্বৈত অবস্থা!'

পঞ্চবটীর দিকে চলেছে রামকৃষ্ণ। হয় তো দরকার হতে পারে, হৃদয় গাড়ু-গামছা নিয়ে চলল পিছু-পিছু। যেতে-যেতে অপূর্ব দর্শন হল তার। অলোক-অবলোকিত দর্শন। দেখল রামকৃষ্ণ দেহধারী মানুষ নয়, একটি চলমান জ্যোতি-বর্তিকা। দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচি। সেই আলোতে পঞ্চবটী প্লাবিত, উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দুখানি পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। যেন শূন্য সরোবরে রক্ত পদ্ম চলেছে ফুটতে-ফুটতে।

হৃদয় চোখ মুছল। সব ঠিক আছে। শুধু রামকৃষ্ণই আর দেহে নেই, শিখাময় হয়ে গিয়েছে।

তাকালো সে নিজের দিকে। এ কি! তারও দেখি দিব্যসত্তা, সেও দেখি নিরঙ্গ-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন ঐ সম্মুখবর্তী দিব্য-অঙ্গেরই অংশস্বরূপ। দেবতার পশ্চাতে দেবানুচর। দেবতার সেবা-সঙ্গ করবার জন্যে দেববেশে তার এই পৃথক-স্থিতি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হৃদয়, 'ও রামকৃষ্ণ! শুনছ? আমরা মানুষ নই, আমরা দেবতা।'

একবার চেঁচিয়ে ক্ষান্তি নেই হৃদয়ের। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল অবোধের মত : 'ও রামকৃষ্ণ! দাঁড়াও! দেখছ আমরা কে! আমরা তবে কেন এখানে পড়ে আছি?'

'ওরে থাম, থাম—চেঁচাস নে—' রামকৃষ্ণ মিনতি করল।

'কেন থামতে যাব? তুমিও যা আমিও তাই। আমরা দু জনেই অবতার।'

'ওরে থাম, লোকজন সব এখুনি ছুটে আসবে।'

'আসুক না লোকজন।' হৃদয় তবু থামবে না কিছুতেই। সমানে চেঁচাতে লাগল। 'এ দেশে থেকে আর আমাদের লাভ কি? চলো অন্য দেশে যাই। দেশে-দেশে গিয়ে জীবোদ্ধার করি।'

কিছুতেই স্তব্ধ হবে না হৃদয়।

রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে এল হৃদয়ের কাছে। তার বুকে হাত ঠেকিয়ে দিলে। বললে, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে।'

দিব্যদর্শন ছুটে গেল মুহূর্তে। আনন্দের সাগর এক শ্বাসে শুকিয়ে গেল। সেই শরীরী শিখা নিবে গিয়ে মূর্ত হল রক্ত-মাংসের দেহ।

'মামা, এ কী করলে?' কেঁদে ফেলল হৃদয়। 'আমাকে জড় বানিয়ে দিলে?'

'তোকে শুধু একটু স্তব্ধ করে দিলাম।'

'আমি আর দেখতে পাব না সেই দৃশ্য?' নিঃস্বের মত তাকিয়ে রইল হৃদয়।

'তুই যে বড্ড গোল করিস। একটু কি দর্শন পেয়েই একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলি। দেশশুদ্ধ লোক ডেকে হাট বাধাবার যোগাড়।'

দরকার নেই রামকৃষ্ণে। আমি একাই পারব। রামকৃষ্ণ যদি পেরে থাকে, আমিই বা কম কিসে। ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল হৃদয়। গভীর রাত্রে উঠে-উঠে যেতে লাগল পঞ্চবটী।

ঠিক করল রামকৃষ্ণ যেখানে বসে জপধ্যান করত সেখানেই আসন করতে হবে। হয় তো সেই জায়গাটিই পয়মন্ত। হয় তো বা মাটির কোনো গুণ আছে। দেখি না কি ফল হয়!

যেই সেই জায়গাটিতে বসেছে আসন করে, অমনি চীৎকার করে উঠল : 'মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। শিগগির বাঁচাও।'

সে আর্তনাদ শুনতে পেল রামকৃষ্ণ। ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল ঘর ছেড়ে। মুখে এক করুণ জিজ্ঞাসা : 'কি রে, কি হয়েছে?'

'এইখানে ধ্যান করতে বসা মাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে।' যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল হৃদয়। 'সারা গা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।'

'তুই কেন এ সব করিস বল তো? তোকে বলেছি না আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। কেন তবে এ সব ঝামেলা করছিস? নে, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি তোকে—' রামকৃষ্ণ তার গায়ে স্নেহকরুণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সেই স্পর্শে শান্তি হয়ে গেল হৃদয়ের। গঙ্গাস্নানের মত এল যেন শীতল নির্মলতা। বুঝলে সেবা ছাড়া আর তার পথ নেই। শুশ্রূষা ছাড়া নেই তার আর কোনো জিজ্ঞাসা।

বেশ আছি। যেখানে আছি, সেখানেই আমার রামের অযোধ্যা। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমার শুধু হরিনাম। তা হলেই সব পাপ-তাপ চলে যাবে। পাপ-হরণ করেন বলেই তো তিনি হরি। দেহবৃক্ষে পাপ হচ্ছে পাখি আর নামকীর্তন হচ্ছে হাততালি। যেমন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ থেকে পালিয়ে যায় অবিদ্যা।

যা আমার হবার নয় তার পিছনে ছুটি কেন? আমার শুধু ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা। 'হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।'

এই সব ভাবে বটে কিন্তু মনের আনাচে কোথায় একটু অহং থেকে যায়। কার্নিশের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে থাকে অশ্বত্থের বীজ, তা থেকে ফেঁকড়ি বেরোয়।

হৃদয় বললে, বাড়িতে এবার দুর্গোৎসব করব। মা আমার পুজো নেন কি না দেখতে হবে। মথুরবাবুকে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

'তা দিচ্ছি।' মথুরবাবু রাজী হলেন একবাক্যে। বললেন, 'কিন্তু বাবাকে নিয়ে যেতে পাবে না।'

সে কি কথা? আমার বাড়িতে প্রথম পুজো, মামা থাকবে না?

'নাই বা থাকলাম। তুই তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হোস নে হৃদু।' সান্ত্বনা দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি রোজ সূক্ষ্ম দেহে তোর পুজো দেখতে যাব। আর তোকে বলছি, আর-কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, কিন্তু তুই পাবি।'

আরো শোন, বলে দিই, কাকে দিয়ে প্রতিমা গড়াবি, কে হবে তন্ত্রধারক। নিজের ভাবে নিজেই পুজো করবি। আর শোন, একেবারে উপোস করে থাকিস না, দুধ গঙ্গাজল আর মিছরির সরবৎ খাবি। বুঝলি?

হলও তাই। রোজ পুজো-সাঙ্গের পর রাতে আরতি করবার সময় হৃদয় দেখতে পেত রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমার পাশে।

আশ্চর্য, প্রতিমা প্রতিমাই থাকে। কিন্তু করুণাঘন রামকৃষ্ণ দাঁড়ায় এসে ভক্তের আঙিনায়।

চল তবে সেই করুণা-নিলয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে তারই সেবারাধনায় মন দিই। হৃদয়ও তাই ফিরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। শুধু মাঝখান থেকে আরেকবার বিয়ে করে নিলে।

৪০

সতেরো বছরের সুরূপ ছেলে এই অক্ষয়। মা-বাপ-মরা ছেলে। বসেছে বিষ্ণুমন্দিরের পূজারি হয়ে। ধ্যানে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে দু-তিন ঘণ্টা। নিজের হাতে রান্না করে খায়। সারা দিন গীতা পড়ে।

শুধু ভাই-পো বলে নয়, ভক্তির জোর দেখে তাকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ।

সেই অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অসুখে পড়ল। ডাক্তার বললে, সামান্য জ্বর, সেরে যাবে। কিন্তু হৃদয়কে ডেকে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'হৃদু লক্ষণ বড় খারাপ। ছোঁড়া বাঁচবে না।'

'ছি মামা! তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলো কেন?'

'তার আমি কি জানি! মা যেমন বলান তেমনি বলি। নইলে, বল্, আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় চলে যায়?'

হৃদয় উঠে-পড়ে লাগল কি করে ভালো করা যায় অক্ষয়কে। যত ডাক্তার আছে কাউকে বাদ দিলে না। কিন্তু যার ডাক পড়েছে ডাক্তার তার কী করবে।

মাস খানেক ভুগে এমন জায়গায় এসে ঠেকল যখন সলতে আর উস্কে দেওয়া যায় না। এল সেই অন্তিম মুহূর্ত। রামকৃষ্ণ পাশে বসে অক্ষয়কে সম্বোধন করে বললে গাঢ়স্বরে, 'অক্ষয়, বলো, গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।' ঐ মন্ত্র তিন-তিন বার আবৃত্তি করল অক্ষয়। তার পর ধীরে-ধীরে লীন হয়ে গেল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণ চলে গিয়েছে ভাবভূমিতে। হৃদয় যত কাঁদে, তত হাসে রামকৃষ্ণ। নাচে, গান গায়। অমৃততীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে অক্ষয়। ক্ষয়হীন আনন্দধামে। এ দেখে যদি আনন্দ না হয় তবে কী দেখে হবে!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট দেখল চোখের উপর। দেখল কি করে মানুষ মরে, কি করে আত্মা বেরিয়ে আসে দেহ থেকে, কোথায় যায় সে আত্মা। দেখল খাপের ভিতর থেকে ঝকঝকে তরোয়াল এল বেরিয়ে। তরোয়ালের কিছু হল না, শুধু খাপটা পড়ে রইল। সেই উজ্জ্বল নির্ভীক তরোয়াল এই মায়া-মিথ্যার তমসা ভেদ করে চলে গেল লোকাতীত আলোকতীর্থে।

কিন্তু সেই ভাবলোক ছেড়ে নেমে আসতে হল ফের স্থূল মাটিতে। পর দিন কালীবাড়ির উঠোনের সামনের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ, দেখল, অক্ষয়ের নর-দেহ পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফিরে আসছে শ্মশানযাত্রীরা। যেমনি দেখা অমনি বুকফাটা কান্না পেল রামকৃষ্ণের। গামছা যেমন নিঙড়োয়, মনে হল বুকের ভিতরটা তেমনি কে নিঙড়োচ্ছে। সমস্ত দুঃখ অবুঝ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে উথলে উঠল। সে জলতরঙ্গ কে রোধ করে।

'মা, এখানে পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়! তাই দেখাচ্ছিস বটে।'

কখনো আমি-আমার বলে না রামকৃষ্ণ। সব 'এখানে', 'এখানকার'।

'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

'কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো-আড়াইটে পাশ। মারা গেল। অতো বড়ো জ্ঞানী। প্রথম-প্রথম সামলাতে পারলে না! আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেননি।' ঠাকুর বললেন আত্মগতের মত।

কে এক জন ভক্ত বললে, 'ঈশ্বরে খুব ভক্তি হয় তো বেশ হয়। শোক-টোক থাকে না।'

'উঁহু। শোক ঠেলে দেয় ভক্তিকে।'

বিধবা ব্রাহ্মণী—তার একমাত্র মেয়ে, নাম চন্ডী। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের। জামাই প্রকান্ড জমিদার, খেতাব পেয়েছে রাজা বলে। থাকে কলকাতায়, জাঁক-জমকের সংসার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসে, সামনে-পিছে সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে আসে। মায়ের বুক দশ হাত হয়। কিন্তু পলতের বাতি নিবে গেল এক ফুঁয়ে। কি একটা সামান্য অসুখে অল্প কদিন ভুগে মেয়েটি চোখ বুজল।

বিধবা থাকে সেই বাগবাজার। কি করে এই অসাধ্য শোক শান্ত করবে তারই জন্যে বাগবাজার থেকে থেকে-থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। যদি ঠাকুর কিছু উপায় বলে দেন! যদি সেই শীতল শান্তমূর্তি দেখে বুক জুড়োয়।

ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন একবার ঠাকুর। বললেন, 'সেদিন একজন মজার লোক এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে, যাই এখন একবার ছেলের চাঁদমুখটি

দেখি গে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?'

বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন ঠাকুর। কথা আছে নন্দ বোসের বাড়ি থেকে যাবেন ব্রাহ্মণীর বাড়ি।

সেই ঠাকুর আর আসেন না। ব্রাহ্মণী কেবল ঘর-বার করছে। বোধ হয় আর এলেন না। অভাগিনীর অঙ্গনে কি ভগবানের পদার্পণের স্থান আছে?

শেষকালে উচাটন হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গেল সটান নন্দ বোসের বাড়ির দিকে। খবর নিতে, চলে গেলেন না কি দক্ষিণেশ্বর? না কি নন্দ বোসের আনন্দ-ভবন পেয়ে ভুলে গেলেন দুঃখিনীর শোকম্লান ঘরের কোণটি?

ব্রাহ্মণীও গেছে, আর অমনি ঠাকুর এসে পড়লেন ভক্তদের নিয়ে।

বাড়িতে ব্রাহ্মণীর ছোট বোন, সেও বিধবা। বললে, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে। এই এলেন বলে।'

ছাদের উপর সবাইকে নিয়ে বসেছেন ঠাকুর। ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে-প্রাণে বয়ে চলেছে ভক্তির স্রোতস্বতী। এত লোক, তবু মনে হচ্ছে, এক জন কে নেই।

'ঐ দিদি আসছেন।' ছোট বোন উছলে উঠল।

ছাদে উঠে ঠাকুরকে দেখে ব্রাহ্মণী কি বলবে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অস্থিরের মত এদিক-ওদিক করছে। বলছে, 'আমি নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু, ওগো, আমি যে এখন আহ্লাদে আর বাঁচি না। তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি। ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সঙ্গের সেপাই-শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল বাড়ির দরজায়, তখনো যে আমার এত আহ্লাদ হয়নি গো। আমার এ কি হল, চণ্ডীর শোক আর আমার এখন একটুও নেই গো! মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করেছি সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব। আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার অন্তর থেকে দেখে আসব। তাই, সকলকে বলি, আয় রে আমার সুখ দেখে যা, আমার ভাগ্য দেখে যা। দেখে যা আমার ঘরে আজ কে এসেছে! ওগো, আমি মরে যাব, আমার এত সুখ সইবে না। তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো আমাকে, নইলে মরে যাব সত্যি-সত্যি—'

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর থেকে রামকৃষ্ণ কেমন বিষণ্ণ। মথুরবাবু বললেন, চলো একবার আমার জমিদারিটা ঘুরে আসবে।

তাই চলো। ওরে হৃদু, জমিদারি দেখবি চল।

চূর্ণীর খালে নৌকোয় করে বেড়াচ্ছে তিন জন। রানাঘাটের কাছাকাছি কলাইঘাটায় এসে রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল দারিদ্র্যদলিত জনগণের উপর। রামকৃষ্ণ বললে, 'এই তোমার জমিদারির চেহারা? এই হাল তোমার মহালের?'

কেন, কী হল?

দেখ দেখি ঐ লোকগুলোর দিকে। পরনে ট্যানা, পেটে-পিঠে এক হয়ে রয়েছে। শোনো সবাইকে একখানা করে কাপড় দাও, আর খাইয়ে দাও এক বেলা।

যেমন চিরদিনের অভ্যেস, তা-না-না-না করতে লাগলেন মথুরবাবু।

তবে তোমার জমিদারি জাহান্নামে যাক। চল রে হৃদু, আর জমিদারি দেখে না। ফিরে চল দক্ষিণেশ্বর।

মথুরবাবুকে আবার তাঁর থলের মুখ ফাঁদালো করতে হল। গ্রামের লোকদের অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করলেন।

সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে গ্রামে মথুরবাবুর পৈত্রিক ভিটে। তারই কাছাকাছি তালামাগরো গ্রাম। সে-গ্রামে তাঁর গুরুঘর। গুরুবংশে সরিকি অংশ নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। আপোষনিষ্পত্তি করবার জন্যে তলব পড়েছে মথুরবাবুর।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। রামকৃষ্ণ আর হৃদয় চলেছে পালকিতে। আর মথুরবাবু হাতির হাওদায়। সহসা শিশুর মত হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি হাতি চড়ব।' মথুরবাবু বাহন বদলালেন। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে হাতিতে চাপিয়ে নিজে এলেন পালকিতে। হাতিতে চড়ে রামকৃষ্ণের আনন্দ তখন দেখে কে!

সর্বভূতে নারায়ণের গল্প জানিস তো? গুরু শিখিয়ে দিয়েছে শিষ্যকে, শিষ্যকে আর পায় কে। পথ দিয়ে হাতি চলেছে, উপর থেকে মাহুত বললে, সরে যাও। শিষ্যের তখন সর্বভূতে নারায়ণ—সে ভাবলে, সরব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। সরাসরি হাতির সামনে এসে দাঁড়াল, সরল না এক চুল। হাতি তাকে শুঁড়ে করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। ঘা-ব্যথা সারবার পর গুরুর কাছে এসে নালিশ করলে। গুরু বললে—ভালো কথা, তুমিও নারায়ণ হাতিও নারায়ণ, আর মাহুতটি নারায়ণ নয়? মাহুত নারায়ণের কথা শুনবে না?

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল দলবল। কলুটোলায় কালী দত্তর বাড়ি বৈষ্ণবদের প্রকাণ্ড হরিসভা বসে। সেখানে এক দিন নেমন্তন্ন হল রামকৃষ্ণের। আর, যেখানেই রামকৃষ্ণ, সেখানেই তরুচ্ছায়ার মত হৃদয়রাম।

ভাগবত পাঠ হচ্ছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই ভাগবত। রামকৃষ্ণও বসে পড়ল একধারে।

সামনে মহাপ্রভুর আসন। তার মানে বেদীতে যে আসন বিছানো তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আসন। বৈষ্ণবদের পূজা-পাঠের সময় থাকে এমনি আসন বিছানো। কল্পনা করা হয় সেখানে গৌরাঙ্গ দেব এসে বসেছেন, শুনছেন হরিকথা। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান এই ভাবটিরই প্রতীক ঐ আসনখানি।

রামকৃষ্ণকে পেয়ে ভক্তির স্রোত আরো উত্তরঙ্গ হয়ে উঠল। হরিকথায় এল আরো অতলতরো অনুরক্তি।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না, রামকৃষ্ণ হঠাৎ সেই চৈতন্যাসনের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। একখানি হাত ঊর্ধ্বে তোলা আর তার আঙুলে সেই বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ। সর্বাঙ্গ নির্বায়ু-নিশ্চল দীপ-শিখার মত স্থির, মুখে প্রেমপূর্ণ প্রসাদ-শান্তি। চৈতন্যদেবের সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে-ভঙ্গে দেদীপ্যমান।

শ্রোতা-বক্তা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইল। ভালো-মন্দ কোনো কথাই কারু মুখ

দিয়ে বেরুল না। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে রইল সবাই। এ কি অঘটন! জনতার উগ্র দৃষ্টি শান্ত হয়ে এল ক্রমে-ক্রমে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এল কোমল মুগ্ধতা।

যেই নাম শুনে সমাধি সেই নাম শুনেই আবার বহির্জ্ঞান। সুতরাং কীর্তন লাগাও। কীর্তন শুনিয়ে প্রভুর ধ্যান ভাঙাও।

বৈষ্ণবের দল কীর্তন শুরু করল। নাম-ঝংকারে সংজ্ঞা এল রামকৃষ্ণের। দু হাত তুলে শুরু করল নাচতে। মাধুর্যে উচ্ছল আবার উদ্দামতায় উত্তাল সেই যে নৃত্য সে-নৃত্য নটশ্রেষ্ঠ মহাদেবের। সবাই নামসৌরভে বিভোর হয়ে উঠল, নয়নরঞ্জনকে দেখে হয়ে রইল নিষ্পলক। চৈতন্যদেবের আসন অধিকার করা রামকৃষ্ণের পক্ষে ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে এ প্রশ্নের বাষ্পটুকুও কারু মনে রইল না।

কিন্তু ভাবের গিরিচূড়ায় কতক্ষণ থাকবে। নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের সমতলতায়। তখন তর্ক উঠল এই আসন-অধিকারের ঔচিত্য নিয়ে। এক দল বললে, ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। শুধু অন্যায় নয়, আস্পর্ধা। আরেক দল বললে, প্রাণ যেমন চায় ঠিক তেমনটি হয়েছে। শুধু ন্যায্য নয়, বাঞ্ছনীয়।

মীমাংসা হল না। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে বিষম আলোড়ন উঠল। এ যে ধর্মের কলঙ্কীকরণ। এর প্রতিকার কি?

সবাই গেল তখন কালনায়, ভগবানদাস বাবাজীর কাছে। ঘটনা শুনে ভগবানদাস তো রেগে কাঁই। 'ভন্ড, ধূর্ত কোথাকার।' রামকৃষ্ণের উদ্দেশে তপ্ত-অঙ্গার গালাগাল ছুঁড়তে লাগল বাবাজী। পারে তো নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে। বললে, 'আর কোনো দিন ঢুকতে দিও না ওকে হরিসভায়।'

এ কী অঘটন!

আর যে অঘটনের ঘটয়িতা, রামকৃষ্ণ, সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সে কিছু জানতেও পেল না। সে এখন বসে আছে তৃণাসনে। সমস্ত তৃণাসনই তার চৈতন্যাসন।

৪১

'আশ্রমে কে এল বল দেখি।' ভগবানদাস বাবাজী তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কে আবার আসবে!

'না, একজন কে মহাপুরুষ এসেছেন আশ্রমে। নিশ্বাসে তাঁর সুগন্ধ টের পাচ্ছি। তোরা সব একটু দ্যাখ দেখি এগিয়ে।'

কত লোকই তো আসছে-যাচ্ছে আশ্রমে। কালনার সিদ্ধবাবাজীর নাম ভারতপ্রসিদ্ধ। এমন কৃষ্ণভক্ত থাকতে আবার কার গায়ের গন্ধে বাতাস আমোদ হবে।

কত ঢঙের মানুষই আসে আজকাল। কে একজন দেখ না এসেছে একেবারে কাপড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে। মুখ-হাত-গা কিছুই দেখবার উপায় নেই। পুরুষমানুষের আবার এ কোন ছিরি! কোনো অসুখ-বিসুখ নাকি?

'না, এটা ওঁর ভয়-লজ্জার ভাব।' সঙ্গের লোকটি বললে। 'ওঁর বালকস্বভাব কিনা। অচেনা নতুন জায়গায় এলে এমনি ওঁর ভাব হয়।'

'তোমার কে হন?' জিগগেস করলেন বাবাজী।

'আমার মামা। সারাক্ষণ ঈশ্বরভাবেই আছেন। আপনার এ আশ্রম ঈশ্বরভাবের আশ্রম—আপনার নামটিও ভগবান। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

বোসো এক পাশে। কত ভাবের লোকই আসে আজকাল। কী-না-কী একটু ভাব হল, অমনি ঈশ্বরভাব! মোগল-পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতী!

'কিন্তু কে এল বল তো আশ্রমে! এমন দিব্যসৌরভ টের পাচ্ছি কেন?' বাবাজী উন্মনা হয়ে উঠলেন।

কোথায় কে! তেমন আবার কে আসবে আচমকা!

বাবাজীকে প্রণাম করে এক পাশে বসল দুজনে। হৃদয় আর রামকৃষ্ণ। বসল একান্ত দীনভাবে। বিনম্র-বিনত হয়ে।

দিব্য গন্ধের উৎস কোথায় বুঝতে পারলেন না বাবাজী।

যাক, উপস্থিত প্রসঙ্গেই নেমে আসা যাক। হ্যাঁ, যা নিয়ে কথা চলছিল এতক্ষণ। সেই বৈষ্ণব সাধুটির কথা। যে গর্হিত কান্ড সে করে বসেছে তার সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত। কোন শাস্তিটি বিধেয়?

'আমি বলি কি,' ভগবানদাসের কণ্ঠে শাসক-রোষ গর্জে উঠল: 'আমি বলি কি, ওর গলার কণ্ঠি কেড়ে নিয়ে ওকে দল থেকে বার করে দাও।'

বাবাজীর যা অভিমত, তাই প্রত্যাদেশ।

মালা ফেরাচ্ছেন বাবাজী।

'আপনি আর অকারণ মালা রেখেছেন কেন?' জিগগেস করলে হৃদয়: 'আপনার সিদ্ধিলাভ তো কবেই হয়ে গেছে।'

এ প্রশ্ন কি হৃদয় করল, না, আর কেউ করাল তাকে দিয়ে?

'নিজের জন্যে কি আর করি? লোকশিক্ষা তো দিতে হবে আমাকে।'

'লোকশিক্ষা?'

'তা ছাড়া আবার কি। তারি জন্যেই তো আছি। আমাকে দেখে আর সবাই যদি অমনি মালা-তিলক ছেড়ে দেয় তবে দল-কে-দল গোল্লায় যাবে।'

ওরে, এ যে সোঽহং বলছে। কী সর্বনাশ! ওরে, দা লাগা! দা বসা! সোঽহং-এর আগে দা জুড়ে দে। বল দাসোঽহং। দেহবুদ্ধিতে দাসোঽহং ছাড়া পথ নেই। বল আমি দাস, আমি ভক্ত, আমি বালক। জ্ঞান হলে আবার অহং কি! সূর্য যদি ঠিক মাথার উপর থাকে তবে আর ছায়া কোথায়? কিন্তু অন্য সময়? সূর্য যখন

এদিকে-ওদিকে? যখন চলছে দেহের ছায়াবাজি? যখন আর জ্ঞান নেই? তখন? তখন ভক্তি, তখন প্রেম, তখন সেবা। সেবা-প্রেম না নিয়ে মানুষ কী নিয়ে থাকবে? কী করে তবে তার দিন কাটে?

যার অটল আছে তার আবার টলও আছে। এই আছিস স্থির হয়ে অমনি আবার তুই কাজ করছিস। তোর স্থিরতা কতটুকু? তোর চাঞ্চল্যই বেশি। সূর্য মাথার ওপর কতক্ষণ? বেশিক্ষণই সে ডাইনে-বাঁয়ে। তাই জ্ঞান নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবি? ভক্তিতে ছুটে চল্। ভক্তিতে গলে যা। ওরে যা জ্ঞান তাই ভক্তি। জ্ঞান বলে, এ জল; ভক্তি বলে, জানি না কে—এ শুধু শীতলতা। একে ছুঁতে ঠাণ্ডা, খেতে ঠাণ্ডা।

জ্ঞান বস্তু, ভক্তি স্বাদ। কিন্তু যেখানে একা-একা নয়, জীব-জগৎ নিয়ে থাকবি সেখানে স্বাদ দিয়ে যা জনে-জনে। স্বাদ নিয়ে যা ক্ষণে-ক্ষণে।

তাই বলে এই অহঙ্কার! এত প্রতপ্ততা! নিমেষে কি হয়ে গেল কে বলবে। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের। রাগের ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগুনের মত। বললে, 'তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি লোক তাড়াবে? তুমি ধরবে-ছাড়বে? কে তুমি? যাঁর এই জগৎসংসার তিনি যদি না শেখান, তিনি যদি না তাড়ান, তিনি যদি না ধরেন-ছাড়েন, তোমার সাধ্য কি! কেন, কিসের এত অহঙ্কার?'

কটিতট থেকে খসে পড়ল বস্ত্রখণ্ড। মুখে দিব্য জ্যোতি, দেহে দিব্য তেজ, কণ্ঠে দিব্য বাণী। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ।

চোখ মেলে তাকালেন একবার বাবাজী। নিশ্বাস নিলেন বুক ভরে। বুঝলেন সেই দিব্য গন্ধের উৎস কোথায়।

এ সংসারে কেউ কোনো দিন তাঁর মুখের উপর কথা বলেনি। সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। তিনি যা বলেছেন তাই সবাই মেনে নিয়েছে হেঁটমুণ্ডে। কিন্তু কে এ উদ্যত-দণ্ড মহাশাসন? অথচ এর প্রতি সেই স্বাভাবিক ক্রোধ হচ্ছে না কেন? কেন জাগছে না প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি? আমি কি বদলে গেলাম নিমেষে? কিন্তু এ কে?

এ সেই বিশ্বভুবনের তমোহর। তোমার অভিমানের তমোনাশ করতে এসেছেন। এসেছেন তোমার অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়ে দিতে। বুঝিয়ে দিতে তুমি কে, তুমি কতটুকু! তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিতে।

ভাবমোহিত হয়ে গেলেন ভগবান। বললেন, কণ্ঠে বিনয়নম্র মধুরতা : 'আমার এমনি নাম ভগবান বটে কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি, আমাকে দেখা দিয়েছেন—'

সত্যিই দেখা দিয়েছেন! বাবাজী দেখলেন, মহাপ্রভুর মহাভাবের যে লীলাবর্ণন আছে তাই ওঁর দিব্য অঙ্গে প্রকাশিত।

বন্দনার আনন্দস্রোত বইতে লাগল আশ্রমে।

কে এ? কে এ বন্ধনমুক্ত বিভাবসু? অহঙ্কারের সংহত তুষারকে গলিয়ে দিলেন ভক্তির স্রোতস্বিনীতে!

উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস। কলুটোলার হরিসভায় উনিই সেদিন ভাবাবেশে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যাসনে।

করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন বাবাজী। বহু কটু-কাটব্য করেছি সেদিন। বুঝতে পারিনি যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন চৈতন্যাসনে তো তাঁরই একমাত্র অধিকার।

মথুরবাবু আর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কালনায় বেড়াতে এসেছিল রামকৃষ্ণ। এসেছিল নৌকো করে। কেন এসেছিল কেউ জানেনি। মথুরবাবু গেলেন বাসা দেখতে, রামকৃষ্ণ বললে, চল রে হৃদু, শহরটা একবার ঘুরে আসি। কত দূর এসেই পথের লোককে ডেকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই, ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমটি কোন দিকে?' সেই আশ্রমে এসে এই কাণ্ড।

তোতাপুরীকে ক্রোধ জয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভগবানদাস বাবাজীকে শিখিয়ে দিল অহঙ্কার জয় করতে, প্রতিহিংসা জয় করতে।

মথুরবাবুকে বললে, 'এইখানে একটি মচ্ছব লাগিয়ে দাও।'

মথুরবাবু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেখান থেকে চলো এবার নবদ্বীপ। চলো একবার দেখে আসি নিমাইয়ের জন্মভূমি।

কেউ বলে নিম গাছের নিচে জন্মেছিল বলে নিমাই। কেউ বলে যমের মুখে তেতো লাগবে বলে নিমাই। কেউ বলে আট-আটটি কন্যা মরে যাবার পর নবম গর্ভে জন্মেছিল বলে নিমাই।

কিন্তু এমন কাঁদুনে ছেলে, কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। পাড়ার স্ত্রীলোকদের কত জনের কত রকম চেষ্টা, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। অগত্যা অনুপায় হয়ে হরিনাম শুরু করে দেয় সবাই। ব্যস, শিশুর মুখের খিলখিল হাসি।

পরম সঙ্কেত পেয়ে গেল সকলে। শিশু কাঁদলেই হরিনাম করতে হবে। আর শিশুও এমনি দুঁদে, তার কেবল থেকে-থেকে কান্না।

কিন্তু নেড়া-নেড়ীদের এ সব কী কাণ্ড বলো দেখি? সত্যিই কি চৈতন্য অবতার? না, নেড়া-নেড়ীরাই টেনে-বুনে বানিয়েছে একটা? চলো নিজে গিয়ে দেখে আসি। হ্যাঁ, নিজে সেখানে গেলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে। চৈতন্য যদি অবতার হয়ই তবে সেখানে কিছু-না-কিছু প্রকাশ থাকবেই, আর ইশারা ঠিক মিলে যাবে চট করে।

রামকৃষ্ণ এল নবদ্বীপে। বড় গোঁসাইয়ের বাড়ি, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ি দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। হেথা-হোথা হেন-তেন কত ঠাকুর-দেবতার থান। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। সর্বত্রই শুকনো হাঁড়ি ঠনঠন করছে। কোথাও দেবভাব নেই। সব জায়গাতেই এক-এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে আছে শুধু। দূর! এখানে তবে এলুম কী করতে! চল্ ফিরে চল্ নৌকোয়।

তাই সই। ফিরে চলো।

কিন্তু নৌকোয় যেই উঠেছে রামকৃষ্ণ, অমনি বদলে গেল দৃশ্যপট। অলৌকিক দর্শন হল তার। ঐ এলো, ঐ এলো—বলতে-বলতে চকিতে সমাধিস্থ হয়ে গেল। জলে পড়ে যাচ্ছিল, হৃদয় ধরে ফেলল।

কী দেখলে অকস্মাৎ?

'দেখলুম দুটি সুন্দর ছেলে—আহা, এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রঙ, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসছে। এসেই একেবারে এই খোলটার মধ্যে ঢুকে গেল, আর আমার কিছু হুঁস রইল না। ওরে, ওরাই হচ্ছে নিমাই-নিতাই। নিমাই যে অবতার, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?'

কিন্তু এ ভাব নবদ্বীপে না এসে এই গঙ্গাবক্ষে এল কেন?

মথুরবাবু বললেন, 'যে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম তা গঙ্গায় ভেঙে গেছে। এই যে বালুর চড়া দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আসল নবদ্বীপ। তাই হালের শহরে না হয়ে এই বালুর চড়ার কাছে এসে তোমার ভাব হল।'

তুমি ভাবাম্বুনিধি। তুমি সর্বগুণেশ্বর।

আমি কেউ নই। আমি আবার কে!

৪২

কর্মযোগে অঙ্গারও হীরক হয়।

মথুরবাবুও ভক্তিতে-বিশ্বাসে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

সকাতরে বললেন রামকৃষ্ণকে, 'বাবা, আমাকে ভাবসমাধি দাও।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'দিব্যি তো আছিস। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবি কেন?'

'না, ও সব শুনছি না আমি—'

'না শুনলে চলবে কেন? তোর এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ভাব হলে যে অথৈ জলে পড়বি। সংসার থেকে মন যে তখন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-আশয় কে দেখবে-শুনবে? বারো ভূতে যে লুটে খাবে সর্বস্ব।'

মথুরবাবু তবুও নাছোড়বান্দা।

'ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁততে-পুঁততেই কি গাছ হয়? আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?'

ভক্ত, ভৃত্য আর ভাণ্ডারী এই মথুরবাবু। কখনো প্রভুজ্ঞানে ইষ্টপূজা, কখনো বা সন্তানভাবে স্নেহশ্রাবণ। কখনো অভিভাবক জ্ঞানে সতর্ক সম্মান, কখনো বা মিত্র-বুদ্ধিতে সমতা-মমতা। আর যিনি বিশ্বজনক, যিনি আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়,

সর্বত্র যাঁর ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ তাঁকেই মাঝখানে রেখে দুই পাশে শুয়েছেন দুই জনে। মথুরবাবু আর জগদম্বা। একই ধৈর্যের শয্যায়।

রামকৃষ্ণ ভাব দিতে রাজী হল না বলে মরমে মরে রইলেন মথুরবাবু। মাকে বললেন, মা, আমাকে বঞ্চনা করে তোর লাভ কি।

কি খেলা দেখাবার জন্যে মথুরবাবুকে মা নিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে তা কি মথুরবাবু জানেন? বারে-বারে রামকৃষ্ণকে যাচাই করে দেখবার জন্যে। সাধে কি আর মথুরবাবু লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে? দেখলেন যতই আগুন আনেন ততই সোনা টকটকে রঙ ধরে। একলা ঘরে সুন্দরী মেয়েমানুষ এনে দিলেন, রামকৃষ্ণ দুর্গাস্তব শুরু করলে। শাল-দোশালা চাপিয়ে দিলেন গায়ে, তার গায়ে থুতু ছিটোতে লাগল। রুপোর সাজ আর গড়গড়া দিলেন কিনে, বললে গামছা পরে ডাবা হুঁকো খেতে দোষ হল কি! বিষয় দিতে চাইলেন, এই মারে তো সেই মারে! তাঁর নিজের সংসারের উপরে দিলেন তাকে অপ্রতিহত প্রভুত্বের অধিকার, এক নজর তাকিয়েও দেখল না। কামারপুকুরের সংসারের জন্যে কত অর্থব্যয় করলেন, এতটুকু কাতরতা-কৃতজ্ঞতা নেই!

এ কে তুমি বৈরাগ্যবারিনিধি! আমি অনেক দুষ্কার্য করেছি, জমিদারি বজায় রাখতে খুনখারাপি করতেও কসুর করিনি, এবার দাও আমাকে নৈষ্কর্ম্যের নিষ্কৃতি। আমাকে ভাব দাও।

তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ, তদভাবে তদভাবঃ।

'ওরে ঠিক-ঠিক যে ভক্ত সে কি তাঁকে দেখতে চায়? সে শুধু তাঁর সেবা করে।' প্রবোধ দিল রামকৃষ্ণ। 'তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার বেশি আর সে কিছু চায় না।' তবু মন ওঠে না মথুরবাবুর।

'তা কি জানি বাপু! মাকে তবে গিয়ে বলি! দেখি তাঁর কি ইচ্ছে!'

এর দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন মথুরবাবুর ভাবসমাধি উপস্থিত। তিন দিন ধরে ঠায় জড় অবস্থা।

ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণকে। দেখে যাও কোথায় এসে উঠেছি শেষ পর্যন্ত।

রামকৃষ্ণ দেখল, আশ্চর্য, এ কী হয়ে গিয়েছে মথুর! যেন আরেক দেশের মানুষ। চেনা যায় না চট করে। দু' চোখ লাল, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুখে শুধু ঈশ্বরের কথা। শুধু অধ্যাত্মরতি। কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখেই দু পা জড়িয়ে ধরলেন মথুরবাবু। আকুল কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।'

'কেন কি হল?'

'সব তছনছ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে এই অবস্থা, বিষয়কর্মে মন দিতে পারছি না, চেষ্টা করলেও মন উঠে-উঠে যাচ্ছে। তিন দিনেই বারো ভূত ছেড়ে তেত্রিশ ভূত এসে লেগেছে—'

'কেন, তখন যে খুব ভাব চেয়েছিলে শখ করে? এখন ফেরত দিলে চলবে কেন?'

'এদিকে সব যে যায়!'

'কেন, আনন্দ নেই?'

'আছে, কিন্তু সে আনন্দ, যিনি নিত্যানন্দ, তোমারই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই। আমাদের পদসেবা। পর-জ্ঞানে পরা-সেবা।'

হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তাই তো বলেছিলাম আগে।'

'তখন কি অতশত বুঝেছি? তখন কি জানতাম যে ভাবের গোঁয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও আর কিছুতেই মন দিতে পারব না?'

তখন আর রামকৃষ্ণ কি করে। মথুরবাবুর বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলে। ধাতস্থ হলেন মথুরবাবু।

ওরে, কী হবে ও সব ভাব-টাব। শুধু তাঁর নাম কর, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর তাঁর কাছে। কী চাইবি? শুধু আশ্রয়, শুধু শান্তি, শুধু প্রসন্নতা। ওরে, ধেয়ান ধর, প্রেম লাগা।

সাধন-ভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্যে। আকাশে উড়তে-উড়তে ডানার ব্যথা হলেই পাখি কোথাও কোনো উঁচু জায়গায় এসে বসে। সেই উঁচু জায়গাটিই তিনি। আর তাঁরই জন্যে সাধন।

চিঁড়ে কোটো, মন রেখো ঢেঁকির মুষলের দিকে। তুলসীদাস পড়েছিস? তুলসী, য়্যাসা ধেয়ান ধর, য্যাসা বিয়ানকা গাই। মু মে তৃণ চানা টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই। প্রসূতি গাভী মুখে ঘাস খেলেও যেমন তার মন পড়ে থাকে বাছুরের উপর, তেমনি সংসারকর্মে লেগে থাকলেও মন ফেলে রাখ ঈশ্বরে।

মথুরবাবুর অসুখ, ফোড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হৃদয়কে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একবারটি আসেন।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আমি গিয়ে কি করব! আমি কি তার ফোড়া ভালো করতে পারব?' গেল না রামকৃষ্ণ।

মথুরবাবু আবার লোক পাঠালেন। বাতাসে পাঠালেন তাঁর যন্ত্রণার কাতরতা। অগত্যা যেতে হল রামকৃষ্ণকে।

অনেক কষ্টে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন মথুরবাবু। বললেন, 'বাবা এসেছ? আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।'

'তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধুলোয় তোমার ফোড়া ভালো হবে?'

সারা অন্তরে ছি-ছি করে উঠলেন মথুরবাবু। বললেন, 'বাবা আমি কি এমনি? আমি কি আমার ফোড়ার জন্যে তোমার পায়ের ধুলো চাই?' দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। 'আমার ফোড়ার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি তোমার শ্রীচরণের ধুলো চাই এই ভবসাগর পার হবার জন্যে।'

শুনতে-শুনতেই ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের। স্বচ্ছ ভক্তির স্পর্শে উথলে উঠল ভাবতরঙ্গ।

সেই সুযোগে মথুরবাবু রামকৃষ্ণের যুগ্মপদে মাথা ঠেকালেন। দেহের চিকিৎসার জন্যে আয়ুর্বেদী আছে, তুমি ভবরোগবৈদ্য।

তুমি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বরাট-বিরাট সম্রাট হয়ে আবার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। তুমি স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, জীবনের খেলার সাথী।

এক-এক সময় একটা গোঁ আসে মথুরবাবুর। যেমন সেইবার এসেছিল। বিজয়া-দশমীর দিন বলে বসলেন, প্রতিমা বিসর্জন দেব না, নিত্যপূজা করব।
কারু কথায়ই কান পাতেন না। স্ত্রীর কথা পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেন। বিপদ বুঝে রামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন জগদম্বা। স্বামীর নিশ্চয় মাথা বিগড়েছে। নইলে এমনতরো চেহারা হয় আকস্মিক?
মুখ-চোখ লাল, কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। না, কিছুতেই ফেলে দিতে পারব না মাকে। মাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। রামকৃষ্ণের অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।
'মাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না মাকে।'
রামকৃষ্ণ তখন তাঁর বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। বললেন, 'মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে এ কথা কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা মা যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারেন কখনো? তিন দিন বাইরের দালানে বসে পুজো নিয়েছেন, আজ থেকে একেবারে ভিতরের দালানে বসে পুজো নেবেন। হ্যাঁ, ভিতরের দালান। তোমার অন্দর মহল। আরো নিকট হবেন তিনি। বসবেন এসে তোমার অন্তরের অন্দরে।'
ব্যস, হাতের ছোঁয়ায় নরম হয়ে গেলেন মথুরবাবু। সত্যদৃষ্টির সৌম্য শান্তি নেমে এল দু চোখে।
'কথা কইতে-কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস?' ভক্তদের বললেন এক দিন ঠাকুর। 'যে শক্তিতে ওদের ওই গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক-ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।'
১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষ দিকে মথুরবাবু জ্বরে পড়লেন। দেখতে-দেখতেই বিকারে দাঁড়িয়ে গেল জ্বর। রামকৃষ্ণ গিয়েছে দেখা করতে।
মথুরবাবু বললেন, 'আচ্ছা বাবা, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই, তারা তো আজো এল না?'
'কি জানি বাপু, কত দিনে আসবে সব। মা যত কিছু দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শুধু এইটেই বুঝি ফলল না!' রামকৃষ্ণের মুখে পড়ল ঈষৎ বিষাদ-ছায়া।
জানো না সেই ভূতের সঙ্গী খোঁজা। ভূত একা-একা ঘোরে, সঙ্গী-সাথী জুটছে না একটাও। শনি-মঙ্গলবারে কেউ যদি অপঘাতে মরে, তাকে ধরে আনবার জন্যে দৌড়ে যায়। ভাবে যেহেতু শনি-মঙ্গলবারে মরেছে ভূত হবে নির্ঘাত। সঙ্গী পাওয়া যাবে এত দিনে। কিন্তু যেই সামনে ছুটে যায়, দেখে, হয় লোকটা শেষ পর্যন্ত মরেনি, নয়তো বার গুনতে ভুল হয়েছে। ভূতের আর সঙ্গী মেলে না।
আমারো হয়েছে সেই দশা। আমার কথা নেবে কে? আমি তাই সঙ্গী খুঁজছি—খুঁজছি আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। কিন্তু, না, কত দিন হতেই সে আরেক রকম হয়ে যায়। তরোয়াল দিয়ে সে দাড়ি চাঁছে।

'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'

কথায় কেমন যেন একটা করুণ বেদনা। মথুরবাবু বললেন, 'তারা আসুক আর না আসুক, আমি আছি। আমি একাই একশো ভক্তের সমান। তাই মা হয়তো আমাকে দেখিয়েই তোমাকে বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে—'

'কে জানে বাপু, মা-ই জানেন।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল মা-ই এবার নিজে এসেছেন মথুরকে নিয়ে যেতে। যা, মা'র কাছেই যা। দেখ গে সেই দেবীলোক।

নিজে আর এল না রামকৃষ্ণ। খোঁজ নিতে রোজ পাঠায় হৃদয়কে।

কাশীতে রামকৃষ্ণের অনুরোধে মথুরবাবু কল্পতরু সেজেছিলেন। যে যা চাইল তাই দান করলেন অকাতরে!

রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি কিছু চাও।'

চন্দ্রমণি এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বললে, 'আমাকে একটি কমণ্ডলু দাও।'

সেই কমণ্ডলু করে আমাকে একটু এখন গঙ্গাজল দেবে না? কৃপণ মথুরকে মুক্তহস্ত করে দিয়ে, হে কৃপানিধি, তুমি আজ নিজে কৃপণ হয়ে গেলে?

কোনো দরকার নেই। স্বয়ং গঙ্গা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। আসছেন সেই বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। তৃপ্তিকর্ত্রী ভবতারিণী। তাঁর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

পয়লা শ্রাবণ, আজ মথুরবাবুর শেষ দিন। আজো রামকৃষ্ণ গেল না জানবাজারে। তোর ভক্তিব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে, মা তোকে কোলে তুলে নিতে নিজে এসেছেন।

কালীঘাটে নিয়ে গেল মথুরবাবুকে। ঘনিয়ে এসেছে জীবনের অন্তিমা।

রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। তার সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতির পথ ধরে চলে এল মথুরের শয্যাপার্শ্বে। চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথুরবাবু দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় ধ্যান ভাঙল। হৃদয়কে ডেকে বললে, 'ওরে, মথুর রথে উঠল। খুব বেগে উড়ে গেল সেই রথ। চলে গেল দেবীলোকে।'

অনেক রাতে খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মথুরবাবু লোকান্তরিত হয়েছেন।

'আমাকে দেখে সে কী বলত জানিস?' ঠাকুর এক দিন বললেন ভক্তদের। 'বলত, বাবা, তোমার ভেতরে আর কিছু নেই—শুধু সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা একটা খোল, বাইরে কুমড়োর আকার, কিন্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছু নেই। তোমায় দেখলাম, যেন কেউ ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

তবু তুমি মনে করো না, সেজবাবু, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। মানুষ কী করবে! ঈশ্বরই তাকে মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো।

কী জ্বলন্ত বিশ্বাসই ছিল! কী উর্জী ভক্তি! কর্ম করতে গেলে আগে একটি

বিশ্বাস চাই। একটি আনন্দময় বিশ্বাস। মাটির নিচে মোহরের ঘড়া আছে এই আনন্দময় বিশ্বাস থাকলেই তো মাটি খুঁড়ব। খুঁড়তে-খুঁড়তে যদি ঠং করে একটা শব্দ হয়, বুকের ভিতরটাও আনন্দে টং করে ওঠে। তার পর যদি ঘড়ার কানা দেখা যায়, তা হলে তীব্রতর আনন্দ। খোঁড়ার বেগ তখন আরো বাড়ে। সাধু গাঁজা সাজছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ। টানবার আগে থেকেই আনন্দ।

হনুমানের রাম নামে বিশ্বাস। বিশ্বাসের গুণে সে সাগর লঙ্ঘন করলে। আর স্বয়ং রামচন্দ্র, তাঁকে সাগর বাঁধতে হল!

'আচ্ছা, মশাই, মৃত্যুর পর মথুরের কী হল?' এক দিন কে এক জন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'তার নিশ্চয়ই আর জন্মাতে হবে না।'

'কে বললে? সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা রাজাটাজা হয়ে জন্মেছে। তার মধ্যে যে ভোগবাসনা ছিল!'

যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তার পরে আবার ঈশ্বরের জন্যে সাধনা করে। পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে-করতে হঠাৎ হয় তো ভোগ করবার লালসা হয়েছে। তাকেই বলে যোগভ্রষ্ট। কামনা থাকতে, লালসা থাকতে মুক্তি নেই।

'ওরে বাস্‌নায় আগুন দে।' এই কথা শুনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন লালাবাবু। সাত লাখ টাকার আয়ের সম্পত্তি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে।

ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছ, সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর ঢোকে না। কামনা থাকলে আর ভগবান নেই।

কী চাইবি ভগবানের কাছে? ভক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—ও সব কিছু নয়। শ্রীমা বললেন, 'চাইবি শুধু নির্বাসনা।'

৪৩

'তোমরা সব কোথায় চলেছ?'

'কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রকাণ্ড যোগ সেখানে। ঐ দিন জন্মেছেন গৌরাঙ্গদেব।'

'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?'



'ও মা, স্নানে যাবি তুই?' আত্মীয়া বয়স্কা মহিলারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।
'না, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে যাব। তাঁকে দেখতে বড় মন কেমন করছে।'
'তোর বাবাকে গিয়ে বল। তোর বাবা না বললে যাবি কি করে?'
লজ্জায় মরে গেল সারদা। একটু বা ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি বাবার কানে ওঠে! ছি-ছি, বাবার কানে গেলে তিনি কি ভাববেন।
সেই কত দিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। চার বছর আগে। গেল পৌষে সারদার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। ভরন্ত বয়সের চটুল চাপল্য নেই, স্বভাবটি প্রশান্ত গম্ভীর। হৃদয়ের মধ্যে সব সময়ে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো। উল্লাসটি উচ্ছলিত নয়, উল্লাসটি নিয়তনিশ্চল।
সত্যি-সত্যি বাবার কানে উঠল কথাটা। সারদা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চায়। মিলতে চায় তার স্বামীর সঙ্গে। তার পুরুষের সঙ্গে।
লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। মনে-মনে বললে, তোমার কাছে যেতে চাই, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।
রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সারদাকে। বললেন, 'বেশ তো। যাবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। গোছগাছ করে নাও চট করে।'
হৃদয়স্থ আনন্দঘটের দিকে সারদা তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কৃতজ্ঞকরুণ চোখে প্রতীক্ষার প্রশান্তি।
কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় কলকাতা! পায়ে-হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সাত রাজ্যে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনেনি কেউ। এদিকে বিষ্ণুপুর, ওদিকে তারকেশ্বর—সব ঝাঁঝাঁ করছে। ঘাটালের যে নদী সেখানেও ইস্টিমার আসেনি। সর্বদিকে একটা স্থান আর সময়ের বিস্তীর্ণ হাহাকার। কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কত দিনে কোন দিকে গিয়ে পৌঁছুব—সমস্ত একটা ধূসর অস্পষ্টতা। কিছুই ধরা-ছোঁয়ার নেই, সব যেন ঐ দিগন্তের কাছাকাছি।
তবু চলো। চলা ছাড়া অনুপায়ের আর উপায় কি। শুধু এগিয়ে চলো। যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি পায়ে-পায়ে উপায়।
সারদা শুধু স্বামীদর্শনে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে তীর্থদর্শনে। হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে।
কোনো দিন পথে বেরোয়নি সারদা। হাঁটেনি কোনোদিন দূরের পাড়িতে। তবু ভয় পাবে না সে। থাকবে না পেছিয়ে পড়ে। যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থপথিককে টেনে নেবেন।
কোথাও-কোথাও রাস্তার খেই হারিয়ে গেছে। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠে, কোথাও বা সেই শুকনো মাঠ ভাঙো। ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলো। গাছের ছায়া পাও তো, জিরিয়ে নাও একটু। তালপুকুর মিলেছে কোথাও, জল খেয়ে নাও পেট ভরে। সূর্যদেব গো, তোমার রশ্মিজাল একটু স্তিমিত করো।
কমলকোমল পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সারদা। মুখখানি রোদে আমলে গেছে, আর যেন পারছে না চলতে। পা ভেঙে পড়ছে পথশ্রমে। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে।

'চলতে কষ্ট হচ্ছে রে সারু?' জিগগেস করেন রামচন্দ্র।
'না, বাবা।' মুখে হাসি আনে সারদা, পা দুটোকে টানে জোর করে।
'তবে অমন পিছিয়ে পড়ছিস কেন?'
'এই একটু দেখতে-দেখতে চলেছি সব—'
মেয়ের মুখের দিকে তাকান রামচন্দ্র। ঝামরে গেছে মুখ-চোখ। যেন টলে-টলে পড়ছে। দু-তিন দিনেই এই, এখনো আছে আরো কত দিনের দীর্ঘ শ্রম। উপায় কি, এমনি করেই চটি থেকে চটিতে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগুতে হবে। বিশ্রামটা না-হয় আরো একটু বড় করা যায়, কিন্তু পথ তো আর ছোট করা যাবে না।
হু-হু করে জ্বর এসে গেল সারদার। মেয়ে পথের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। চোখে আঁধার দেখলেন রামচন্দ্র। মেয়েকে নিয়ে এখন করি কি।
আর সব সহযাত্রীরা থামতে চাইল না। তোমার মেয়ের জন্যে আমাদের গঙ্গাস্নান মারা যাক আর কি। আমরা চললুম এগিয়ে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সামনের চটিতে গিয়ে ওঠো।
তা ছাড়া আর পথ নেই। রুগী মেয়ে হাঁটবে কি করে? পালকি কই এ অঞ্চলে? অগত্যা রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে সামনের এক চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।
দুঃখের আর অবধি নেই সারদার। নিজে তো অসুখে পড়লুমই, বাবাকেও বিপদে ফেললুম। তোমাকে দেখবার দিনটিও পিছিয়ে গেল।
গ্রাম্য বধূ, লজ্জা-সরমের কত ছিরি-ছাঁদ। এখন জ্বরে বেহুঁস হয়ে বিদেশের চটিতে সব জলাঞ্জলি গিয়েছে। লজ্জানিবারণ হরি, তাঁর স্নেহদৃষ্টির ছায়ায়ই তার আচ্ছাদন।
সারদা দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসল।
গায়ের রঙটি কালো, কিন্তু কালো অমন অপরূপ হয়, কালোর যে অমন আলো থাকে, স্বপ্নেও কোনো দিন দেখেনি সারদা। মেয়েটি পাশে বসে ঠান্ডা স্নেহে সারদার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছে দিতে লাগল তপ্ত গায়ের দাহ। দুটি টানা-টানা বিশাল চোখের মমতাটিও কত ঠান্ডা!
সারদা জিগগেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?'
'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'
'বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমিও ভেবেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব। সেই আশা করেই বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। তায় রাস্তায় এই জ্বর। আচ্ছা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ? ঠাকুরকে?'
'দেখেছি বই কি।'
'বড় সাধ ছিল, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব। আমার ভাগ্যে সে আশা আর মিটল না। জ্বর এসে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'
মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, না, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভালো হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি সেখানে।'

'বটে? ভালো হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব?' সারদা তাকাল একবার সেই মমতাময়ীর দিকে। 'তুমি আমাদের কে হও গা?'
'আমি তোমার বোন হই।'
'সত্যি? তাই বুঝি তুমি এসেছ আমার অসুখ শুনে? বাঃ, বেশ!' বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল সারদা।
সকালে ঘুম ভেঙে দেখল বোন কোথায় চলে গেছে। বোনের সঙ্গে-সঙ্গে জ্বরও অন্তর্হিত।
আবার শুরু হল পথ হাঁটা। কত দূর এসে, কি আশ্চর্য, একটা পালকি মিলে গেল। বোনটিই হয় তো পাশের কোনো গাঁ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পালকি।
আবার জ্বর এল দুপুরের দিকে।
'কেমন আছিস রে সারু?'
'বেশ, ভালো আছি বাবা।' পালকি পেয়েছে, আবার রোগ-বালাই কী সারদার! চলেছি তো এখন সর্বরোগপাবনের কাছে।
পথের শেষ হল এক সময়। রাত নটার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকো লাগল। রামকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল। রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাল হৃদয়কে। বললে, 'ও হৃদু, বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।'
এ কথা হয়ে গেছে আগেই। সারদা গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেছে।
আর সকলে এদিক-সেদিক গেল—নহবতের ঘরে চন্দ্রমণি আছেন, সেখানে কেউ-কেউ। সারদা সটান চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। মুখে সেই সলজ্জ ঘোমটা।
'তুমি এসেছ?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। 'বেশ করেছ।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'ওরে, ওকে একখানা মাদুর পেতে দে। কত দূর থেকে আসছে। তার পরে আবার অসুখ করে এসেছে।' বলেই নিজের মনে খেদ করতে লাগল : 'এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে যে, তোমাকে যত্ন করবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি? আমার সেজবাবু হলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরি করে এলে। আমার সেজবাবুকে দেখতে পেলে না।'
মাদুর বিছিয়ে দিল হৃদয়। জড়সড় হয়ে বসল তাতে সারদা।
চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন করল। কত কি শুনেছিল দেশে থাকতে। পাগল হয়ে গিয়েছেন, পরনে কাপড় নেই, মুখে শুধু অসম্বদ্ধ প্রলাপ। তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণটাই তো পাগলের বিবরণ। একেবারে পরমানন্দ মহাপুরুষের মত বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, সারদাকে তিনি ভোলেননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন। শুধু মনে করে রাখেননি নয়, তার প্রতি করুণায় অজস্র হয়ে আছেন।
ঘর ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না সারদার। তবু বললে, 'আমি মা'র কাছে নবতের ঘরেই যাই।'
'না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে।' রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'তুমি এ ঘরেই থাকো। আমি নইলে ওষুধ-পথ্য দেবে কে?'
চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কোঠায় থাকতেন, অক্ষয়ও থাকত তাঁর সঙ্গে। সেই ঘরেই অক্ষয় মারা যায়। অক্ষয় মারা গেলে চন্দ্রমণি ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললেন, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি নিচে এই নবতের ঘরেই থাকব। গঙ্গা পানে মুখ করে রইব। কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।'
তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দু-তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এল হৃদয়। যেমন অসময়ে এসেছ তেমনি মুড়ি চিবোও বসে-বসে।
রাত্রে সেই ঘরেই শুলো সারদা। শুলো ভিন্ন শয্যায়, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে নিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবল সারদা, এ কি ঘুম, না, জাগরণ!
পর দিনেই ডাক্তার আনালো রামকৃষ্ণ। তিনচার দিন সারদাকে রাখল তার খবরদারিতে। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল পথ্য। ঘড়ি ধরে ওষুধ। নিজের সেবা-যত্নে ভালো করে তুলল। বললে, 'এবার তুমি যেতে পারো মা'র কাছে।'
নহবতে চলে এল সারদা। লাগল শাশুড়ির সেবায়। যতটুকু উনি নেন ততটুকু রামকৃষ্ণের সেবায়। সেবার মত আনন্দ আর কী আছে! সেবা ছাড়া আর কী আছে জীবনের কবিতা! রামচন্দ্র দেখে বড় শান্তি পেলেন। ফিরে গেলেন স্বস্থানে।
কিন্তু সারদাকে নবতে পাঠিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল, কেন, কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখব। ওকে কি আমার ভয়, না, ঘৃণা? ও কি আমার তাচ্ছিল্যের, না, অনুকম্পার? প্রতিমায় ঈশ্বর পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? আমি কি ফুটো কলসী যে জল রাখলে জল সব বেরিয়ে যাবে? আমি কি বালির বাঁধ যে আষাঢ়ের বন্যাকে রোধ করতে পারব না?
মনে পড়ল তোতাপুরীর কথা। তোতাপুরী বলেছিল, 'তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে বুঝি।'
এবার তো সেই পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। জোর করে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জন্যে তো সে করছে না, তার কাছে সুযোগ এসেছে বলেই সে পরীক্ষা করছে। সমস্তই মহামায়ার ইঙ্গিত।
রামকৃষ্ণ বলে পাঠালো, 'সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।'
সারদার ভয় করতে লাগল। এ আবার কী হল রামকৃষ্ণের! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। শাশুড়ী বললেন, 'যাও যখন ও বলছে।'
ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে এনে রামকৃষ্ণ জিগগেস করলে সারদাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?'
ঘোমটা-ঢাকা মুখে হেঁট হয়ে দাঁড়াল সারদা। বললে, 'না। তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'
তবে বোস পাশটিতে, শোনো।
খই ভাজবার সময় যে খইটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো

দাগ লাগবেই। যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা মা-ই হোক আর স্ত্রীই হোক, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের মতন কিছু নেই।

রাবণ সীতার জন্যে মায়ার নানা রূপ ধারণ করছে, তবু সীতা টলে না। এক জন বললে, 'একবার রামরূপ ধরে যাও না কেন?'

রাবণ বললে, 'রামরূপ একবার হৃদয়ে ধরলে ব্রহ্মপদই তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো কোন ছার! তা রামরূপ কি ধরবো!'

'কিন্তু আমি তোমার কে?' গভীর-সরল অন্তরে জিগগেস করলে সারদা।

'তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসোনি, বিদ্যা নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।'

অত-শত কি বোঝে সারদা? বুঝে কাজ নেই কানাকড়ি। তার চেয়ে সেবা করি। জ্ঞান বুঝি না, বুঝি ভক্তি, বুঝি সেবা। রামকৃষ্ণের পা টিপতে বসল সারদা।

পা টেপবার পর সারদাকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করল।

ও কি! ছি! সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হল সারদা। বললে, 'আমি তোমার দাসী।'

'তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।'

৪৪

'মন রে, চেয়ে দ্যাখ। দেখছিস?'

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ! একসঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতে শুয়ে আছে সারদা। শুয়ে আছে লজ্জায় জড়সড় হয়ে। আগাগোড়া গা ঢেকে। শুধু পদতল দুটি অনাবৃত। পদ্মদলের মত পদতল। তাতে পদ্মরাগের আভা।

ঘরে দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজায় খিল দেওয়া।

থমথম করছে নিশুতি মধ্যরাত। এটা বসন্ত কাল না? 'ঋতুণাং কুসুমাকরঃ'—সেই মধু-ঋতু না এখন? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদ্গদ-গন্ধ ফুল ফুটেছে অনেক। গঙ্গার উপরে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে।

'দ্যাখ চোখ ভরে। দেখছিস?'

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে না একটা? জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েনি? দেখতে পাচ্ছিস না তোর অনুভূতির অন্তর্গূঢ় অন্ধকারে!

'পাচ্ছি।'

'কী দেখছিস?'

'একটি অমল ও অনুপম সৌন্দর্য। একটি অনাঘ্রাত কুসুম। একটি সর্বতোমুখী শ্রী।'

'চোখে কাব্যের অঞ্জন লাগিয়ে দেখতে হবে না। চেয়ে দ্যাখ চর্মচক্ষে। কী দেখছিস?'

'একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। লাবণ্য-ঊর্মিলা স্রোতস্বতী।'

'শুধু তাই?'

'স্বাস্থ্য সারল্য আর পবিত্রতার সমাবেশ। অস্পৃষ্ট, অনুপভুক্ত। বিরজ-বিশুদ্ধ বিশদ-বিশোক।'

'কে হয় বল দেখি তোর?'

'স্ত্রী হয়। যার সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই, নিবারণ নেই। বরং যার পক্ষে শাস্ত্র, যার পক্ষে সংসারসৃষ্টি।'

'সেই স্ত্রী আজ তোর নিভৃত শয্যায় এসে শুয়েছে। যে বেষ্টন করে দীপ্তি পায় সে-ই স্ত্রী। যাতে নতুন করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় সেই জায়া। চেয়ে দ্যাখ। সদ্য-প্রাণকরা স্ত্রী। এ সম্পূর্ণ তোর। তোর আয়ত্তের মধ্যে।'

'দেখছি। অনিন্দ্যকান্তি। অপরূপ-সুন্দর।'

'হ্যাঁ, একেই বলে স্ত্রী-শরীর।' রামকৃষ্ণ মনের কাছে আরো উন্মুক্ত হল। বললে, 'লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য এর চেয়ে উপাদেয় কিছু আর নেই পৃথিবীতে। কি, গ্রহণ করবি?'

'কিন্তু—' উন্মনা মন বিমনা হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তবে ঐ দেহেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকিস তবে আর সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে পাবি না। দ্যাখ বিবেচনা করে। নারী চাস না নারায়ণী চাস?'

মন খুঁতখুঁত করে। তৃষ্ণার কুয়াশা সঞ্চিত হতে-না-হতেই জেগে ওঠে বৈরাগ্যের ত্বিষাম্পতি। বললে, 'কিন্তু কাম ভোগ করে কি কামের নিবৃত্তি হবে?'

'তা হবে না। সেই জানিস না যযাতি কী বলেছিল? পুত্রের যৌবন চেয়ে নিয়েও তার কামের উপশম হল না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। যতই আহুতি ততই আকৃতি।'

'আর ঈশ্বরানন্দ?'

'ঈশ্বরানন্দ! এখানেও যত পান তত পিপাসা। তফাত এই, ওখানে ক্ষয়, গ্লানি, ক্লান্তি, খেদ, আর এখানে নিরংশ, নিরন্তর, নিরতিশয় আনন্দ। সেই যা বলেছিস বিরজ-বিশোক, বিশদ-বিশুদ্ধ—'

'আমি ঈশ্বরানন্দ চাই।' মন মুখ ফেরাল।

'দেখিস, ভাবের ঘরে চুরি করিস নে। পেটেমুখে এক হ। মুখে বাহাদুরি মারবি আর পেটে খিদে থাকবে তা হতে পারবে না। যদি চাস সোজাসুজি টেনে নে

স্বচ্ছন্দে। তোর হাতের নাগালের মধ্যেই তো আছে। আছে তোর অধিকারের গণ্ডিতে। লুকোচুরির দরকার নেই।'

মন উসখুস করে উঠল। সারদার অঙ্গ স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়াল রামকৃষ্ণ। সেই উদ্যতিতেই মন বেঁকে বসল। ধীরে-ধীরে কোথায় ডুব দিল অতলে। লীন হয়ে গেল আত্মস্বরূপে। দেহমনোহীন অনাদ্যন্ত সচ্চিদানন্দে।

যে হৃদয়োৎসবরূপা সমানমনোরমা, সে কি এতই অল্প, এতই লঘু, এতই সহজ-লভ্য? তাকে আমি কী মূল্য দিলাম, তার পরীক্ষা হবে কিসে? তাকে আমি কোথায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলাম—তাতে। তার মূল্যেই আমি মূল্যবান। তার মহত্ত্বেই আমি মহনীয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। কে যেন তাকে তুলে দিলে জোর করে।

এ কি! তিনি এখনো শোননি? বিছানার উপরে ঠায় বসে আছেন? বসে আছেন নিশ্চল, নিঃসংজ্ঞ হয়ে। রাত এখন কটা হল না-জানি। কতক্ষণ এমনি বসে থাকবেন! ভোর হতে বাকি কত?

এমন ভাবারূঢ় কূটস্থ মূর্তি আর দেখেনি সারদা। তার ভয় করতে লাগল। জ্যোতিঃ-পুঞ্জময় দিব্যমূর্তি স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। কিন্তু কি করে এই ভাব ভাঙাবে রামকৃষ্ণের? কি করে নিয়ে আসবে তাকে তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকতায়? এমনি বসে থেকে-থেকেই চলে যাবেন নাকি শেষকালে?

ব্যস্ত হয়ে ঘরের বার হল সারদা। ঝি কালীর মাকে কাছেই পাওয়া গেল। আকুল হয়ে বললে, 'শিগগির ভাগ্নেকে ডেকে আনো। উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।'

কালীর মা গিয়ে ডাকাডাকি করে তুললে হৃদয়কে।

কেমন আর হবেন! ভাবের ঘরে বাস করেন, ভাবের ঘোরে ভব হয়ে গিয়েছেন। নিজে ভবানী হয়ে এত ভাবিনী হবার কি দরকার!

হৃদয় গিয়ে রামকৃষ্ণকে নাম শোনাতে বসল।

যে নামে টান, সেই নামে জ্ঞান। আবার সেই নামেই পরিত্রাণ।

> 'আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে,
> ব্রহ্মকল্পতরুশাখে বসে রে পাখি, বিভুগুণগান গাও দেখি,
> ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাও না রে॥'

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই সব পণ্ড করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্ত্রের প্রতি বেশি পক্ষপাত। খুব পড়াশোনা করেছে এমনি একটা ভাব দেখাতে সদা-ব্যস্ত। ইংরিজি আর সংস্কৃত বুকনি সর্বদা তার মুখে ফুটছে। শব্দাড়ম্বরের প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি। সে এক ইস্কুল করেছে, তার নাম প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। তার ছেলের নাম রেখেছে মৃগাঙ্কমৌলি পূতি-তুণ্ডি। হরিণের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। আর তার গুরুর নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আসতে ঠাকুর বলে উঠলেন : 'এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! এখানে ছোটখাটো ডিঙি-টিঙি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ!'

এ শুধু তার পণ্ডিতম্মন্যতার প্রতি কটাক্ষ। সকলে হেসে উঠলেও মহিমাচরণ হয়তো খুশিই হল। সে নৌকো নয়, সে জাহাজ!

এ জাহাজকে সহজ করে দিতে চাইলেন ঠাকুর। বললেন, নাম করো। নাম করলে অহঙ্কার দূরে যাবে। পাণ্ডিত্যের বাইরে সুধাভাণ্ডটিকে দেখতে পাবে তখন।

গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ পরে এক-এক দিন চলে আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে পঞ্চবটীতে। রুদ্রাক্ষের মালা ফিরিয়ে জপ করে। কখনো একটা তানপুরা নিয়ে গান গায়। যেন কত বড় একজন তন্ময় সাধক!

বাড়ি যাবার আগে বাঘের ছালটি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে।

'এ কেন রাখে জানিস! দেখলেই লোকে জিগগেস করবে এ বাঘের ছাল আবার কার! তখন আমি বলব, মহিমাচরণের, আর তাতেই ওর মান বাড়বে!'

কেবল নিজের নাম, নিজের মান। ওরে, তাঁর নাম কর। তাঁর মান রাখ।

তাঁর নামেই বন্ধনমোচন হবে। বটের বীজ দেখেছিস? লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। তা, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? হয় একটি অক্ষর নয় দুটি অক্ষর। তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম—কত কি!

সেই নামের মন্ত্রই দিলেন মহিমাচরণকে। সহজ হবার সহজ নিয়ম। মুক্ত হবার সরল সূক্ত।

'শুধু এগিয়ে পড়ো। আরো এগোও। পাবে চন্দন কাঠ, কিন্তু ওখানে থামলে চলবে না, আরো এগোও। পাবে রূপোর খনি, থামলে চলবে না, আরো এগোও। তার পরে, সোনার খনি, পাবে হীরে-মানিকের খনি—তবু থামা নেই। এগিয়ে পড়ো। এহ বাহ্য, আগে কহ আর—'

মহিমাচরণ কাতর স্বরে বললে, 'আজ্ঞে, টেনে রাখে যে। এগুতে দেয় না।'

'কেন, লাগাম কাটো। ঘোড়া ছুটিয়ে দাও।'

'কি ভাবে কাটব?'

'শুধু তাঁর নামের গুণে কাটো। কালীর নামে যে কালপাশ কাটে।'

আর কিছু নয়, শুধু তাঁর নাম করো। একটু স্থির হয়ে বসে তাঁকে স্মরণ করো, আহ্বান করো।

যে নাম-দাতা সেই আবার নাম-শ্রোতা। হৃদয় নাম শোনাতে লাগল।

ভাবভূমি থেকে সারা রাত আর নামল না রামকৃষ্ণ। নামধ্বনিতে সমাধি ভাঙল শেষকালে। প্রভাতের সীমানায় এসে। সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ।

'একা-একা ঘরে আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে তোমার খুব ভয় করছিল, না?'

তা আর বিচিত্র কি! কোথায় শান্তিতে একটু ঘুমুবে, তা নয়, তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে ভয় নয় আসলে আনন্দ!

'শোনো, আরো অনেক রকম হয়তো ভাব হবে রাত্রে। ভয় পাবে না। কোন ভাবে কোন মন্ত্র শুনিয়ে আমার বাহ্যজ্ঞান আনতে হবে তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি।'
সারদা যেন ভরসা পেল।
কিন্তু, জানো, ভাব ছাড়া লাভ নেই। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে? হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।'
আমি লোহা, তিনি চুম্বক। তিনিই আমাকে ধরেছেন। মর্ত্যশয়ন থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই অনন্তশয়নে। যেখানে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণু শয়ান।

৪৫

শুধু প্রথম রাত্রি নয়, প্রতি রাত্রি।
ঘোমটাতে মুখখানি ঢেকে সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সারদা। শুয়ে থাকে তরলিত সরলতায়। সমর্পিত প্রশান্তিতে। স্পৃহা নেই প্রতিবাদ নেই, প্রতীক্ষা করে আছে ধৈর্যের মত, তিতিক্ষার মত। তপস্যার মত।
নিদ্রাহীন নিশীথ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। শোনা যাচ্ছে গঙ্গার কলস্বর।
হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। টেনে নিলেই হয় আলিঙ্গনে। বৃন্ত থেকে কুসুমচয়নে এতটুকু কণ্টক নেই। স্নানাবতরণে নেই এতটুকু পদস্খলন।
কিন্তু আমি তো জৈব প্রয়োজনে নয়, আমি দৈব প্রয়োজনে। আমি ষোলো আনা করলে মানুষে যদি এক পয়সা করে।
তাই বলে গোঁ ধরে কিছু করে না। করে না কোনো অন্ধ একরোকোমি। সদসৎ বিবেচনা করে করে। সারাক্ষণ মনের সঙ্গে চলে কঠিন বোঝাপড়া। চলে জটিল বাদানুবাদ, সূক্ষ্ম বিচারমীমাংসা। মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দেয়, নিষ্ঠুর হাতে তার টুঁটি টিপে ধরে না! বল না কি বলবি, যা না কোথায় যাবি, নে না যা তুই চাস। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বোস একটু শান্ত হয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা ক। গোঁয়ারের মতন অমন গোঁজ হয়ে থাকিস নে। স্ফূর্তি করে তর্ক কর আমার সঙ্গে। মামলায় যদি তুই জিতিস আমাকে তুই বেঁধে নিয়ে যাস জেলখানায়।
জানি, তুই কি বলবি। কিন্তু কত দিন ধরে করতে পারবি এই দেহস্তব, তাই শুধু আমাকে বল। লতাপাতাঘেরা শান্তশীতল মাটির কুটীরে যে যেতে চাস তার মাধুর্য কি আমি জানি না? কিন্তু তার চেয়ে—তাকিয়ে দ্যাখ দেখি এই রাত্রির

আকাশের দিকে, এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে—এই মহামৌনের মধ্যে ঈশ্বরের মন্দিরটি কি বেশি রমণীয়, বেশি মোহনীয় নয়? আর কী তুই চাস এই শ্মশান-নাট্যের রঙ্গশালায়? যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প? যোগবাশিষ্ঠ পড়িসনি? রামচন্দ্র কী বলছেন? বলছেন, যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প যদি আলাদা-আলাদা করে রেখে সৌন্দর্য দেখতে পাও, তবে দেখ তাই একদৃষ্টে। নইলে মিছে আর কেন মুগ্ধ হওয়া?

জোয়ারের জলের মতন এই যৌবন। অল্পোচ্ছ্বসিত, অচিরস্থায়ী। কিন্তু ভুবনব্যাপী এই ঈশ্বরসিন্ধু। এ চিরকাল সমানস্রোত, অচ্ছিন্নপ্রবাহ। বল, স্নানের জন্যে কোন ঘাটে তুই অবতরণ করবি?

তোর উপরে আমি জোর খাটাতে চাই না। তুই জাগ্রত, বুদ্ধিমান, কুশাগ্রতীক্ষ্ম। তুই নিজেই হিসেব করে দ্যাখ। ক্ষয়দ্বারে যাবি, না, যাবি অক্ষয় মন্দিরে?

বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের আগে কতগুলি সুন্দরী যুবতী এসেছিল তাঁকে প্রলুব্ধ করতে, প্রতিনিবৃত্ত করতে। দীর্ঘ রাত প্রমোদোৎসবে মাতামাতি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তাদের দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব। নিদ্রার বিকৃতিতে কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েগুলোকে। বুদ্ধদেব দেখলেন এ তো শ্মশান, এখানে আবার প্রমোদলীলা কোথায়!

মন, তাই বলি, তুই কি এক বেলার কাঙালীভোজনে যাবি, না, যাবি চিরন্তন অমৃতের নিমন্ত্রণে?

ভিক্ষু মহাতিস্স পর্বতচূড়ায় বসে তপস্যা করেন। পাহাড় থেকে নেমে সেদিন চলেছেন অনুরাধাপুর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক সুন্দরী যুবতী স্বামীত্যাগ করে সেদিন পথে বেরিয়েছে। সহসা দেখা হল সেই সৌম্যদর্শন ভিক্ষুর সঙ্গে। যুবতী বিলোল কটাক্ষ করে মদির অধরে হেসে উঠল।

ভিক্ষু তাকালেন তার দিকে। দেখলেন বিকশিত মল্লিকার মত সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি। কিন্তু মনে হল যেন কঙ্কালের হাসি। এক অস্থিসার কঙ্কাল তাঁর দিকে চেয়ে বিকটবদনে হাসছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই যুবতীর স্বামীর সঙ্গে দেখা। স্বামী জিগগেস করলে, 'এই পথে কোনো নারীকে আপনি দেখেছেন?'

'নারী?' ভিক্ষু উদাসীনের মত বললেন, 'নারী না পুরুষ বলতে পারব না। দেখলাম একটা কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে।'

মন, বল, নারীকে কঙ্কালে নিয়ে যাবি, না, তাকে মনোময়ী প্রতিমা করে বসাবি হৃদয়ের পদ্মাসনে?

যুবতীর মাথার খুলিটি একবার কল্পনা কর। সেই তো তোর মহামোহের ফাঁদ। কিন্তু সেই যে মুখারবিন্দ সে এখন কোথায়? কোথায় সেই অধরমধু? কোথায় সেই আয়ত কুটিল কটাক্ষ? কোথায় সেই দন্তরুচিকৌমুদী? কোথায় বা সেই মঞ্জুগুঞ্জ আলাপন? কোথায় বা সেই মদনধনুর মত ভঙ্গুর ভ্রূবিলাস? এই করোটির বাটিতে তুই আর কী মদিরা পান করবি?

মন, শোন, একটু অমৃত-মদ খাবি? পাত্র খুঁজছিস? খুরি-খুলি লাগবে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই অমৃতের ভাণ্ড।
রামকৃষ্ণ আবার সমাধিতে বিলীন হল।
নিস্তব্ধতারও বুঝি ডাক আছে। সেই মৌনের ডাকে জেগে উঠল সারদা। দেখল যেন কর্পূরগৌর মহাদেব বসে আছেন। পর্বতের মধ্যে মহামেরু, সরোবরের মধ্যে মহাসাগর।
তুমি সর্বধাত্রী ধরিত্রী। আমি ঋত, সত্য, ধৈর্য, শ্রেয়, শৌচ, সন্তোষ। তুমি দয়া ক্ষমা নীতি কান্তি লজ্জা সহিষ্ণুতা। আমি বিগত-বিষয়-রসরাগ। তুমি সর্বরাগ-স্বরূপিণী।
তুমি দিব্যাম্বরা, আর আমি দিগম্বর।
ঠিক-ঠিক নামটি মনে আছে সারদার। এই ভাবে কোন মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগল। সেই উচ্চারণে মিশল এসে তার ধৈর্যের মাধুর্য, তার সম্মতির স্নিগ্ধতা।
তুমি স্মৃতি তুমি মেধা তুমি বাক্য।
আমি উপলব্ধি আর তুমি উচ্চারণ।
সমাধি ভাঙল রামকৃষ্ণের।
ঘোমটা সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখছিল বুঝি সারদা। রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙতেই ত্রস্ত হাতে মুখের উপর আবার ঘোমটা টেনে দিলে।
রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার তুমি একটু শোও। রাত পোহাতে এখনো খানিক দেরি আছে।'
কিন্তু এমনি করেই কি কাটবে রাতের পর রাত?
কে একজন স্ত্রীলোক ধরে বসল সারদাকে। তুমি কি ন্যাকা না বোকা?
'কেন, কী হয়েছে?' সারদা অবাক হয়ে রইল।
'তুই কি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিস না?' স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপ করে উঠল: 'গাঁয়ের মেয়ে বলে কি তুই এমনি আহাম্মক হবি? গাঁয়ের মেয়ে কি আর বিয়ে করে না? স্বামী নিয়ে ঘরসংসার করে না? তাদের ছেলেপুলে হয় না?'
'তা, আমি কী করলাম!'
'তুমি হাঁদী, তুমি আবার কী করবে? বলি, তোর স্বামীকে কি তুই ভেসে যেতে দিবি? সংসারে তার মন নেই, সে মন তুই জাগিয়ে দিবি নে? ভোগের দিকে তাকে টেনে আনবি নে? তোর কপাল তুই চিবিয়ে খাবি? ধর্মপত্নী হয়ে এমন অধর্ম ঘটাবি তুই?'
বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল সারদা। অধর্ম! তার ঠাকুর তাকে দিয়ে অধর্মের অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন?
'তা ছাড়া আবার কি? তোকে বিয়ে করেছে অথচ তোকে তোর সংসারধর্ম করতে দিচ্ছে না, এ তো ঘোরতর অধর্ম! তুই স্ত্রী হয়েছিস, তুই এবার মা হবি নে? তুই তোর পাওনা-গণ্ডা ছাড়বি কেন? স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিবি ষোলো

আনা। বলবি গিয়ে সোজাসুজি—আমি সন্তান চাই। আমি মা হব।'
সরলতার প্রতিমূর্তি সারদা।

রামকৃষ্ণকে সেই রাত্রে বললে তাই সে স্পষ্ট করে। ঘোমটা-ঢাকা মুখের মধ্য থেকে কেমন অদ্ভুত শোনাল কথাগুলি।

'সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলেপুলে হবে নি? বিয়ে হয়েছে আমার, তা নইলে সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

কথা শুনে চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। সারদার মুখে এ কী কথা!

সারদা উপযাচিকা হয়ে পা টিপতে লাগল রামকৃষ্ণের। ছোট খাটটিতে তার শোবার কথা, বড় তক্তপোশটিতে এসে বসল।

মহামায়ার চাতুরী বুঝতে পেরেছে রামকৃষ্ণ। সে হাসল মনে-মনে। মন্দিরের ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোর চালাকি ধরতে পেরেছি। তুই এত দিন নিজের মূর্তিতে এখানে ছিলি, আর তোর কী খেয়াল হল, স্ত্রীর মূর্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই যদি তাই আসতে পারিস আয় আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কী!'

সারদা আড়ষ্ট হয়ে রইল। চকিতে কেমন যেন হয়ে গেল আরেক রকম।

রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমি মা হতে চাও? তা মোটে একটি ছেলে খুঁজছ কি গো? দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্ত্রে মাতোয়ারা। তুমি যে তখন মা-ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।'

সারদার মুখে আর কথা নেই। দেহে আর দেহবোধ নেই।

ঠিকই হয়েছে। মহামায়া ঠিক ভাবটিই এনে দিয়েছেন তোমার মধ্যে। তুমি জীবের জননী হবে। যে বিশ্বজনের জননী হবে তার মধ্যে এই সন্তানকামনাটি না এলে চলবে কেন? তোমার তো এ শুধু দেহসুখের ছলনা নয়, তোমার এ শুধু মাতৃস্ব-ভাতি। ঈশ্বরের এই সংসারে, এই পরমানন্দের মন্দিরে, তুমি লীলালাবণ্যকল্যাণী শ্রীমতী মাতা।

সারদা সরে গেল নিজের খাটে। আত্মানন্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই রতিহীন বিরতির পরীক্ষা। এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি।

একেই বলে সহজ-অটুট অবস্থা। সহজ, কেননা স্বস্থানে নিয়তস্থিত; আর অটুট, কেননা ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুতি নেই এক বিন্দু।

এ হচ্ছে সেই অবস্থা—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।'

ঈশ্বর দর্শন হলে রমণ-সুখের কোটি গুণ আনন্দ হয়। গৌরীচরণ বলত, মহাভাব হলে শরীরের রোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। এক-একটি রোমকূপে আত্মার সহিত মহারমণ হয়।

পতঞ্জলি বলেছে, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠাতেই বীর্য লাভ। যার বীর্য আছে তারই ভক্তি আছে। যার বীর্য আছে তারই আছে বজ্রবন্ধন। তারই আছে অনন্যচিত্ততা।

রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হল সেই বীর্যের পরীক্ষায়। সেই স্থৈর্যের পরীক্ষায়।

'রাঁধুনি হইবি ব্যঞ্জন রাঁধিবি হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়,
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি সাপ না গিলিবে তায়।
অমিয় সাগরে সিনান করিবি কেশ না ভিজিবে তায়॥'

উত্তীর্ণ হলেন সেই নির্বিকল্পের সাধনায়।

তুমি বীর্যবতী বিদ্যা। তুমি বলবতী মেধা। তুমি ধারণাবতী স্মৃতি।

সারদাকে ডেকে তুলল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোমাকে আবার সেই কথা জিগগেস করছি, সারদা! তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে চাও?'

'না।' সারদা বললে, 'তোমাকে তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে চাই।'

'বেশ।' তৃপ্তির প্রসাদে বুক ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'এবার তবে ঘুমোও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

কতক্ষণ পরে আবার ডেকে তুলল সারদাকে। বললে, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী মনে হয়, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

'বা, তা কেন মনে হবে? আমাকে তুমি গ্রহণ করেছ।' শান্ত সমর্পণে ঘুমুল সারদা। এ অর্পণ কে বলে? এ অর্চনা।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি বাণী। তুমি করুণা। তুমি আমার নামস্বাদময়ী ভিক্ষা।

যোগেন-মা বড়লোকের ঘরের বউ, কিন্তু সংসারের জ্বালায় বড় জ্বলছে। তাপ-হরণের খবর পেয়ে সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ তাকে স্থান দিলে। বললে, সারদার কাছে যাও। শান্তির স্পর্শটি ওর কাছে।

দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যোগেন-মা। যেখানে একনিষ্ঠ সেখানেই ঘনিষ্ঠ!

তার কাছে সারদা আক্ষেপ করল, 'ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে!'

'দেখলুম!'

'আমার ইচ্ছে হয় আমারো এমনি ভাব হোক। তুমি ওঁকে গিয়ে একটু বলবে?'

'কি বলব?' যোগেন-মা তো অবাক।

'যাতে আমাকে একটু ভাব-টাব দেন। আমার নিজের বলতে বড় লজ্জা করে।'

একা তক্তপোশে বসে আছে রামকৃষ্ণ, যোগেন-মা প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। সারদা কি বলেছে বললে সরলের মত। রামকৃষ্ণ কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

নহবতে ফিরে এল যোগেন-মা। দেখল সারদা পূজায় বসেছে। সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করল। দেখল আপন মনে হাসছে সারদা। কতক্ষণ পরেই আবার দরবিগলিতধারে কান্না! কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধিস্থা।

'তবে না তোমার নাকি ভাব হয় না?' সমাধিশেষে সানন্দ কণ্ঠে প্রশ্ন করল যোগেন-মা। সলজ্জ মুখে হাসল একটু সারদা। বললে, 'কি জানি যোগেন, কেমনতর হয়ে গেল। একটা মহানন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। তাঁর ভাবের ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আমার চর্মস্পর্শ করেননি বটে, কিন্তু তিনি যে আমার মর্মস্পর্শ করেছেন।'

তুমিই নিতে পারবে আমার ভাব। তুমিই ভবভয়শমনী সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী।

৪৬

আর আমাকে ছলনা করিস নে মা। আমি তো কামজয় করেছি, কিন্তু ওর মধ্যে কামভাব আনিস নে। আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ। ও যদি কামময়ী কামিনী হয়ে ওঠে, তা হলে, কে জানে আমার এই তেজ-বীর্য ধুয়ে যাবে কি না। কে জানে, সংযমের বাঁধ ভেঙে জাগবে কি না দেহবুদ্ধি।

তাই মা, আমি তোর দুয়ার ধরে পড়ে আছি, আমাকে কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা!

সংসাররঙ্গমঞ্চে এ কী অদ্ভুত প্রার্থনা। নবীনযৌবনা স্ত্রীকে সামনে রেখে এক জন সমর্থ-সুস্থ বীর্যবান যুবকের অসাধারণ আরাধনা! আমার স্ত্রীকে কামমোহিনী করিস নে, কালমোহিনী করে দে।

আমি আর কিছু চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি। 'আমার মা আছেন আর আমি আছি।' আমাকে কে টলায়? 'ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তরু বদ্ধমূল তত।'

মা কৃপা করলেন। ধরা দিলেন সেই ঘরে এসে। ধরা দিলেন সারদার মধ্যে।

লবকুশ হনুমানকে খুব কষে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। ছোট্টটি হয়ে হনুমান বাঁধন নিলে সর্বাঙ্গে। দেখে লবকুশের মহাখুশি। মহাবীর ধরা পড়েছে। তখন হনুমান বললে :

'ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?'

কৃপা করে মা-ই ধরা দিয়েছেন। করালেনও তিনি, পাওয়ালেনও তিনি। তিনিই সারদার মধ্যে দেখালেন জগদীশ্বরীকে।

আট মাস এক শয্যায় রাত কাটাল দুজনে। সে এক বিচিত্র সাধনা। শবসাধনার চেয়ে ভীষণতরো কঠিনতরো সাধনা—এই সজীব সাধনা। আগুন যত জ্বলে ঘি তত জমাট হয়। সূর্য যত জ্বলে তত সংহত হয় তুষার। চন্দ্র যত পূর্ণ হয় তত শান্ত হয় সমুদ্র। এ এক অভিনব সাধনা। শবসাধনা নয়, নব সাধনা।

'আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥'

সাধন শেষে রামকৃষ্ণ ঠিক করল সমারোহে একবার কালীপুজো করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা—১২৮০ সাল—ফলহারিণী কালীপুজোর দিন। সেই দিনটিই প্রশস্ত। কিন্তু কালীপুজো মন্দিরে হবে না! কালীর যে 'গুপ্ত ভাবে আপ্তলীলা।' তাই তার পুজোও হবে গুপ্ত ভাবে রামকৃষ্ণের নিজের ঘরে।
পুজো হবে স্ত্রীর। ষোড়শীরূপিণী সারদার।

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।'

মন্দিরে জাঁকজমক করে মামুলি পুজো হচ্ছে। সে পুজোর পূজারি হৃদয়। তাই নিয়ে সে শশব্যস্ত। রামকৃষ্ণ বললে, 'এ দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস।'
ঠিক আছে। সব যোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে হৃদয়। দীনু বলে একটি ছেলে, জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভাই-পো হয়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পুজো করে, ফুল-বেলপাতা যোগাড় করে আনলে। জিগগেস করলে, এ কেমনতরো পূজা?
রামকৃষ্ণ বললে, 'এ রহস্যপূজা।'
রাত নটা। কালীবাড়িতে নানা গান-বাজনা হচ্ছে, সর্বত্র হৈ-রৈ। রামকৃষ্ণের ঘর বন্ধ। রামকৃষ্ণ অনুপস্থিত। তার খোঁজ আর কে নেয়!
সারদাকে বলা ছিল আগের থেকে যেমন-কে-তেমন সাধারণ বেশে মুখে ঘোমটা টেনে রাত নটার সময় ঠিক এসে ভেজানো দরজায় ঘা দিলে। রামকৃষ্ণ তাকে এনে বসাল পিঁড়ির উপর।
পিঁড়ির উপরে আলপনা-আঁকা। সামনে-পাশে পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো। রামকৃষ্ণ বললে, 'বোসো। পশ্চিমমুখো হয়ে বোসো।' বলতে-বলতেই বন্ধ করে দিলে দরজা। রামকৃষ্ণের তক্তপোশের উত্তর পাশে গঙ্গাজলের যে জালা ছিল তার দিকে মুখ করে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পুবমুখো হয়ে। যেখানে পশ্চিম দিকের দরজা তার কাছে। প্রথমে সারদার পায়ে আলতা পরিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। কপালে-মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিল।
স্পর্শনেই সারদার অর্ধবাহ্যদশা হয়ে গেল।
তার পর পরনের শাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল নববস্ত্র। থালায় করে মিষ্টি দিল খেতে। বললে, খাও। খাবার পরে পান দিল মুখে।
ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে 'ষোড়শীর'। পূজার উপকরণগুলি সংশোধিত হল। মন্ত্রপূত জল ছিল সামনের কলসে, যথাবিধানে অভিষিক্ত করল সারদাকে। ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ—প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল রামকৃষ্ণ:
হে কালিকা, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী, হে ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো। এর দেহমন পবিত্র করে এতে আবির্ভূত হও, এতে বিরাজিত থাকো। জগৎসংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।'
হে কপালিনী, আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি-

অনুসারিণী। আমি যদি ভাবাতীত হই, ও-ও হোক তদ্ভাবভাবিত। আমাদের দৈহিক বিবাহ নয়, আত্মিক বিবাহ। আমাদের আত্মানন্দ।

পূজার চরম উপচার প্রণাম। জপ ধ্যান প্রার্থনা উপাসনা—সমস্ত কিছুই এই শেষ প্রণামটির জন্যে। এ প্রণিপাতটিই শেষ অর্ঘ্য। রামকৃষ্ণ বিল্বপত্রে নাম লিখল। আগে-আগে যত সাধন-ভজন করেছে তার সব বেশবাস তোলা ছিল সযত্নে—তাই নামিয়ে একসঙ্গে করলে। রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ, যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, তাও বাদ দিলে না। সকল আবরণ-আভরণ, সকল সাধনসিদ্ধির ধন একত্র করে সারদার পায়ে অঞ্জলি দিলে। বললে, 'যত জপ-তপ সাধন-ভজন যত আচার-বিচার, যত কর্মকাণ্ডের মালা—সব তোমার দুটি পায়ে অর্পণ করলাম। এ পূজাতেই আমার সমস্ত পূজার ইতি হল।' বলে সারদাকে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ।

সারদা দেখছে সব চোখ মেলে। কিন্তু সাড় নেই, মুখে কথা ফুটছে না।

মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিল এক দিন। আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এল।

সারদা শঙ্খকঙ্কণধারিণী লোকমাতা।

'হে সর্বমঙ্গলস্বরূপা সর্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।'

আত্মনিবেদন করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, ধ্যান ভাঙল রামকৃষ্ণের। সারদা তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। তদগত তন্ময় হয়ে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'পূজা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারো নবতে।'

সারদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পিঁড়ি ছেড়ে। উঠেই নবতের দিকে ছুট দিলে। একটা প্রণাম করে আসা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ছি, ছি, নিশ্চয়ই ঠিক ছিল। মনে-মনে তাই এখন প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। পূজ্য-পূজকে ভেদ নেই সেই ভাবাতীতের রাজ্যে।

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার এত লজ্জা, তুমি কাপড় পরাতে দিলে কি গো!'

'কি জানি, আমি তখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম!'

'তার পর উনি তোমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন, পায়ে ফুল দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায় বসে রইলে?'

'কি জানি বাপু, বসে রইলুম। সব দেখছি বটে, কিন্তু কথা বলতে পারছি না, নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'আর কেউ টের পেল না?'

'কি করে পাবে! দরজা বন্ধ যে।'

'তুমি মহাশক্তি। মহাশক্তি না হলে এ পূজা গ্রহণ করে এমন শক্তি কার?'

সেই থেকেই ভাব হয় সারদার।

নবতের ঘরটিতে শুয়ে আছে সারদা, তারই বিছানার এক পাশে যোগেন-মা ঘুমুচ্ছে। রাত্রে কোথাও হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল।

বাঁশির স্বরে ভাব হল সারদার। যেন সে বেণুবিনোদিনী রাধিকা হয়ে গেল। থেকে-থেকে হাসতে লাগল আপন-মনে। দেখতে লাগল বুঝি বা সেই বংশীবটবিহারীকে।
বিছানার এক কোণে তাড়াতাড়ি সরে বসল যোগেন-মা। বসেই রইল যতক্ষণ না ভাব ভাঙে। ভক্তিমতী হলে কি হয়, সংসারের মধ্যে তো আছে, যোগেন-মা ভাবল যদি তার ছোঁয়া লেগে সারদার ভাব কেটে যায়!
সেই ভাবের চরম হল নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন শ্রীমা, পাশে গোলাপ-মা-যোগেন-মা বসে। ধ্যানের পর আর সমাধি ভাঙে না শ্রীমা'র। অনেক নাম শোনাবার পর হুঁস যদি বা হল, শ্রীমা উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢুকবো এই শরীরের মধ্যে?' স্ত্রী-ভক্তেরা শ্রীমা'র হাত-পা টিপে দিতে লাগল—এই যে পা, এই যে হাত। তবু, দেহটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে, চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না।
সারদা চলে গেল নবতে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার শান্তিতে ঘুমোও গা মেলে। আমার কাছে থাকতে, আর সারা রাত বসে থাকতে জেগে, কখন কী ভাব হয় আমার আর কখন কী নাম-মন্ত্র বলে আমাকে সচেতন করো! এতে কী কারু সুখ থাকে না শরীর থাকে? তুমি মা'র কাছে নবতে গিয়ে ঘুমোও।
তাই যাব। তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমস্ত বাসনা।
বিদুরের স্ত্রী স্নান করছে, ঘরের বাইরে কৃষ্ণের ডাক শোনা গেল : বিদুর! বিদুর! কৃষ্ণকণ্ঠের স্বর শুনে বিহ্বল-ব্যাকুল হয়ে বিদুর-পত্নী ছুটে এল গৃহদ্বারে। কিন্তু, কি লজ্জা, ব্যাকুলতায় বসনখানিই ফেলে এসেছে ভুল করে। তখন আর পিছু সরবার পথ নেই, কৃষ্ণের কাছে সে সম্পূর্ণ উন্মোচিতা। কৃষ্ণ তক্ষুনি তার নিজের উত্তরীয় বিদুর-পত্নীর গায়ে ছুঁড়ে দিল। ত্রস্ত হাতে তাই দিয়ে কোনো রকমে গা ঢাকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে লজ্জা তার বেশি নয়। কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু কী যে খেতে দেবে ভেবে পেল না। দেখল বাড়িতে শুধু পাকা কলা ছাড়া কিছু নেই। তাই একটা ছিঁড়ে খেতে দিল কৃষ্ণকে। কিন্তু ভাবে-ভক্তিতে এমনি বিবশ হয়ে গিয়েছে যে, কলা না দিয়ে খোসা দিয়ে ফেলেছে। আর তাই কৃষ্ণ খাচ্ছে তৃপ্তি করে। ভক্তের কলা আর খোসা দুই-ই সমান ভগবানের কাছে।
আমারও তেমনি ভক্তি, তেমনি প্রীতি, তেমনি ব্যাকুলতা। হয়তো তোমাকে খোসা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তুমি সর্বস্বাদগ্রাহী, তুমি দেখ তা ভাবের রসে স্বাদু কিনা। প্রভু, তুমি যদি নাও, তবেই আমি পূর্ণ হব। তুমি যদি খাও তবেই আমার খিদে মিটবে।
গোলাপ-মা'র ভালো নাম অন্নপূর্ণা। মাঝবয়সী বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল।
ঠাকুরের ভাব হল। বললেন, 'তুমি তো মহা ভাগ্যবতী।' গোলাপ-মা থমকে রইল।
'সংসারে যাদের কেউ নেই কিছু নেই ঈশ্বর তো তাদেরই সহায়।'
অশরণের আশ্রয়স্থল তুমি। গোলাপ-মা বসে পড়ল পদচ্ছায়ে।

ঠাকুরের তখন অসুখ, গোলাপ-মা বললে, কলকাতায় তার এক জানাশোনা ডাক্তার আছে, সে নির্ঘাত সারিয়ে দিতে পারবে। ছোট ছেলের মত লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর, বললেন, কালই চলো। পর দিন ভোরেই রওনা হলেন নৌকো করে, সঙ্গে গোলাপ-মা, লাটু আর কালী। সারা দুপুর কেটে গেল এই ডাক্তারির ধান্দায়। ফেরবার পথে বেজায় খিদে পেল সবাইকার। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে সকলে। এখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, কারু কাছে পয়সা আছে কি না। কেবল গোলাপ-মা'র কাছে আছে। তাও, চারটি মোটে পয়সা!

তাই সই। ঠাকুর কালীকে বললেন, বরানগরের বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।

ঠোঙায় করে তাই নিয়ে এল কালী। কিন্তু, কি আশ্চর্য, কাউকে কিছু না দিয়ে সমস্ত মিষ্টিটা ঠাকুর একাই খেয়ে ফেললেন। তার পরে গঙ্গার জল খেলেন অঞ্জলি ভরে। বললেন, 'আঃ, খিদে মিটল।'

অবাক কান্ড। আর তিন জনেরও খিদে মিটে গেল সেই সঙ্গে। কিছু নিল না, খেল না, অথচ কারু খিদে নেই এক ফোঁটা। সেই বন্য ক্ষুধা মুহূর্তে তৃপ্ত হল কি করে?

তুমি কি সেই মহাভারতের কৃষ্ণ? তুমি তৃষাহর। তুমি তৃপ্তিকর।

নবতের সরু বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। অতৃপ্ত চোখে চেয়ে থাকে যদি কখনো কোনো ফাঁকে দেখা যায় সেই তৃপ্তিকরকে!

রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হৃদয়। বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে। তুমিও তবে বাবা বলে ডাকো না।'

এতটুকু রুষ্ট বা অপ্রতিভ হল না সারদা। নিবিড় ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি মিশিয়ে বললে, 'উনি বাবা কী বলছ! উনি বাবা মা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত। যেখানে, যে সম্পর্কে যতটুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি! উনি আনন্দময়।'

সেই গান্ধারীর কথা মনে করো :

> 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
> ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
> ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
> ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥'

তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ, কিন্তু জেনো, আমি তোমার দুয়ারেই পড়ে আছি।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

প্রথম খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

Life of Sri Ramakrishna (Advaita Ashrama)
স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ
শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত শ্রীশ্রীসারদা দেবী
অশ্বিনীকুমার দত্তকৃত ভক্তিযোগ
শ্রীশ্রীমায়ের কথা (উদ্বোধন)

৪